নববী গল্প

সীরাতের ঘটনাসমূহ নতুন আঙ্গিকে

আবদুল ওয়াহহাব আত-তারীরী

উৎসর্গ

যিনি আমার মুখে সর্বপ্রথম আল্লাহর যিকিরের বুলি তুলে দিয়েছিলেন, যিনি আমার অন্তরে আল্লাহর স্তুতি ও তাঁর প্রশংসা এবং রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানের চারা রোপণ করেছিলেন। আমি তাঁর মুখেই সর্বপ্রথম নবীজির (সা) ঘটনাসমূহ শুনি এবং সর্বপ্রথম তাঁর কাছ থেকেই এগুলোর তাৎপর্য ও শিক্ষা অর্জন করি।

যাঁর তত্ত্বাধানে আমার বড় হয়ে ওঠা, যিনি আমাকে সঠিক পথে চলা শিখিয়েছেন, যিনি আমার মধ্যে সাহসিকতার উদ্দীপনা যুগিয়েছেন, যিনি আমার জীবন বৃদ্ধির জন্য নিজের জীবন সংক্ষিপ্ত করেছেন। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ব্যর্থতার তলদেশে অথবা অবক্ষয়ের গহবরে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

আমার সম্মানিত পিতার জন্য আমি এই বই উৎসর্গ করছি। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন এর প্রতিদানকে তাঁর জন্য প্রাচুর্যময় ও অবিচ্ছিন্ন করে দেন এবং তাঁর বয়সে বরকত দেন; তিনি যেন তাঁকে আরো লম্বা জীবন দেন এবং আমার পক্ষ হতে তাঁর জন্য উত্তম বিনিময়ের ব্যবস্থা করে দেন, যেমনটা কিনা প্রত্যেক পিতা তার সন্তান থেকে প্রাপ্য।

ভূমিকা

পরম করুণাময় এবং দয়াশীল আল্লাহর নামেঃ

আপনাদের ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক

আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্ভাষণ বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র, এর পরের আর্জিঃ

এই বইয়ের বর্ণিত ঘটনাসমূহ পৃথিবীর সর্বোত্তম ঘটনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই বইয়ের মুস্তাফার (সা) জীবনীর ঘটনাবলীকে এগুলোর ঐতিহাসিক পরম্পরা অনুযায়ী বিবৃত করা হয় নি। বরং তাঁর জীবনী থেকে কিছু ঘটনাবলীর রেওয়ায়েতকে এমনভাবে বাছাই ও একত্রিত করা হয়েছে যে, নববী জীবনের চোখ ধাঁধানো চিত্রের সৌন্দর্য পরিপুর্ণতা পেয়েছে, পূর্ণাঙ্গভাবে এর ঘটনার সর্বোত্তম তাৎপর্যসমূহক তুলে ধরেছে, এবং এর সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তাঁর নবীকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে দৈহিক গঠনগত দিক দিয়ে সবচেয়ে সুন্দর এবং নৈতিক দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আপনারা এই বইয়ের বর্ণিত ঘটনাসমূহে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব, ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গতা, আচরণগত ভারসাম্য, জীবনযাপনে স্বতঃস্ফূর্ততা, শ্রেষ্ঠত্বের মাঝেও সরলতা এবং বাস্তবতার মধ্যেও আদর্শবাদিতার মোহনীয় প্রতিফলন দেখতে পাবেন, যা ছিল ভনিতা ও স্বৈরাচারিতা থেকে অনেক অনেক দূরে। নবী (সা) এসবের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং এসব থেকে সতর্ক করেছেনঃ “আমি লৌকিকতাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই” [সূরা সাদঃ ৮৬]।

এই বইয়ের অধ্যায়গুলো কেবল লেখকের লেখা ও পাঠকের পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। পাঠকের উচিত নববী জীবনের চিত্রকে খুবই ভালোকরে পাঠ করা, যাতে আমরা এর দৈনন্দিন জীবনের অভিক্ষেপনে জীবনের প্রাণবন্ততা, মানসিক প্রশান্তি অর্জনে বড় সফলতা, প্রশান্তি ও আনন্দময় জীবন অর্জন করতে পারি, যে

জীবনকে সবচেয়ে সুন্দর ও বাস্তব অনুভূতিসমূহ এবং সবচেয়ে উপভোগ্য আনন্দসমূহ সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলবে।

যখন আরো সতর্ক দৃষ্টি দেয়া হবে এবং এ বইয়ে বর্ণিত ঘটনাসমূহকে বিশ্লেষণী চোখের আওতায় ফেলা হবে, তখন পাঠক এই বইয়ের বর্ণিত দৃষ্টিকোণের সাথে সাথে অন্যান্য দৃষ্টিকোণও খুঁজতে চাইবে। এই দৃষ্টিকোণ এমন প্রমাণের ভিত্তিতে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যা অন্য কারো চোখে পড়বে না। এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। নবীজির (সা) জীবনী তো উদ্বেলিত নদীর ন্যায়, যেখান থেকে যে যার হিসেব মত পানি তুলে নেয়। তাই চোখ ঝলসানো সৌন্দর্য খুঁজে পেতে হলে নিজেদের হৃদয়, ভালোবাসা ও ঈমান দিয়ে নববী জীবনের চিত্র পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাহলেই সৌন্দর্যসমূহ তো আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং আমাদের মনকে প্রশ্ন করার জন্য উদ্দীপ্ত করবেঃ "আল্লাহই সর্বোত্তম জানেন, কোথায় তিনি তাঁর রিসালাত প্রেরণ করবেন" [সূরা আন'আমঃ ১২৪]। "আল্লাহ ফেরেশতাদের থেকেও নিজের প্রতিনিধি বাছাই করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও" [সূরা হজ্জ্বঃ ৭৫]।

আমাদের উচিত সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রাসূলের (সা) এই চিত্রসমূহের ওপর গভীর দৃষ্টি দেয়া যাতে আমরা সর্বোত্তম বিষয়বস্তুসমূহ ও এসবের তাৎপর্য বুঝতে আত্মনিয়োগ করতে পারি এবং পরস্পরকে এ ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। মানুষের অনুসন্ধানী দৃষ্টির পরিসর প্রশস্ত এবং তার দৃষ্টিভঙ্গীতেও ভিন্নতা বিদ্যমান। আপনারা যদি আমার কিছু পর্যবেক্ষণ পড়ে থাকেন, তাহলে আমিও আপনাদের পর্যবেক্ষণ থেকে উপকৃত হতে খুবই আগ্রহী। সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের অন্তরের সবচেয়ে প্রিয়, আমাদের দৃষ্টিতে সর্বাধিক উজ্জ্বল এবং আমাদের ওপর সবচেয়ে বেশি অধিকার ধারণকারী। তাঁর ব্যাপারে কথা হচ্ছে সবচেয়ে মিষ্টি কথা এবং তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা।

আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের তাঁর নবীর প্রতি ভালোবাসা প্রদান করেন, যাতে আমরা নবীজির (সা) ঘোষিত "প্রত্যেকে তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে" এই সুখবরের ভাগীদার হতে পারি।[1]

১। হেরা গুহায় একরাত

এটা সেসময়ের কথা যখন রিসালাতের নূর নির্বাপিত হয়েছে। পুরো পৃথিবী গোমরাহীর অমানিশায় ঢেকে গিয়েছে। জুলুম ও পৌত্তলিকতার অজ্ঞতা পৃথিবীকে ঘিরে ধরেছে। মানবজাতির অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে তা আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জনের যোগ্য হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ পৃথিবীবাসীর দিকে তাকালেন এবং আহলে কিতাবদের মধ্যকার কিছু (সত্যাশ্রয়ী) ব্যক্তি ব্যতীত গোটা আরব ও অনারব অধিবাসীদের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন।

এই পৃথিবীরই এক কোণায় অবস্থিত একটি শহর, যার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে একাধিক গিরিপথ ও শহরটিকেও ঘিরে রয়েছে বেশ কয়েকটি পাহাড়পর্বত। এই শহরেরই একজন অধিবাসী তাঁর শহর থেকে নিয়মিত বেরিয়ে পড়তেন এই পাহাড়গুলোর একটির উদ্দেশ্যে।

এই নির্দিষ্ট পাহাড়টির দিকে তাকালে মনে হবে, আল্লাহ যেন এই লোক আর এই ঘটনার জন্যই এই পাহাড়কে সৃষ্টি করেছেন। এর চারপাশের অন্যান্য পাহাড়গুলো দৃঢ়তা হারিয়ে নুয়ে পড়েছে। কিন্তু এ পাহাড়টির চূড়া এত উঁচুতে যে, এর দিকে তাকালে একে বহুদূরে অবস্থিত মনে হয়। এর চূড়ায় আরোহণ কঠিন এবং এর পথও বন্ধুর। লোকটি এই পাহাড়েরই চূড়ায় অবস্থিত একটি গুহায় চলে যান। তিনি গুহাটিতে বসে তাঁর দৃষ্টিকে দূর দিগন্তে নিক্ষেপ করেন যাতে তাঁর সামনে অবস্থিত বাইতুল্লাহকে দেখতে পান, যা তাঁর পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম (আ) নির্মাণ করেছিলেন।

এই উচ্চতায় অবস্থান করে তিনি যেন পৃথিবীর বুকে বিরাজমান পৌত্তলিকতা ও এর অন্ধকারাচ্ছন্নতার কলুষতার ঊর্ধ্বে চলে যান। এই উচ্চতা থেকে তিনি পৃথিবীর প্রশস্ত দিগন্তে দৃষ্টিপাত করে বেড়ান; পৃথিবীবাসীর ওপর আল্লাহর প্রেরিত রিসালাতসমূহের কোন অবশিষ্টাংশ যদি পাওয়া যায় এই আশায়।

এই জায়গাটি উচ্চতার দিক দিয়ে সুবিশাল, এর দৃশ্যাদি হৃদয়গ্রাহী এবং এর অবস্থানও স্বতন্ত্র। আল্লাহর সৃষ্টির বিশালতার দৃশ্যাবলী দ্বারা অন্তঃদৃষ্টি ও চিন্তাজগতকে পরিপূর্ণ করার পর গভীর চিন্তার জগতে বিচরণ, আসমান

ও জমীনের সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা ও আল্লাহর অভিমুখ হওয়ার জন্য এ ধরনের জায়গা একদম উপযুক্ত। "হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি এসব অহেতুক সৃষ্টি করনি" [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৯১]।

নিস্তব্ধ রাত, চারপাশের পৃথিবী বিশ্রাম নিচ্ছে। আর তিনি পাহাড়টির সর্বোচ্চ চূড়ায় গুহায় গভীর চিন্তা ও ইবাদতে মগ্ন। তখনই তাঁর এই সুনসান পরিবেশ ও চিন্তাভাবনায় ব্যঘাত ঘটালো এক ফেরেশতার আগমন। তাঁর রবের পক্ষ থেকে সত্যের আগমন তাঁকে চমকে তুলল।

আল্লাহর রাসূল (সা) হেরা গুহায়, তাঁর আশেপাশে সবকিছুই নীরব ও শান্ত। তিনি সেখানে কোন হট্টগোল শুনছেন না বা কাউকে অনুভবও করছেন না। সে জায়গাটি মানুষের হাঁটার পথেও নয় কিংবা নয় কোন জনবহুল এলাকায়ও। অতঃপর হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে সত্য আচমকা এসে তাঁর ওপর নাযিল হল। ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর পক্ষ থেকে কোনরূপ অপেক্ষা ছাড়া। তিনি তো তাঁর ওপর কোন রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ হবে অথবা কোন ওহী বা আসমানী কিতাব তাঁর ওপর নাযিল হবে – এমন কোন কিছুর অপেক্ষাতেই ছিলেন না। "আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত" [সূরা ক্বাসাসঃ ৮৬]।

একজন ব্যক্তি যতই দৃঢ়পদ কিংবা আত্মসংবরণকারী হোক না কেন, ফেরেশতার আগমন তার কাছে বিস্ময়কর ঠেকবেই। কিন্তু সেই ফেরেশতার বক্তব্য এবং তাঁর আদেশ আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল আর তা ছিল "পড়!"। এই বক্তব্য সেই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে ছিল যিনি না তো কোনদিন কোন লেখা পড়েছেন, আর না কোনদিন কোন পাঠ্য জিনিস লিখেছেন। "আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেননি" [সূরা আনকাবুতঃ ৪৮]।

অতএব, তিনি সেই আদেশের জবাবে তাই বললেন যা ছাড়া তাঁর অন্য কিছু বলার ছিল নাঃ "আমি তো পঠনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই" অর্থাৎ 'আমি তো পড়তে পারি না।' অতঃপর ফেরেশতা তাঁকে তাঁর সহ্যের সীমা পর্যন্ত প্রচন্ড শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁকে পরিশ্রান্ত করে দিলেন। এরপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় আদেশ দিলেনঃ "পড়!" তিনি আবারও একই জবাব দিলেন, "আমি তো পঠনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" অর্থাৎ 'আমি জানি না কিভাবে পড়তে হয়।' অতঃপর ফেরেশতা তাঁকে আবারো তাঁর সহ্যসীমা প্রচন্ডভাবে জড়িয়ে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে তাঁকে তৃতীয়বারের মত আদেশ করলেনঃ "পড়!" তিনি পুনরায় একই জবাব

দিলেন। তিনি প্রথমবার যখন বলেছিলেন, "আমি তো পঠনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই", তখন তিনি সত্যই বলেছিলেন এবং তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। অতঃপর ফেরেশতা তাঁকে তৃতীয়বারের মত জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিলে এবং বললেনঃ "পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেচেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না" [সূরা আলাক্বঃ ১-৫]।

অতএব আয়াতগুলো এদের পঠন ও অর্থসহ রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তরে জমা হল এবং তিনি সেগুলো নিয়ে নিজ বাড়িতে দ্রুত ফিরে এলেন। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত, তাঁর হৃদপিন্ড কম্পমান এবং ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি বিমূঢ়। এই অবস্থায়ই তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজার (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বললেনঃ "আমাকে আবৃত কর! আমাকে আবৃত কর!" প্রচন্ড পরিশ্রান্তির পর তাঁর প্রয়োজন ছিল বিশ্রামের, ভয়ের পর প্রয়োজন ছিল প্রশান্তির। তিনি যখন বিশ্রাম করে অবসাদমুক্ত হলেন, ভীতি দূর হয়ে তাঁর ওপর প্রশান্তি ভর করল এবং তাঁর আতঙ্ক দূরীভূত হল, তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজাকে (রা) যা দেখেছেন, শুনেছেন ও অনুধাবন করেছেন সব খুলে বললেন। খাদিজা (রা) ছিলেন স্নেহময়ী, বুদ্ধিমতী এবং প্রজ্ঞাময়ী একজন নারী, যাঁর ভালোবাসা, পরামর্শ ও সৎবুদ্ধির ওপর রাসূলুল্লাহ (সা) আস্থা রাখতেন। তিনি খাদিজার (রা) কাছে নিজের অন্তরের অনুভূতি এভাবে তুলে ধরেনঃ "আমি নিজের জীবনের ভয় করছি।"

খাদিজা (রা) খুবই স্পষ্ট ও চমৎকার জবাব দিলেন, যা ছিল আস্থা ও নিশ্চয়তাদায়ক। তাঁকে সুসংবাদ দিলেন, বঞ্চনার সংবাদ দেন নিঃ "আল্লাহর শপথ! কখনোই না! আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপদস্থ করবেন না।"

যেন সমগ্র মহাবিশ্ব এর ফেরেশতাগণ, গ্রহ-নক্ষত্র ও অসাধারণ সৃষ্টিসহ খাদীজার (রা) কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করছিল এবং মুহাম্মাদকে (সা) তাই শোনার চেষ্টা করছিল যা খাদিজা তাকে বলেছিলঃ "আল্লাহর শপথ! কখনোই না! আল্লাহ আপনার ওপর যা নাযিল করেছেন, আপনাকে ও আপনার প্রতি যে কিতাব প্রেরণ করেছেন, আপনাকে যে এই গাফেল ও বিভ্রান্ত মানবতার মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন – তা এজন্য করেন নি যে, তিনি আপনাকে এর মাধ্যমে অপদস্থ করবেন ও আপনাকে কষ্ট দিবেন। বরং তা এজন্য যে, তিনি আপনাকে ও আপনার মাধ্যমে অন্যকে সম্মানিত করবেন, আপনাকে ও আপনার মাধ্যমে অন্যকে বড় করবেন, আপনাকে ও আপনার মাধ্যমে অন্যকে মহিমান্বিত করবেন, আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করবেন, আপনার

আলোচনাকে সমুচ্চ করবেন। অতএব নিজের জীবনের ব্যাপারে ভীত হবেন না। কখনোই না! আল্লাহর শপথ! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না।”[2]

এখানে আমরা অসাধারণ কিছু তাৎপর্য খুঁজে পাইঃ

১) যখন পাঠকরা এই ঘটনাকে উপলব্ধি করার জন্য সব ধরনের অন্তঃদৃষ্টি প্রয়োগ করবে, তারা এই ঘটনার বিশালতা বুঝতে পারবে এবং কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াই এই উপসংহারে পৌঁছাতে পারবে যে, এটি পৃথিবীতে আদমের আগমন থেকে শুরু করে কেয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ঘটনা। ইতিহাস এই ঘটনার মত আর কোন ঘটনার জন্যই এভাবে আন্দোলিত হয় নি। মানবতা এই ঘটনার মত আর কোন ঘটনার জন্যই এতটা খুশি হয় নি। ইতিহাসের আর কোন ঘটনাই এ ঘটনার স্মৃতিচারণ, কৃতজ্ঞতা ও উদযাপনযোগ্য নয়। এজন্যই কোরআনের আয়াত এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছে এবং একে সংরক্ষণ করেছেঃ “রমযান মাস, যে মাসে কোরআন নাযিল করা হয়েছে” [সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫]। এই স্মরণকে নবায়ন করেছেন জিবরাঈল (আ) ও মুহাম্মাদ (সা)। “রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) সবচেয়ে বেশি উদারহস্ত হতেন, যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁকে কোরআন পাঠ করে শোনাতেন।” প্রত্যেক বছর রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর উম্মতের জন্য ওহী ও রূহুল কুদসের (জিবরাঈল) সাথে প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি নবায়ন করা হত। গায়েবী জগত থেকে সুসংবাদ হেরা গুহার মুখে নাযিল করা হয়।[3]

ওহী তার রহস্যসহ দুনিয়ায় আগমন করল।

নবুওয়াতের সুসংবাদ ভোরের খুশবুর মত ভেসে বেড়াতে লাগল,

পাহাড়ে পাহাড়ে সে নতুন আলোর জন্মের ঘোষণা দিল।

নীরবতাকে চৌচির করল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস একে

প্রশান্তির সাথে বহন করে নিয়ে গেল ঘর থেকে ঘরে।

ঝিমানো মক্কার আঙ্গুলগুলো ধরে তাকে নাচিয়ে তুলল।

নতুন ভোর এর ঔজ্জ্বল্যের ঘোষণা দিল

এই ভোর হুড়হুড়িয়ে পৃথিবীতে হাজির হল এবং

নবুওয়াতের ইতিহাসে স্থান করে নিল

প্রজন্মান্তর ও যুগান্তরের ভোর একটি।[4]

২) আল্লাহর এ এক অপার অনুগ্রহ ও বদান্যতা – বরং সবচেয়ে বড় বদান্যতা – যে, তিনি নিজে থেকে মানবজাতির ওপর তাঁর ওহী নাযিল করেন; স্বীয় কালাম দ্বারা তাদের সম্বোধন করেন; তাদেরই মধ্য থেকে সবচেয়ে সৎকর্মশীল ও পবিত্র অন্তরের একজনকে বাছাই করেন যাতে তার অন্তরে সমগ্র সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করে প্রেরিত আল্লাহর কালাম নাযিল হতে পারে। এটা মানুষের যোগ্যতা ও তাদের থেকে চাওয়া ছাড়াই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও উপহার। তিনি তো মহাপরাক্রমশালী এবং অনুগ্রহ ও দয়ায় সমুচ্চ। তিনি নিজ থেকেই তাঁর নেয়ামতের সূচনা করেন এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুগ্রহ বর্ষণ করে যান।

আপনার হৃদয় কি অনুভব করে না যে, যিনি এই সুবিশাল ভীতি উদ্রেককারী মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন; যাঁর সৃষ্টি ও রাজ্যের একাংশ তো তাঁর মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল, কিন্তু যিনি এই পুরো মহাবিশ্বের আকারের তুলনায় একটি ধূলিকণার সমান পৃথিবীর অধিবাসী মানবজাতির দিকে তাকালেন এবং তাদের উদ্দেশ্য করে তাদের ব্যাপারেই কথা বললেন; অতঃপর তাদের দ্বীন সুস্পষ্ট করে এবং পথপ্রদর্শন করে নিজের কালাম অবতীর্ণ করলেন, তিনিই আপনার মহামহিম সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক? কতই না মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ আর এই অনুগ্রহ পেয়ে মানবজাতি কতই না সম্মানিত হয়েছে!

৩) রাসূলুল্লাহ (সা) জিবরাইলের (আ) সাথে এই প্রথম সাক্ষাতের আকস্মিকতায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে আশঙ্কা ঘিরে ধরল। তিনি দ্রুত ঘরে ফিরে গেলেন; তাঁর হৃদয় তখন কম্পমান। সারা দেহ থরথর করে কাঁপছে। এটা রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতের সত্যতার সহজ-সরল প্রমাণ। তাঁর কাছে যা এসেছিল সেটার আশা তিনি করেন নি, সেটার জন্য অপেক্ষাও তাঁর ছিল না, তিনি তা আকাঙ্খাও করে নি। “আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবর্তীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত” (সূরা ক্বাসাসঃ ৮৬)। সেসময় বনী ইসরাইল এবং আরবের হানীফদের মধ্য থেকে অনেকেই নবুওয়াতের প্রত্যাশা করত এবং নবুওয়াতের সম্মানের সম্মানিত হতে চাইত। কিন্তু আল্লাহর হিকমত এই যে, যে এই সম্মানের প্রত্যাশা করে

তাকে তা দেয়া হয় না, বরং যে এর জন্য উপযুক্ত এবং এর ভারবহনে সক্ষম তাকেই এই সম্মান দেয়া হয়। “আল্লাহ এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে” (সূরা আন’আমঃ ১২৪)।

৪) প্রথম নাযিলকৃত আয়াতগুলোর প্রতিটি শব্দ নিজেই উদ্দেশ্য, যার মাধ্যমে কোরআন নাযিল এই আয়াতগুলো দিয়ে শুরু হওয়ার পেছনে গভীর প্রজ্ঞা লক্ষ্য করা যায়। আমরা এর ওপর গভীর দৃষ্টি দেয়ার উদ্দেশ্যে একটু থামবঃ

ক) পড়ার আদেশ দিয়ে শুরু করা এবং কলম ও গ্রন্থের প্রশংসা।

এই আয়াত নাযিল হয়েছে একজন নিরক্ষর নবীর ওপর, যিনি একদিনের জন্যও কোন লেখা পড়েন নি, না কোনদিন কোন লেখা লিখেছেন। যদি এই নিরক্ষর নবী (সা) তাঁর ওপর কি নাযিল হবে তা নিজেই বাছাই করতেন (!) অথবা ওহীর নামে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতেন – কিন্তু তিনি তেমনটি ছিলেন না – তাহলে তিনি প্রথম ওহী নাযিলের ব্যাপারটি সবাইকে জানিয়ে বা তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে তাঁর মিশন শুরু করতেন। কিন্তু তিনি তেমনটি করেছেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাই সর্বপ্রথম নাযিলকৃত এই আয়াতগুলো নবীর (সা) নবুওয়াত ও ওহীর খোদায়ী উৎসের প্রমাণ এবং এ কথারও প্রমাণ যে, মুহাম্মাদ (সা) নবী, যাঁর ওপর ওহী নাযিল হয় এবং তিনি তাই প্রচার করতেন যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে নাযিল হত।

খ) সেই আল্লাহর নামে শুরু করা যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ এই সৃষ্টিজগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবই এই আয়াতে উদ্দিষ্ট।

এরপর আল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেনঃ “যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিন্ড থেকে” [সূরা আলাক্বঃ ২]। এই আয়াতগুলোর মধ্যে খুবই শক্তিশালী একটি শিক্ষা নিহিত রয়েছে। এ আয়াতসমূহ নবী (সা) অন্তরে প্রশান্তির সঞ্চার করে এবং ভবিষ্যতে যেসব শত্রু ও নির্দয় চক্রান্তকারী তাঁর মোকাবেলা করবে তাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে। ‘এরা সবাই সৃষ্টি, কিন্তু যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সৃষ্টিকর্তা। তাহলে এসব শত্রুদের গুরুত্বই বা কি? এদের নিয়ে চিন্তা করারই বা কি আছে যখন তাদের সৃষ্টিকারীই হচ্ছেন তোমার প্রেরণকারী?’

গ) “পড়! তোমার রব সবচেয়ে দয়ালু” [সূরা আলাক্বঃ ৩]

আল্লাহ এখানে নিজেকে ‘দয়ালু’ না বলে, সব দয়ালুর চেয়ে বড় দয়ালু বলেছেন। এখানে দয়া বলতে অসীম দয়া বোঝানো হয়েছে। ‘আর এই দয়াপরবশ হয়েই তিনি ওহী নাযিল করেন, আর এই দয়াপরবশ হয়েই তিনি সব মানুষের মধ্যে তোমাকেই তাঁর রিসালাত গ্রহণের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। এই দয়ার কারণেই তিনি তোমাকে নিজের তত্ত্বাধানে নিয়েছেন এবং তোমার হেফাজত করছেন। যখন অবাধ্য মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা তোমার মোকাবেলায় আসবে তখন মনে রাখবে, তোমার প্রেরণকারী সবচেয়ে দয়ালু। সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু তোমাকে তাদের হাতে সমর্পন করবেন না, তোমাকে লাঞ্ছিতও করবেন না। তিনি আল্লাহর তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে সুসংবাদ পেলেন “পড় ! তোমার রব সবচেয়ে সবচেয়ে দয়ালু”, এরপর তিনি তাঁর স্ত্রী থেকেও এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা পেলেনঃ “আল্লাহর শপথ ! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না।”

ঘ) “যিনি কলম দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন” [সূরা আলাক্বঃ ৫]

এই সেই নবী যাঁর ওপর ভিত্তি করে তাঁর পর ধারাবাহিকভাবে আসা হাজারো আলেম জ্ঞান ও কলম দিয়ে আল্লাহর ওহীভিত্তিক প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। তাঁর জ্ঞান, শরীয়ত এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর প্রেরিত ওহী নিয়ে হাজারো গ্রন্থ লিখিত এবং পঠিত হয়েছে। কিন্তু তিনি নিজে একজন নিরক্ষর, তিনি কখনো পড়েন নি, লিখেনও নি। কিন্তু আলেমগণ অন্যের লেখা থেকে শিখছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) নিরক্ষর। তিনি মানবজাতিকে শিখিয়েছেন যা লিখিত হয়েছে।

২। সর্বোত্তম

হেরা গুহায় খোদায়ী ওহী নাযিল শুরু হওয়ার ঘোষণা নিয়ে আসা রুহুল কুদুসের (জিবরাইল) সাথে প্রথম সাক্ষাতের পর রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে এলেন। তাঁকে আশঙ্কা ঘিরে ধরল। তিনি নিজ জীবনের ভয় করতে লাগলেন। এটা আল্লাহরই পরিকল্পনা ছিল যে, এক্ষেত্রে তাঁর অবলম্বন হবেন তাঁর বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ স্ত্রী খাদিজা (রা)। যখনই তিনি খাদিজার (রা) কাছে পুরো কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং তাঁর এই মানবিক অনুভূতি তুলে ধরলেন, "আমি নিজের জীবনের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি", তখনই খাদিজা (রা) খোদায়ী নীতির প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনা, বয়সের পরিপক্কতা, ইতিহাস অন্বেষণ, ১৫ বছর একসাথে সংসার করার ফলে স্বামীর ব্যাপারে তাঁর জানাশোনাকে কাজে লাগিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে দৃঢ় এবং অটল জবাব দিলেন। খাদিজা (রা) তাঁর স্বামীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জানতেন, স্বামীর সাহচর্যের ফলে তাঁর কাছে স্বামীর ব্যক্তিত্বের দিগন্ত এবং চারিত্রিক আকর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। আর এজন্যই খাদিজার মহিমান্বিত শপথের সাথে তড়িৎগতির এই উত্তর থেকে তাঁর চূড়ান্ত বিশ্বাস ও নিশ্চয়তারই প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ "কখনোই না! আল্লাহর শপথ! আল্লাহ কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলদের সহায়তা করেন, মানুষকে প্রয়োজনে সাহায্য করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন।"

*নিশ্চয়ই আমরা খাদিজার (আ) এই কথার সত্যতা প্রণয়ন করি। তিনি তাঁর এই কথার দ্বারা একটি মাহাজাগতিক নিয়মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আল্লাহ তাঁর সেসব বান্দাদের হেফাজত করেন যারা অন্যদের প্রতি সাহায্যশীল এবং উপকারী। আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ করেন না, তাদের কষ্টও দেন না। আল্লাহ তাদের মধ্যে সুমহান গুণাবলী সৃষ্টি করে দেন যাতে তিনি তাদের তাঁর সাহায্য ও অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য করে তুলতে পারেন। খাদিজার এই কথা থেকে মুহাম্মদের (সা) চরিত্রও ফুটে ওঠে, যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হওয়ার আগে তাঁর বেড়ে ওঠার সময়কাল থেকেই নবীসুলভ চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এজন্যই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিকগুলোকে তিনি কখনোই পরিত্যাগ করেন নি। খাদিজা (আ) উল্লেখিত নবীর (সা) এই উন্নত চরিত্রাবলীর দিকে তাকালে দেখা যাবে, তাঁর সাধারণ গুণাবলী ছিল, মানুষকে সাহায্য করা,

তাদের প্রয়োজন পূরণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, অসমর্থদের ভার বহন করা, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা, অতিথিদের আতিথেয়তা করা এবং দুর্গতদের সহায়তা করা।[5]

*উদার ব্যক্তিত্ব এবং দয়ার্দ্র হৃদয়সম্পন্ন মানুষদের থেকে যে উন্নত মানের গুণাবলী দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে মৌলিক হল মানুষের চিন্তায় চিন্তান্বিত হওয়া, মানুষের প্রয়োজনগুলোকে অনুভব করা, তাদের বিপদাপদ দূর করা, তাদের দুঃখ লাঘব করা। এসবই প্রথম ওহী নাযিলের আগেই মুহাম্মাদের (সা) সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। খাদিজা (রা) গভীর অভিজ্ঞতা এবং দৃঢ় দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে এসব জানতেন।

*আরেকটি নববী চিত্র থেকে এর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ঘটনা হচ্ছে মূসা (আ) কর্তৃক মাদইয়ানে পানি তুলে দেয়ার ঘটনা। তিনি দেখলেন, লোকেরা তাদের ছাগলদের পানি পান করাচ্ছে। তাদের মধ্যে দুজন নারী তাদের ছাগলগুলোকে আগলে রাখছে। এ দৃশ্যটি ছিল মূসা (আ) পছন্দ করলেন না এবং তা তাঁর মধ্যে প্রশ্নের উদ্রেক করল। এজন্যই তিনি দুজনকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ “তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ” [সূরা ক্বাসাসঃ ২৩]। কি সেই জিনিস যার কারণে মূসা (আ) এই দৃশ্যটি মেনে নিতে পারলেন না? এটি ছিল তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, যা কোনরূপ বিলম্ব ও অগ্রাহ্য করা ব্যতীতই দুর্বলের প্রতিরক্ষা ও সাহায্য পাওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়ঃ “অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন” [সূরা ক্বাসাসঃ ২৪]। এটা ছিল চারিত্রিক শৌর্য্য, সাহসিকতা এবং বদান্যতার দাবীতে দ্রুত সাড়া দেয়া। আর সেজন্যই কোরআন পূর্বোল্লিখিত আয়াতটির শুরুতে ‘ف’ ব্যবহার করেছে যার অর্থ অনুবর্তীতা, যা দ্বারা এই অবস্থার প্রেক্ষিতে দ্রুত সাড়া দেয়া বোঝায়। অচেনা পরভূমিতে একটা লোক আশ্চর্যের উদ্রেক করবে, যেখানে তার কোন সহায় পরিজন নেই, লম্বা সফর থেকে আগত পরিশ্রান্ত, যার সাথে নেই কোন পথের সহায়, যিনি নির্দয় কঠোর শত্রু দ্বারা নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত। এ ধরনের লোক সাধারণত নিজের অবস্থা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু তাঁর আখলাকের কাছে যা প্রত্যাখ্যানযোগ্য ঠেকল, সেটাকে তিনি নাপছন্দ করলেন এবং সহজাত শৌর্য্যের কারণে এগিয়ে গেলেন যখন তিনি দেখলেন দুজন নারীর প্রতিবেশীরাই তাদের এবং তাদের প্রয়োজনের পরোয়া করছে না।

*এসব দৃশ্যাবলী থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাঁর রিসালাতের অসাধারণ ভার বহন করার জন্য অসাধারণ লোকদেরকেই বাছাই করেন। তাঁদের মহত্ত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হচ্ছে লোকদের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা, তাদের সমস্যাবলীকে নিজেদের সমস্যা মনে করা, তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য দ্রুত ছুটে যাওয়া, তাঁদের করুণার জন্য তাঁরা দুর্বল ও অভাবগ্রস্তদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতেন। প্রত্যেক দুর্গতগ্রস্ত তাঁদের থেকে সাহায্য পেত, পেত সহানুভূতি ও দয়া। আর এজন্যই মানবজাতিকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচানো এবং সত্যের দিকে পথদেখানোর যে দায়িত্ব তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে তা তাদের অন্তরে মানুষের উপকার করা, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের প্রতি অনুকম্পার অনুভূতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাঁদের অন্তর সৃষ্টির প্রতি দয়া এবং স্নেহে ভরপুর।

*আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণের (আ) জীবনীর এই উজ্জ্বল স্পষ্ট তাৎপর্য তো নবীদের ওয়ারিশদের জীবনেও হাজির থাকা উচিত। নবীদের গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য তাদের নবীদের ঐতিহ্যবাহী কাজগুলোও আদায় করতে হবে। আলেম ও দা'ঈদের সামাজিকতার শেকড় অনেক গভীর হতে হবে, যাতে তারা মানুষের প্রয়োজনের সময় তাদের সহায় হতে পারে, তাদের সমস্যাগুলোর জন্য দাঁড়াতে পারে এবং তাদের ব্যাপারগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। মানুষের জন্য তাদের (আ) দয়া মূলত সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহঃ “এটা তো আল্লাহর দয়া যে আপনি তাদের প্রতি কোমল” [সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৯]। এটা ছাড়া জাতির মধ্যে তাঁদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ এবং মানুষের মধ্যে তাঁদের প্রভাব অপর্যাপ্ত থেকে যাবে।

*আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা আমাদের জীবদ্দশায় আমাদের সময়ের ইমাম শায়খ ইবনে বাযকে (রহ) চিনতে পেরেছি। আমরা তাঁর মধ্যে নবুওয়াতী আখলাক এবং এর ঐতিহ্যবাহীতার মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্যশীলতা এবং নবীর পদাঙ্ক অনুসরণের অসাধারণ চিত্র দেখতে পাই। শায়খ (রহ) মানুষের উপকারে তাঁর জীবন, সম্মান ও ধনসম্পদ বিলিয়ে দেয়া, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে ছিলেন আল্লাহর তরফ থেকে একটি নিদর্শন। একই অবস্থা ছিল তাঁর শিক্ষকতা, পথনির্দেশনা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রেও। এজন্য তাঁর প্রভাবও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। মানুষের মধ্যে তাঁর যে মর্যাদা ছিল সেরকম মর্যাদা অন্য কারো ছিল না। উম্মতের মধ্যে আমি তাদেরকেই প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে দেখি যারা নিজেদের মধ্যে নবুওয়াতী জ্ঞানের সাথে সাথে নবুওয়াতী সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী একত্রিত করতে পেরেছিল। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির ওপর রহমত করেছেন এবং তাদেরকে মানুষের জন্য আশ্রয় ও নিরাপদস্থল বানিয়েছেন।

৩ | হে চাচা

নবী (সা) তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষটির কাছে ব্যাপারটি খুলে বললেন। সে মানুষটি হচ্ছে নবীর (সা) পিতা আবদুল্লাহর ভাই। এই মানুষটিই আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। চাচার স্থান পিতৃত্ব এসে দখল করে, এমনকি নবী কারীমকে (সা) আবু তালিবের এতিম ডাকা হত।

তাঁরা পরস্পরকে ভালোবাসতেন। আবু তালিব নবীজিকে (সা) প্রচন্ড ভালোবাসতেন। যখন তিনি সফরে যেতেন, তাঁকে নিয়ে যেতেন। আবু তালিব তাঁকে শামে বাণিজ্য সফরের সময়েও সাথে করে নিয়ে যান, যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর। এত অল্প বয়স বাণিজ্যভ্রমণ বা দূরপথ ভ্রমণের কাঠিন্য বহন করার জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু নিজের সন্তানতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য আবু তালিবের এবং নিজ চাচার জন্য নবী কারীমের (সা) পারস্পরিক ভালোবাসা এটা সম্ভব করেছিল। নবী (সা) তাঁর মোবারক জীবনের বিভিন্ন পর্যায় পার করেছেন যখন আবু তালিব ছিলেন তাঁর সবচেয়ে নিকটজন। এরপর যখন নবী (সা) রিসালাতের ও দাওয়াতের ভার বহন করা শুরু করলেন, তখন আবু তালিব তাঁর সাহায্য ও প্রতিরক্ষার জন্য খ্যাতিলাভ করেন। এরপর তাঁকে কুরাইশদের পক্ষ থেকে শত্রুতা, অবরোধ ও সংকীর্ণতাও সহ্য করতে হয়। কিন্তু এরপরও তাঁর মধ্যে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রতিরক্ষা করার সংকল্পে কোন দুর্বলতা আসে নি। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্ষায় তিনি ছিলেন অটল এবং তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসার ব্যাপারে নির্ভয়ঃ

‘আল্লাহর ঘরের শপথ! তোমরা মিথ্যা বলছ। যদি আমরা মুহাম্মাদের ব্যাপারে হেরে যাই,

আমরা যদি তাঁর জন্য যুদ্ধ বা তাঁকে প্রতিরক্ষা না করি,

এবং তাঁকে সমর্পণ করে দেই যেন আমাদেরকে তাঁর চারপাশ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়,

তবে তো আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরও ভুলে যাবো।’

রিসালাতের দশ বছর পার হয়ে গিয়েছে। মুহাম্মাদের (সা) বয়স তখন ৫০ বছর। আবু তালিবের বয়স ৮৫ বছর। আবু তালিব তাঁর মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁর নিকট বনু মাখযুম থেকে তাঁর মায়ের দিকের আত্মীয়স্বজন আবু জাহেল বিন হিশাম, আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়্যা এবং মুসাইয়্যেব বিন হুযন উপস্থিত হল। নবী (সা) আবু তালিবের জীবনের এ শেষমুহূর্তগুলোতে তাড়াহুড়ো করে তাঁর কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁকে কালেমা বলার জন্য অনুরোধ করতে থাকলেন, যে কালেমা তিনি এর আগেও বারবার আবু তালিবের সামনে পেশ করেছেন এবং তাঁকে তা বলার অনুরোধ করেছেন। পিতার জন্য পুত্রের সমবেদনা নিয়ে নবী (সা) তাঁকে বললেন, "হে চাচা! আপনি মানুষের মধ্যে অধিকারের দিক দিয়ে আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। আপনি এই বাক্যটি বলুন যার ফলে কেয়ামতের দিন আপনার জন্য শাফা'আত করা আমার জন্য বৈধ হবে। হে চাচা, বলুনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটা দিয়েই আমি আল্লাহর সামনে আপনার পক্ষে যুক্তি পেশ করব।" কিন্তু আবু জাহেলও আবেগোদ্দীপক কথাবার্তা বলে আবু তালিবকে তাঁর পিতার ধর্মের প্রতি অটল থাকার জন্য সমর্থন দিতে থাকল। আবু জাহেল বললঃ "আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মকে পরিত্যাগ করবেন ?"

নবী কারীম (সা) আবু জাহেলের কথার প্রত্যুত্তর দেয়ার পরিবর্তে বারবার আবু তালিবের নিকট সেই একই দাবী জানাতে থাকলেনঃ "হে চাচা! বলুনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমি এই বাক্যের কারণে আল্লাহর নিকট আপনার ব্যাপারে সাক্ষী দিতে পারব।" আবু জাহেলও তার সেই আহবানের পুনরাবৃত্তি ও আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকল।

নবী কারীমও (সা) যা শুরু করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন এবং এই ক্রান্তিমুহূর্তে তাঁর চাচাকে যতটা আকুতিমিনতি করা যায় করছিলেন। আবু তালিব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের আহবানে সততা এবং আবেগের উষ্ণতা অনুভব করলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ "হে ভ্রাতুষ্পুত্র, 'আবু তালিব তো মৃত্যু ভয়ে এ কালেমা উচ্চারণ করেছেন' - কুরাইশরা আমাকে এ বলে অপমান করবে বলে যদি আমার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে তোমার দু নয়ন আমার কালেমা পড়ার দৃশ্য দেখে প্রশান্তি পেত।"

শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে আবু তালিব বললেনঃ "আমি আমার গোত্রের সম্মানিত লোকদের ধর্মের ওপর আছি। আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর আছি" এবং তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার

করলেন।

আবু তালিব মারা গেলেন এবং নবী (সা) এ ভেবে দুঃখভারাক্রান্ত হলেন যে, তাঁর যে চাচা তাঁকে এতটা ভালোবাসতেন এবং তাঁকে এতটা সাহায্য করেছেন, সেই চাচা হেদায়েতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারলেন না; যে হেদায়েত দিয়ে নবীকে (সা) প্রেরণ করা হয়েছে এবং যেটার দিকে তিনি আহবান করছিলেন।

তিনি বলেন, যেন তিনি তখনো তাঁর চাচাকে সম্বোধন করে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর চাচা তখনো তাঁকে শুনছিলেনঃ "আমি আল্লাহর তরফ থেকে নিষেধ না আসা পর্যন্ত আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকব।"

অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেনঃ "নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্নীয় হোক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী" [সূরা তাওবাঃ ১১৩]

এরপর আল্লাহ নবীকে (সা) স্বান্তনাস্বরূপ এই আয়াত নাযিল করলেনঃ "আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন" [সূরা ক্বাসাসঃ ৫৬]

এরপরও নবী কারীমের (সা) মনে তাঁর চাচার জন্য দুঃখ রয়ে যায়, যে ব্যাপারে তাঁর সাহাবীরা জানতেন।

এর প্রায় দশ বছর পর নবী (সা) যখন মক্কায় বিজয়ীবেশে প্রবেশ করেন, মক্কাবাসীরা তাঁর হাতে ইসলামের ওপর বাইয়াত দিতে আসে। আবু বকর (রা) তাঁর পিতা আবু কুহাফাকে নিয়ে আসলেন নবী কারীমকে (সা) বাইয়াত দেয়ানোর জন্য। আবু বকরের (রা) বৃদ্ধ পিতা নবীজির (সা) উদ্দেশ্যে তার ক্ষীণকায় দুর্বল হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবু বকর (রা) নবী কারীমের (সা) হাতে তাঁর পিতার হাত দেখে ক্রন্দন করা শুরু করলেন। নবীজি (সা) তাঁর সাহাবীর কান্না দেখে অবাক হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কাঁদছ কেন, হে আবু বকর?" তিনি বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ! আমি কাঁদছি কারণ আমার পিতার হাতের জায়গায় যদি আজ আপনার চাচার হাত থাকত এবং তা দ্বারা আপনার চক্ষু শীতলতা লাভ করত তবে তা আমার নিকট অধিকতর প্রিয় হত। সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আমার পিতার ইসলাম গ্রহণের চেয়ে আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণে আমি অধিকতর খুশি হতাম। এর মাধ্যমে আমি আপনার চক্ষুর শীতলতা দেখতে পারতাম।"

আজও আমাদের হৃদয় এ ভেবে কষ্ট পায়। আমরা আফসোস করি, আবু তালিব যদি সেদিন ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং পরবর্তীতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে মক্কায় বিজয়ীবেশে প্রবেশ করতে দেখতেন, এও দেখতেন যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে! নবীজির (সা) চক্ষুও আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণের দৃশ্যে শীতল হত। “কিন্তু আল্লাহ যাকে চায় পথপ্রদর্শন করেন” [সূরা ক্বাসাসঃ ৫৬][6]

১) আমার অন্তরে এ প্রশ্ন অনেকবার এসেছে যে, নিখাদ যৌক্তিকভাবে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ ও নবীকে (সা) নবুওয়াতকে সত্য প্রতিপন্ন করা উচিত ছিল ? এ প্রশ্নের উত্তর হবে, আবু তালিব।

মানুষের মধ্যে তিনিই রাসূলুল্লাহকে (সা) সবচেয়ে ভালোভাবে জানতেন; তাঁকে তাঁর শৈশবে, বয়ঃসন্ধিকালে, কিশোরকালে, যুবককালে, পূর্ণবয়সে চিনতেন। এ সময়গুলোতে তাঁর সততা, আমানতদারীতা, পবিত্রতাসহ যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলো সম্পর্কে জানতেন। তিনি কোথায় যান, কোথায় আসেন এসব খবরই আবু তালিব রাখতেন। তিনি গর্ব করে বলতেনঃ

‘তারা অবশ্যই জানে, আমাদের সন্তানকে [মুহাম্মাদ (সা)] মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না

আমাদের সন্তান এমন যে মিথ্যা কথা দ্বারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না।’

কিন্তু এরপরেও নবীজির (সা) ১০ বছরের দীর্ঘ দাওয়াত আবু তালিবের অন্তরে কোনরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে নি। তাঁর মৃত্যুশয্যায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাথার নিকট বসে তাঁকে এত করে কালেমা পড়ার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, তিনি তা পড়েন নি। যদি আবু তালিব কালেমা পড়তেন, তাহলে তা রাসূলুল্লাহ (সা) ও সকল মুসলিমের চক্ষুর শীতলতার কারণ হত।

এসব কিছুই এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণ যে, হেদায়েত হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ যাঁকে খুশি তাকে এই অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞার মাধ্যমে কাকে কাকে হেদায়েত প্রদান করবেন সে ব্যাপারে তিনিই অধিক জ্ঞাত। আর এজন্যই দেখা যায় যে, কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে প্রথম সাক্ষাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এ তাৎপর্য উদ্ভূত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে মুসলিমরা যেদিন হেদায়েত লাভ করে সেদিন থেকেই তাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অনুভব করতে পারে; যেখানে আল্লাহর সৃষ্টির অনেকেই পথভ্রষ্ট। আর এজন্যই আমরা প্রতিটি নামাযের

প্রতি রাকাআতেই আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনিনয় করে বলিঃ "اهدنا الصراط المستقيم" (আমাদের সরল পথ দেখাও)। হেদায়েত যদি কেবল ইলমের মাধ্যমে অর্জিত হত, তবে আবু তালিবই সর্বপ্রথম সবার আগে হেদায়েত লাভ করতেন কেননা রাসূলুল্লাহকে (সা) তিনিই সবচেয়ে ভালোভাবে জানতেন। "কিন্তু আল্লাহ যাকে চান পথপ্রদর্শন করেন এবং তিনিই সুপথপ্রাপ্তদের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত" [সূরা ক্বাসাসঃ ৫৬]।

২) এতে তাদের জন্য চূড়ান্ত স্বান্তনা রয়েছে, যারা কাউকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে সফল হয় নি। নবী কারীম (সা) তাঁর চাচাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাঁকে সবচেয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু এরপরও আবু তালিব সেই দাওয়াতে সাড়া দেন নি। এর আগে নূহও (আ) তাঁর পুত্র এবং ইব্রাহীম (আ) তাঁর পিতার ওপর একইরকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে এই নবীদের এই অবস্থার মধ্যে এমন প্রত্যেক দা'ঈর জন্য স্বান্তনা রয়েছে, যারা তাদের প্রিয় মানুষদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু সত্য তাদের অন্তরে স্থান করে নেয় নি।

৩) আল্লাহ আবু তালিবকে তাঁর নাম বা কুনিয়াত কিংবা তাঁর বর্ণনা ধরে উল্লেখ করেন নি, বরং তাঁর প্রতি নবীজির (সা) আবেগের দিকটি উল্লেখ করেছেনঃ "তুমি যাকে ভালোবাস।" নবীজির (সা) তাঁর চাচার প্রতি যে ভালোবাসাকে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, সেটা নিকটাত্মীয়তা উদ্ভূত সহজাত ভালোবাসা এবং যা অনুগ্রহ ও সদগুণাবলীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অনুগ্রহকারীর প্রতি মানব অন্তরে ভালোবাসার সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। নবীজি (সা) আবু তালিবের প্রতি বিনম্র ছিলেন এবং নিজের প্রতি আবু তালিবের অনুগ্রহের কদর করতেন। তাঁর প্রতি ছিল নবীজির (সা) সহজাত ভালোবাসা এবং তিনি আবু তালিব হেদায়েতপ্রাপ্ত হোক সেটাও পছন্দ করতেন, যা ছিল শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধ।

অমুসলিম হলেও নিকটাত্মীয়, অনুগ্রহকারী ও শৌর্য্যধারীদের জন্য সহজাত ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া যেকোন নিখাদ অন্তরেরই বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে আমাদের জন্য নবীজির (সা) দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

৪) আমরা দেখেছি আবু জাহেল আবু তালিবকে তাঁর জীবনের শেষ সংকটময় মুহূর্তে আবেগে আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। সে না তো নবীজির (সা) আহবানের যৌক্তিক বিরোধিতা করে, আর না সে তার মতের দিকে প্রমাণ সহকারে আহবান করে। সে আবু তালিবের সামনে কেবল এই যুক্তিই পেশ করে যে, এই পৌত্তলিকতা

আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছিল। আবু জাহেলের এ কথায় কোন প্রমাণ বা যুক্তি নেই, বরং সে পূর্বপুরুষদের ধর্মের কথা উল্লেখ করে আবু তালিবকে আবেগে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তাঁকে এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে, যদি তিনি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেন তবে তা হবে তাঁর পূর্বপুরুষ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অবাধ্যতা। এ ধরনের ছালচাতুরীতে আবু জাহেল পারদর্শী ছিল এবং বহুবার সে তা কাজে লাগায়।

আবু জাহেলের এই কৌশল তার অনেক অনুসারীদেরকেও দলবদ্ধ বিরোধিতার পন্থায় ব্যবহার করতে দেখা যায়। এর পেছনে কোন মূলনীতি নেই, না আছে কোন ভিত্তি।

জেনে রাখা ভালো যে, যে তিনজন আবু তালিবের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে কুফরের ওপর অটল থাকার জন্য কানপড়া দিয়েছিল, তাদের দুজন পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুসরণ করে এবং আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম পরিত্যাগ করে। এ দুজন হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন আবু উমাইয়্যা এবং মুসাইয়্যেব বিন হুযন। প্রথমজন হুনাইন যুদ্ধের দিন শাহাদাত বরণ করে।

৫) নিজ চাচা আবু তালিবের জীবনের এই ক্রান্তিমুহূর্তে নবীজির (সা) মানসিক স্থিরতা ও কোমলতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তিনি নিজ চাচার সামনে হেদায়েতের দাওয়াত তুলে ধরছেন - এসময় তিনি আবু জাহেলের পক্ষ থেকে প্ররোচনার শিকার হন। আবু জাহেল মূলত তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য নবীজির (সা) দাওয়াতে উপদ্রব সৃষ্টি করছিল। কিন্তু এরপরও নবী কারীম (সা) আবু জাহেলের সাথে জেদীপনা দেখান নি। কোন বর্ণনাও এমন পাওয়া যায় না যে, নবী (সা) তার কথার জবাবে একটি শব্দও বলেছেন। আবু জাহেলের লক্ষ্যও সম্ভবত এটাই ছিল যে, নবীজিকে (সা) তার সাথে বাদানুবাদে ব্যস্ত রাখবে। কিন্তু নবী (সা) নিজ লক্ষ্যে অটল থাকেন এবং কোমলতার সাথে তার দাবী করে যেতে থাকেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহর সিদ্ধান্ত চলে আসে। এরপরও নবী কারীমের (সা) মানসিক স্থিরতা বহাল থাকে, যদিও আবু তালিবের মৃত্যু তাঁর জন্য প্রচন্ড দুঃখজনক ও পীড়াদায়ক ছিল। তিনি আবু তালিবের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় কেবল এটাই বলেনঃ “আমি এরপরও আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে যাব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাকে আল্লাহর তরফ থেকে নিষেধ করা হয়।” তিনি আবু জাহেলের কথার জবাবে কিছুই বলেন নি, তার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ব্যস্ততাও দেখান নি।

এ ধরনের উস্কানীমূলক ও কঠিন পরিস্থিতিতেও নবী মুহাম্মাদের (সা) মানসিক স্থিরতার মধ্যে মধ্যে ফলহীন কাজে সময় ও প্রচেষ্টা বরবাদ না করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দেয় এমন পার্শ্ব ব্যস্ততায় মগ্ন না হওয়ার

চূড়ান্ত শিক্ষা রয়েছে।

মুহাম্মাদের (সা) চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের এ ছিল অন্যতম এক দৃশ্য। “আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী” [সূরা ক্বালামঃ ৪]।

৪ । হে আল্লাহ, আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম

ঘটনাটি ঘটার প্রায় ৩০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই দৃশ্য এখনো তাঁর চোখে ভাসে, যেন তিনি একটি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন।

তিনি কুফার বাইতুল মালে বসা, যেটার দায়িত্বশীল তিনি। তাঁর চারপাশে বসা তাবেয়ীগণ, যাঁদের নিকট তিনি যা দেখেছেন তা বর্ণনা করে চলছেন। তাঁর বর্ণনায় উঠে আসছে আল্লাহর নিদর্শন এবং নববী মোজেযার একটি ঘটনা। আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রা) বর্ণনায় উঠে আসছে মক্কার নববী দাওয়াতের যুগের একটি ঘটনা। আবু তালিব তখন মারা গিয়েছেন। কুরাইশরা তখন রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে এমন সব দুঃসাহস দেখাচ্ছে, যা আবু তালিবের জীবদ্দশায় সম্ভব ছিল না। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) তাবেয়ীদের সেসময়ের একদিনের ঘটনা বলছিলেন। ঘটনাটি হল এরূপঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং কাবার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ান নামায পড়ার জন্য। তিনি নামাযের ক্বিয়াম, রুকু ও সেজদা অনেক সময় নিয়ে করছিলেন। আবু জাহেল হিজরে ইসমাইলের ওখানে বসা ছিল আর তার চারপাশে কুরাইশদের কাফের সরদাররা। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) তাদের এমনভাবে গুণে গুণে উল্লেখ করছিলেন, যেন তারা তাঁর চোখের সামনে উপস্থিত। তারা ছিলঃ উতবা বিন রাবী'আ, শাইবা বিন রাবী'আ, ওয়ালীদ বিন উতবা, উমাইয়্যা বিন খালফ, উমারা বিন ওয়ালীদ এবং উক্ববা বিন আবী মুঈত।

আবু জাহেল যখন দেখল রাসূলুল্লাহ (সা) লম্বা সময় নিয়ে সেজদা করছেন, তখন সে তার সঙ্গীদের বললঃ "তোমরা কি এ দৃশ্য দেখছ না ? অমুক গোত্র গতকাল মক্কার এক অংশে উট জবাই দিয়েছে। তোমরা কে সেই জবাই করা উটের বিষ্ঠা, রক্ত ও নাড়িভুড়ি নিয়ে আসতে পারবে; এরপর মুহাম্মাদের সেজদায় যাওয়ার অপেক্ষায় থাকবে, এরপর সে যখন সেজদায় যাবে তখন তার পিঠে তা চাপিয়ে দিতে পারবে ?" তারা যেন নবীজিকে (সা) ভয় পাচ্ছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টজন উক্ববা বিন আবী মুঈত বললঃ "আমি পারব।" এরপর সে গিয়ে জবাই করার উটের অবশিষ্টাংশ – বিষ্ঠা এবং নাড়িভুড়ি – বহন করে নিয়ে আসল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সেজদায় গেলেন, তখন তাঁর দু কাধের মাঝে তা ছুঁড়ে ফেলল। আবু জাহেল ও তার

সাঙ্গপাঙ্গরা রাসূলুল্লাহর (সা) এ অবস্থা দেখে বিদ্রুপাত্মকভাবে হাসাহাসি করতে থাকল, এমনকি হাসির চোটে তারা একে অপরের গায়ে ঢলে পড়তে থাকল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেজদায় স্থির হয়ে থাকলেন, মাথা উঠালেন না।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললেনঃ "আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলাম। আমার কিছুই করার ছিল না। মক্কায় আমাকে রক্ষা করার মত কোন পরিবার পরিজন ছিল না। আমি আবু জাহেল ও তার সাথে থাকা লোকদের ভয় করতাম। যদি মক্কায় আমাকে রক্ষা করার মত কেউ থাকত, তাহলে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পিঠ থেকে আবর্জনার বোঝা সরিয়ে দিতাম। তবে এ দৃশ্য দেখে এক লোক মুহাম্মাদের (সা) কন্যা ফাতিমার (রা) কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে ব্যাপারটি জানাল। তিনি তখন অল্প বয়স্ক বালিকা ছিলেন। তিনি এ খবর শুনে দৌঁড়ে গিয়ে তাঁর পিতার পিঠ থেকে আবর্জনার বোঝা সরিয়ে দিলেন। এরপর আবু জাহেল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের গালিগালাজ করলেন এবং যে একাজ করেছে তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। তারা ফাতিমাকে (রা) জবাবে কিছুই বলল না। আবর্জনা সরানোর পর নবী কারীম (সা) সেজদা শেষ করে স্বাভাবিকভাবে মাথা উঠালেন এবং তাঁর সালাত যথানিয়মে শেষ করলেন। তিনি বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি কাবার দিকে মুখ ঘুরালেন। এরপর তিনি উচ্চস্বরে দোয়া করতে থাকলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, এরপর বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি কুরাইশদের ব্যাপারে আপনার নিকট অভিযোগ করছি; হে আল্লাহ! আমি কুরাইশদের ব্যাপারে আপনার নিকট অভিযোগ করছি; হে আল্লাহ! আমি কুরাইশদের ব্যাপারে আপনার নিকট অভিযোগ করছি।" রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন তিনবার দোয়া করতেন, যখন কিছু চাইতেন তিনচার চাইতেন। আবু জাহেল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) এই দোয়া শুনল, তাদের হাসি উবে গেল। তারা তাঁর দোয়ার ব্যাপারে ভয় করতে লাগল। তারা ভাবত, এই শহরে দোয়া কবুল হয়।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) নাম ধরে ধরে বদদোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আবুল হাকাম বিন হিশাম, উতবা বিন রাবী'আ, শাইবা বিন রাবী'আ, ওয়ালীদ বিন উতবা, উমাইয়্যা বিন খালফ, উক্বা বিন আবী মুঈত এবং উমারা বিন ওয়ালীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি।" তিনি গুণে গুণে সাতজনের নাম ধরে উচ্চারণ করেন। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) সেদিনই তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে দেখেছি।"

এরপর পাঁচ বছরও যায় নি। বদরের যুদ্ধে মক্কা থেকে মুশরিক বাহিনী ঔদ্ধত্য ও জাঁকজমকতার সাথে বেরিয়ে আসে নবী (সা) এবং তাঁর রিসালাতের মূলোচ্ছেদ করার জন্য। যুদ্ধে আল্লাহ তাঁর রাসূলের (সা) জন্য সাহায্য নাযিল করেন এবং মুশরিকরা শোচনীয় পরাজয়ের শিকার হয়। যুদ্ধের ময়দানে থাকতেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "কে দেখে আসবে আবু জাহেলের কি অবস্থা?" আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, "আমি যাব, হে রাসূলুল্লাহ।" তিনি গিয়ে নিহতদের মধ্যে আবু জাহেলের খোঁজ করতে থাকলেন এবং তাকে প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস বের হবে হবে এই অবস্থায় দেখতে পেলেন। এরপর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তার দাড়ি ধরে বললেন, "তুমিই কি আবু জাহেল? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাকে অপদস্থ করেছেন, হে আল্লাহর শত্রু।" আবু জাহেল বললঃ "আমাকে বল, আমাদের কি জয় হয়েছে নাকি পরাজয়?" ইবন মাসউদ জবাব দিলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই জয় হয়েছে।" এভাবেই ইবনে মাসউদ (রা) বদরে আবু জাহেলকে অপদস্থ ও পরাজিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন, যেভাবে তিনি তাকে মক্কায় উদ্ধত ও অনাচারী হিসেবে দেখেছেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) বাকি যে ছয়জনের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন, তাদের ব্যাপারে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, "সেই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদকে (সা) সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহর রাসূল (সা) যাদের যাদের নাম নিয়েছিলেন তাদের সবাইকে আমি বদরের দিন নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। সূর্যের তাপে তাদের মৃতদেহে পরিবর্তন ঘটে। বদরের দিন অনেক গরম পড়েছিল। একমাত্র উমাইয়্যা বিন খালফ ছাড়া তাদের সবার দেহকে টেনে বদরের কূয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। উমাইয়্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সে ছিল মোটা। তাই তাকে তার জায়গাতেই দাফন করা হয়।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বদরে তিনদিন অবস্থান করেন। কোন যুদ্ধে জয়লাভ করলে তিনি পরাজিত গোষ্ঠীর আঙ্গিনায় তিনদিন অবস্থান করতেন।

তৃতীয় দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উট নিয়ে আসার আদেশ দিলেন এবং সেটার ওপর মালামাল চাপালেন। এরপর তিনি হাঁটা শুরু করলেন এবং তাঁর সাহাবীরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। তাঁরা বললেনঃ আমরা ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজনে হেঁটে চলছেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি সেই কুয়ার কিনারায় এসে থামলেন যেটাতে কাফেরদের মৃতদেহগুলোকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। এরপর তিনি তাদের ও তাদের পিতার নাম ধরে ধরে ডাক দিলেনঃ "হে আবু জাহেল বিন হিশাম, হে উমাইয়্যা বিন খালফ, হে উতবা বিন রাবীআ, হে শাইবা বিন রাবীআ, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমাদের কি খুশি লাগছে যে, তোমরা এখন আল্লাহ

এবং তাঁর রাসূলের সামনে সমর্পিত? আমি তো আমার রবের ওয়াদাকে সত্য হিসেবে পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের রবের ওয়াদাকে সত্য হিসেবে পেয়েছ?" এ দৃশ্য দেখে সাহাবীগণ অবাক হয়ে বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ! তারা কিভাবে আপনার কথা শুনবে এবং এর জবাব দেবে? আপনি তো তিনদিন তাদের এ অবস্থায় ফেলে রাখলেন। এখন তো তাদের দেহে পচনও ধরেছে। আপনি এমন লোকদের সাথে কথা বলছেন, যাদের দেহে রূহ নেই।" নবী কারীম (সা) জবাব দিলেনঃ "সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের চাইতে ভালো করে শুনছ না। কিন্তু তারা এর জবাব দিতে পারছে না।"

আল্লাহ তাদের ভর্ৎসনা, হেয় ও শাস্তিস্বরূপ এবং তাদের দুঃখ ও অনুতাপ বাড়াতে রাসূলুল্লাহর (সা) কথাগুলো শোনানোর জন্য তাদের কয়েক মুহূর্তের জন্য জীবিত করেছেন।[7]

১) আমাদের কাছে আল্লাহর রিসালাত পৌঁছানোর জন্য তাঁর ওপর এ ঘটনাসহ আরো যা যা বিপদাপদ এসেছে সেগুলোর কয়েকটির ওপর চিন্তাভাবনা করলে এ মহান নবীর (সা) প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দরুদ ও সালাম বের হয়ে আসে।

নবীজি (সা) বাইতুল্লাহর পাশেই আল্লাহর কাছে মোনাজাতে ডুবে আছেন, আর ঠিক এমনসময় কাফেরদের দুঃসাহস এতটাই বাড়ল যে, তারা নবীজির (সা) পবিত্র পিঠে আবর্জন ফেলল। এসময় তাঁর মনে যে আঘাত তিনি পেয়েছেন এর চেয়ে বেদনাদায়ক আঘাত আর কি হতে পারে?

এসময় এ দৃশ্য দেখে রিসালাতের শত্রু কুরাইশ সরদাররা তাঁকে উদ্দেশ্য করে হাসি তামাশা করতে করতে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ছে আর তিনি আবর্জনার নিচে চাপা পড়ে আছেন। এই তিক্ত অবস্থায় তাদের এই হাসিতামাশা শোনার চেয়ে বড় ব্যথা আর কি হতে পারে?

এসময় তাঁকে সাহায্য করার জন্য নিজের অল্পবয়সী কন্যা ছাড়া তাঁর আর কেউ ছিল না। এর চেয়ে বড় বেদনা আর কি হতে পারে?

তিনি জানতেন, প্রত্যেক কন্যাই তার পিতায় মুগ্ধ। সে তার পিতাকে সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর অবস্থায় দেখতে চায়, তাকে নিজের সাহায্যকারী ও আশ্রয় হিসেবে দেখতে চায়। অথচ রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা তাঁকে এ অবস্থায় দেখে তাঁর পিঠ থেকে আবর্জনা সরিয়ে, এই জঘন্য কাজ যে করেছে তাকে গালি দিয়ে এবং তার

বিরুদ্ধে বদদোয়া করে উলটো নিজ পিতাকে সাহায্য করেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য এর চেয়ে বড় কষ্ট আর কি হতে পারত ?

এ অবস্থায় কোন অন্তর যদি দুঃখ-কষ্টে ভেঙ্গে পড়ে তবে আল্লাহর শপথ এ ব্যাপারে তাকে দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু, রাসূলুল্লাহ (সা) এ অবস্থার মধ্যেও সবর করেছেন।

আরেকটি ব্যাপারও লক্ষ্য করার মত। রাসূলুল্লাহ (সা) অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ এই আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু রিসালাত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার পর থেকেই তিনি সব কিছু সহ্য করার জন্য নিজ অন্তরকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। কোন বাধা সৃষ্টিকারী তাঁকে তার দায়িত্ব থেকে সরাতে পারে নি। তিনি এ সব কিছুরই মোকাবেলা করেছেন সব রাসূলগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দৃঢ়তা দিয়ে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর (সা) ওপর আল্লাহর অসংখ্য রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

২) এ ধরনের নিচু কাজ, এমনকি শত্রুতার ক্ষেত্রেও এ ধরনের হীন কাজ করে প্রতিহিংসা মেটানোর স্বভাব আরবদের মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও, কুরাইশ সরদাররা এ ধরনের কাজ কিভাবে করতে পারল ? আরবদের স্বভাব তো ছিল এমন যে, তাদের কেউ প্রতিপক্ষকে তলোয়ার দিয়ে নিবৃত্ত করে বলতঃ 'সে তো একজন উদার সজ্জন লোককে হত্যা করে ফেলল।'

আবু জাহেল কিভাবে তাদেরকে উটের আবর্জনাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার মত হীন কাজের দিকে ঠেলে দিল, যেখানে আরব সরদাররা নিজেদের এধরনের আচরণের ঊর্ধ্বে মনে করত ?

কিভাবে আবু জাহেল তাদেরকে বনু হাশিমের বিরুদ্ধে কৃপণতা ও খাদ্য-অবরোধকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের দিকে ঠেলে দিল, যেখানে আরবরা বদান্যতা, খাওয়ানো, খাদ্যপাত্রের প্রসারতা এবং উপহার প্রদানে উদারতার জন্য পরস্পর গর্ব করত ?

এর কারণ, এই শত্রুতার মূলে রয়েছে হিংসা ও ঘৃণা, যা সবচেয়ে নোংরা, তিক্ত ও অনাচারমূলক শত্রুতা। এ ধরনের শত্রুতায় মূল্যবোধ ও চারিত্রিক মাপকাঠি অনুপস্থিত থাকে। শত্রুতার গোড়া যদি মতভিন্নতা বা প্রতিশোধগ্রহণের স্পৃহাও হয়, তাহলেও তা এরকম চারিত্রিক নিকৃষ্টতার কারণ হয় না। কিন্ত এটা হচ্ছে ইবলিস, ফেরাউন ও এ উম্মাহর ফেরাউনের (আবু জাহেল) শত্রুতা।

৩) উতবা বিন রাবী'আ এবং তার ভাই শাইবা দুজনই পান্ডিত্য, বুদ্ধি এবং মতামতের যথার্থতার জন্য পরচিত ছিল। উমাইয়্যা বিন খালফও বনু জুমাহর সরদার ছিল। উমারা বিন ওয়ালীদ বিন মুগীরা ছিল বনু মাখযুমের সরদারের ছেলে। তাহলে এদের প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং চারিত্রিক গুণাবলী কিভাবে গায়েব হয়ে গেল যখন তারা সবাই মিলে এ ধরনের হীন কাজ করল? অথচ আবু জাহেল যখন প্রথমবারের মত এ কাজ করার প্রস্তাব তাদের সামনে পেশ করে তারা তা করতে ভয় পাচ্ছিল।

এর রহস্য হল আবু জাহেলের চতুরতা এবং বয়সে ও কর্তৃত্বে বড় এমন লোকদের পরিচালনা, তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করার অসাধারণ দক্ষতা। এটা ছিল আবু জাহেলের সহজাত ক্ষমতা, যা সে অবক্ষয়মূলক কাজে ব্যবহার করেছে। এ ব্যাপারে তার দক্ষতা সুস্পষ্ট। সে এসব নেতৃস্থানীয় কুরাইশ সরদারদের এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করা থেকে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে চিন্তার দিকে পরিচালিত করেছে, যেখানে প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা আর থাকে নি। তার আরেকটি চতুরতা ছিল এই যে, সে এ কাজটি নিজের কাঁধে তুলে না নিয়ে, তাদের সবার সামনে এমনভাবে পেশ করে যেন তা তাদের সবার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। সে জানত, উতবা বিন রাবী'আ, তার ভাই, তার ছেলে, উমাইয়্যা, উমারা - এদের কেউই এই কাজের দায়িত্ব নেবে না। এ নির্বুদ্ধিতামূলক কাজের একমাত্র প্রার্থী উক্ববা। যদিও তার মধ্যে মূর্খতা এবং উদ্ধত দুঃসাহস বিদ্যমান, কিন্তু এরপরও আবু জাহেল এ গুণের ওপর ভরসা করে তাকে এ কাজ করতে বলেনি। কারণ এমনটা করলে উক্ববা হয়তো এটাকে হীন কাজ মনে করে তা করতে অস্বীকৃতি জানাত। আবু জাহেল মূলত তার কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু উক্ববাই প্রথম পদক্ষেপ নিল এবং নিজে থেকেই এ দায়িত্ব নিজ কাধে তুলে নিল। যখন উক্ববা এই হীন কাজ সম্পন্ন করল, বাকি সবাই এতে শরীক হল; নির্দেশদাতা, সক্রিয়, নিশ্চুপ সকলেই উপহাস ও অট্টহাসিতে শামিল হল। প্রথম কথা বলেছিল আবু জাহেল, আর শেষমেষ সকলেই এই জঘন্য অপরাধে শরীক হল।

আবু জাহেলের মত এরকম অনেক নিকৃষ্ট লোকদের ইতিহাসে পাওয়া যায়, যারা বিভিন্ন দল, সংস্কৃতি অথবা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা শেষপর্যন্ত বিনাশ ও ধ্বংসের দিকেই নিয়ে গিয়েছে। আর তাদের অনুসারীরাও তাদের সাথে বুদ্ধির অস্তগামীতার দিকে ধাবিত হয়েছে। তাদের হুঁশ তখনই ফিরেছে যখন তারা তাদের বেদনাদায়ক পরিণতির মুখোমুখি হয়েছে। তবে সবচেয়ে তিক্ত ও হতাশাজনক হুঁশে ফেরা হবে আখেরাতে,

যেদিন এসব অনুসারীরা আর কোন কৌশল খুঁজে পাবে না। তাদের অনুসৃতদের সেদিন খেদ নিয়ে এটা ছাড়া আর কিছুই বলার থাকবে না যে, "তোমাদের জন্যই আমরা ঈমান আনতে পারলাম না।"

চারপাশে তাকালে এমন অনেক একচোখা ও মোটাবুদ্ধির মানুষ দেখা যায়, যারা নীচ লোকদের পিছে ছুটে চলে, যারা এসব অনুসারীদের দক্ষতার সাথে ধ্বংসের তলানীতে নিয়ে যায়।

৪) নবী (সা) দোয়া কবুল করাটাই ছিল তাঁর ওপর আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান। এই দোয়ার চূড়ান্ত রূপ ছিল এসব কাফের সরদারদের দুর্ভোগ জারী রাখা। তারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ছাড়ে নি। এরপর নবী (সা) তাদের যুদ্ধের ময়দানে কুপোকাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন। যুদ্ধের দিন সূর্যের তাপে তাদের মৃতদেহ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল, যুদ্ধে তাদের জয়লাভ হবে। এরপর আল্লাহ মহাবিশ্বের আইনের বিপরীতে গিয়ে তাদের মৃত্যুর পর এবং আল্লাহ তাদের যে বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন তা প্রত্যক্ষ করানোর পর তাদের তিনবার নবীর (সা) এ কথা শোনালেনঃ "তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদাকে সত্য হিসেবে পেয়েছ ?"

তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজের দায়িত্ব নেয়া নিকৃষ্টজন উক্বা যুদ্ধে বন্দী হয় কিন্তু তাকে সাথে সাথে হত্যা করা হয় নি। এটা একারণে যে, যে নবীর (সা) বিরুদ্ধে সে সবচেয়ে বড় দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তাঁকে যেন সে যুদ্ধে জয়লাভ করে অতঃপর নিহতদের দাফন করতে, যুদ্ধবন্দীদের তাড়িয়ে নিতে, গনীমতের ভাগবন্টন করতে এবং মদীনায় বিজয়ী হিসেবে ফিরে যেতে দেখতে পায়। তার চোখ যেন এসব দৃশ্যাবলীতে ভরে উঠেছিল। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার নিকটবর্তী হন, তাঁর নির্দেশে সেই দুরাচারের শিরশ্ছেদ করা হয়। নবী (সা) অনাচারকারীদের থেকে যে হাসি-বিদ্রূপ ও কষ্টের শিকার হয়েছিলেন তার বিনিময়ে এসবই ছিল আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর নবীর (সা) অন্তরের জন্য প্রতিকার স্বরূপ।

এরপর নবীর (সা) ওপর আল্লাহর আরেকটি রহমত ও সম্মান ছিল, এসব কাফের সরদারদের সন্তানরা নবীর (সা) দিকে ধাবিত হয় এবং নবী (সা) তাদের নিজের রিসালাতের ওপর ঈমান আনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা সেই দ্বীনকে অনুসরণ করেছে যেটার জন্য তাদের বাবারা নবীকে (সা) কষ্ট দিয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ইকরিমা বিন আবু জাহেল, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা, আবু হুযাইফা বিন উতবা, খালিদ বিন ওয়ালীদ বিন মুগীরা, উক্বা বিন আবী মু'ঈতের দুই সন্তান উম্মে কুলসুম ও ওয়ালীদ – এদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে, এর ওপর অটল থাকে এবং এর ওপরই মৃত্যুবরণ করে।

৫) ইবন মাসউদের (রা) রেওয়ায়েত থেকে স্পষ্ট যে, এ ঘটনায় খোদায়ী নিদর্শন ও নবীর (সা) মোজেযা বিদ্যমান। ইবন মাসউদ (রা) সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন যখন রাসূলুল্লাহকে (সা) উটের আবর্জনায় চাপা দিয়ে কষ্ট দেয়ার দুঃসাহস দেখানো হচ্ছিল এবং রাসূলুল্লাহও (সা) সেসময় শক্তি ও প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে দুর্বল ছিলেন। ইবনে মাসউদ (রা) যখন এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করছিলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফার খলিফা উমার বিন খাত্তাব (রা) কর্তৃক কুফার বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ইতোমধ্যেই দেখেছেন, কিভাবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসেছে এবং মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছে। তিনি দেখছেন, কিভাবে কিসরা ও কায়সারের সাম্রাজ্য খর্ব হয়েছে এবং তাদের ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ভাগ বাটোয়ারা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর আদেশকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তাঁর দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেছেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। ইবনে মাসউদ যে দিন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যে দিন ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন – এ দুদিনের মধ্যে কতই না বিশাল পার্থক্য !

৬) ইবনে মাসউদ যেদিন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যেদিন ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন – এ দুদিনের ঘটনার ব্যাপারেই তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ইবনে মাসউদ যেদিন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন সেদিন তিনি তাঁর অবস্থার ব্যাপারে জানতেন। তিনি জানতেন, তিনি মক্কায় দুর্বল। এখানে তাঁর কোন আত্মীয় পরিজন নেই। তিনি ছিলেন বনু হুযাইলের সদস্য এবং কুরাইশদের মিত্র। কিন্তু তিনি কুরাইশী ছিলেন না। তিনি আকাঙ্খা করেছিলেন, তাঁর যদি শক্তি থাকত তাহলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) পিঠ থেকে আবর্জনার বোঝা সরিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর সে শক্তি ছিল না। তাই তিনি যা দেখলেন তার ওপর ধৈর্য্য ধারণ করলেন। এ ছিল এমন এক ব্যথার জন্য সবর, তাঁর নিজের পিতার পিঠে এই আবর্জনা ঢেলে দিলেও এর চাইতে কম কষ্ট হত। রাসূলুল্লাহর (সা) পিঠে না ঢেলে, ইবনে মাসউদের (রা) দুই চোখেও যদি মুশরিকরা আবর্জনা ঢেলে দিত তাহলেও তাঁর নিকট তা অধিক পছন্দনীয় হত। এরপরেও তিনি অপরিণামদর্শী ও নিষ্ফলভাবে কোন ব্যবস্থা নিতে ছুটে যান নি। যদি তিনি সেদিন কুরাইশদের প্রতিরোধ করতেন, তাহলে তাদের অনিষ্টতা ও ঔদ্ধত্য আরো বৃদ্ধি পেত। এর কারণ হচ্ছে, কুরাইশদের মিত্র কিন্তু তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কেউ তাদের বিরদ্ধে দুঃসাহস দেখানোর কারণে তাদের ঘৃণা আরো বৃদ্ধি পেত। তারা সেই দুঃসাহস প্রদর্শনকারীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ত কারণ মক্কায় তাকে রক্ষার জন্য আত্মীয়-পরিজন ও শক্তি কিছুই নেই। সেক্ষেত্রে এটা হত অসম লড়াই এবং এর ফলাফলও হত অলাভজনক।

এর ফলে সেই অবস্থায় তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল সেটাই তিনি করেছেন, আর সেটা হচ্ছে কোন পদক্ষেপ না নেয়া।

ইবনে মাসউদের (রা) এই ফিক্বহের যথার্থতার প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ কর্তৃক এর অনুমোদন। রাসূলুল্লাহ (সা) এ ব্যাপারে তাঁকে কখনো সমালোচনা করেন নি, আর না তাঁর থেকে এর বেশি কিছু দাবী করেছেন। ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করলেও কখনো এ ব্যাপারে রাসূলের (সা) অনুযোগ অনুভব করেন নি। আর এজন্যই ইসলামের সম্মান ও বিজয় যখন প্রতিষ্ঠিত, ইবনে মাসউদ (রা) যা দেখছেন তার সবই বর্ণনা করেছেন। সেই ঘটনা ঘটার দিন তাঁর যে অবস্থা ছিল সেটাও চূড়ান্ত বিশ্বস্ততার সাথে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এটা অনুভব করেন নি যে, তাঁর সেইদিনকার অবস্থান ছিল নিন্দনীয় ও ত্রুটিপূর্ণ।

অনেকটা এমন যে, কেউ যদি ইবনে মাসউদকে (রা) তাঁর এই অবস্থানের জন্য নিন্দা করত, তাহলে তিনি যেন বলতেন, "আমাকে এ অবস্থায় তোমার চাইতেও শ্রেষ্ঠ একজন দেখেছেন, কিন্তু তিনি আমার নিন্দা করেন নি, আমাকে ভুল সাব্যস্তও করেন নি।"

যদি ইবনে মাসউদের (রা) মত উম্মতে মুহাম্মাদীরও নবী (সা) আনীত হেদায়াতের বুঝ থাকতো, তাহলে এ উম্মত এর শক্তি ও সক্ষমতার কতটাই না হেফাজত করতে এবং তা কাজে লাগাতে পারত, যা অসম লড়াইয়ে বরবাদ হয়েছে এবং যা কেবল ক্ষয়ক্ষতিই ডেকে এনেছে!

৭) ইবনে মাসউদের (রা) একটি কথা কি চমৎকার ও হৃদয়ের পুরোটা গ্রাস করে নেয়ার মত নয়? তিনি তো রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াতের একদম শুরু থেকেই তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন। তিনি কুরাইশদের কঠোরতা, নিপীড়ন, হিংস্রতা, শত্রুতা, বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত, নবী (সা) ও তাঁর দাওয়াতকে হেয় করার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা এরকম সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন শিয়াবে আবু তালিবে নবীকে (সা) অবরোধ এবং মদীনায় নবীর (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কুরাইশদের সৈন্য পরিচালনা। এরপরেও ইবনে মাসউদ (রা) বলেনঃ "আমি তাঁকে [নবী (সা)] সেদিন ছাড়া আর কোনদিন তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে দেখিনি।" এর মধ্যে নবীজির (সা) অসাধারণ নম্রতা, সুদীর্ঘ ও অসাধারণ ধৈর্য্যের দেখা মেলে।

৮) ফাতেমা (রা) এসে না সরানো পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) কেন পিঠে আবর্জনা নিয়ে সেজদায় স্থির রইলেন? কেন তিনি সেজদা থেকে মাথা উঠান নি? তিনি তাঁর সেই সেজদায় আল্লাহর কাছে কি বলেছিলেন?

আমরা তা জানি না। তবে আমরা এটা জানি যে, নবীজির (সা) স্থির থাকাতে তারা যে দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগের অপেক্ষায় খুঁজছিল তাতে ছেদ পড়ে। তারা অপেক্ষা করছিল, নবী (সা) অশান্ত ও আতঙ্কিত অবস্থায় উঠে দাঁড়াবেন। এরপর তিনি আবর্জনাগুলো ফেলার চেষ্টা করবেন, ফলে আবর্জনাগুলো তাঁর পোশাক ও দেহে ছড়িয়ে পড়বে। যা দেখে কুরাইশ সরদারদের হাসি-তামাশা ও উপহাস আরো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু নবী কারীমের (সা) স্থিরতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলে তাদের এসব সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

আমাদের এ বিশ্বাস আছে যে, নবীজি (সা) তাঁর স্থিরতার মাধ্যমেই যেন তাঁর অবস্থার ভাষা দিয়ে তাঁর রবের নিকট মোনাজাত করছিলেন। তাঁর সেই অবস্থার প্রতিটা মুহূর্ত যেন সততা ও বিনতভাবে আল্লাহর নিকট এই দোয়াই ছিল যেঃ "হে আল্লাহ! তোমার দেয়া রিসালাত পৌঁছে দেয়া, তোমার আদেশ পালন এবং তোমার অধিকার নিয়ে দাঁড়াতে গিয়েই এসব কিছুর মুখোমুখি হয়েছি। হে আল্লাহ! আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছি, এই হল তাদের উত্তর। আমি তাদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর এই হল তাদের বিরোধী প্রচেষ্টা। হে আল্লাহ! তোমার পথে আমি সবকিছুর মোকাবেলা করতে রাজি আছি। হে আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি? হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।"

৯) চরম বেদনাদায়ক হলেও এই ঘটনা নবীজির (সা) জন্য গুরুতর মানসিক বোঝার কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি। তিনি এ ঘটনা রোমন্থন ও স্মৃতিচারণ করে বেড়ান নি বা এ ঘটনাকে ব্যবহার করে তিনি কাউকে কিছু স্মরণ করিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করেন নি। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন নবী (সা) এসব দুরাচারীদের সন্তানদের বরণ করে নেন। ইকরিমা বিন আবু জাহেল, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা বিন খালফ, আবু হুযাইফা বিন উতবা বিন রাবী'আ, খালিদ বিন ওয়ালীদ ও তাঁর ভাই উমারা বিন ওয়ালীদ, উম্মে কুলসুম বিনতে উক্বা বিন আবী মু'ঈত – এদের সবাইকেই নবী (সা) ইসলামে স্বাগত জানান। নবী (সা) এদের কাউকেই বলেননিঃ "তোমার বাবার কীর্তি তো এটা এটা ছিল!" এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। তাঁর চরিত্র ছিল এসবের উর্ধ্বে ও এসবের চেয়ে অনেক সম্মানিত। কিন্তু অবাক হওয়ার ব্যাপার হল, নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের থেকে এমনটা হওয়ার

আশঙ্কা করতেন, তাই তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন এ বলে যে, “তোমরা মৃতদের গালি দিয়ে জীবিতদের কষ্ট দিও না।”[8]

১০) আমরা এ অসাধারণ ঘটনা থেকে অল্প বয়স সত্ত্বেও ফাতিমাতুয যাহরার (আ) মানসিক শক্তির পরিচয় পাই। তিনি অল্পবয়স্ক বালিকা হওয়া সত্ত্বেও ছুটে এলেন এবং তাঁর বাবা রাসূলুল্লাহর (সা) পিঠ থেকে আবর্জনা সরান। এরপর তিনি কুরাইশদের সেসব সরদার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের দিকে এগিয়ে যান এবং চিৎকার করে তাদের অপমান করেন এবং তাদের মধ্যে যে বা যারা এ কাজটি করেছে তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন। আরো অবাক ব্যাপার হল, উত্তেজিত হওয়ার পরও তিনি কাঁদেন নি। বরং তিনি সাহসিকতা, মানসিক শক্তি এবং ধীরস্থিরতার সাথে কুরাইশ সরদারদের মুখোমুখি হন। আল্লাহ ফাতিমাকে (আ) এ সম্মান দান করেন যে, তাঁর পিতার সাথে বাইতুল্লাহতে ঘটে যাওয়া এ বেদনাদায়ক ঘটনার দশ বছর পর তিনি তাঁর পিতাকে প্রায় ১ লক্ষ সঙ্গী নিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখেন। এই দৃশ্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দু চোখে শীতলতা দান করেন। তাঁর পিতা যখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন, সেখানে কোন মূর্তি ছিল না, আর না সেখানে তাওয়াফ করছিল কোন মুশরিক। তাঁর পিতা (সা) যখন সে জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কি তিনি সে বেদনাদায়ক দৃশ্যের কথা স্মরণ করছিলেন, তিনি কি মনে মনে জিজ্ঞাসা করছিলেনঃ “কোথায় সেই সরদাররা ? কোথায় তাদের হাসি, ঠাট্টা ও উপহাস ? তাদের পরিণতিই বা এখন কি ?”

এরপর আল্লাহ ফাতিমাকে (রা) দেয়া সম্মান ও নেয়ামতের পূর্ণতা এভাবে দেন যে, তিনি রফীকে ‘আলার কাছে নিজ পিতার সাথে মিলিত হওয়ার আগেই তাঁর পিতা তাঁকে বলেনঃ “তুমি কি এটা নিয়ে খুশি নও যে, তুমি জান্নাতী রমণীদের সরদারনী হবে।” তাঁর ও তাঁর বাবার ওপর দু জগতেই আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত নাযিল হোক। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রশংসিত ও সম্মানিত।[9]

৫। রাজত্বের মুকুট

সময়টা ছিল রাসূলুল্লাহর (রা) মাদানী জীবনের প্রথম দিকের বছর। তিনি তাঁর আনীত হেদায়েত ও সুন্নত অনুযায়ী তাঁর সাহাবা এবং শাসনাধীনদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি গাধায় চড়ে বনু হারিছের এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন বনু খাযরাজের সরদার সা'দ বিন উবাদার (রা) সাথে তাঁর ঘরে সাক্ষাৎ করার জন্য। বাহনে তাঁর পেছনে ছিলেন উসামা বিন যায়েদ (রা)। পথিমধ্যে তিনি মুসলিম, মুর্তিপূজারী মুশরিক এবং ইহুদীদের একটি মিশ্র জমায়েতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন উবাই তখনো মুসলিম হওয়ার ভান করা শুরু করে নি। নবীজি (সা) তাদের দিকে নিজের যাত্রাপথ পরিবর্তন করলেন। যখন তিনি তাদের নিকটবর্তী হলেন তাঁর গাধার পায়ের আঘাতে ধুলি উড়তে লাগল। এটি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। মদীনা নরম মাটির অঞ্চল হওয়ায় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের পদাঘাতে ধুলা উড়ত। আবদুল্লাহ বিন সালুল তার নাক ঢেকে নবীজিকে (সা) উদ্দেশ্য করে বললঃ "আমাদের ধুলাবালি দিয়ে ঢেকে দেবেন না।" আরো বললঃ "আল্লাহর শপথ! আপনার গাধা যে ধুলা উড়াচ্ছে তা আমার কষ্টের কারণ হচ্ছে।" এটা ছিল তার পক্ষ থেকে খুবই রূঢ় আচরণ। মুসলিম-মুশরিক নির্বিশেষে সকল আরবদের রীতি অনুযায়ী রাসূলের দিকে উঠে তাঁকে স্বাগত ও বরণ করে নেয়ার পরিবর্তে সে বিরাগ ও বিমুখতার সাথে রাসূলের (সা) মোকাবেলা করে। কিন্তু নবী (সা) তাঁর এ আচরণকে পাত্তা না দিয়ে এবং এটাকে তাঁর ফিরে যাওয়ার কারণ না বানিয়ে সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানালেন। এরপর তিনি বাহন থেকে নেমে সেই জমায়েতের সাথে বসলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করলেন ও কোরআন পাঠ করে শোনালেন। আবদুল্লাহ বিন উবাই যখন কোরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াত শুনল, তার পক্ষে এর সুস্পষ্ট সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি করা বা এ নিয়ে তর্ক করা সম্ভব হল না। কিন্তু সে অন্য উপায়ে উপদ্রব সৃষ্টি করল। সে নবীজিকে (সা) উদ্দেশ্য করে বললঃ "হে ব্যক্তি! এটা যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে তা আপনার অন্যান্য কথা থেকে তা উত্তম নয়। আমাদের জমায়েতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না। আপনি বরং আপনার জায়গায় ফিরে যান। আপনার কাছে যারা আসবে, তাদেরকে আপনি এটি শোনান গিয়ে।"

এটা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী নবীজির (সা) কথায় সন্দেহ সৃষ্টি করার একটি নোংরা চক্রান্ত। আর তাই আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্বোধন করে ইবন উবাইয়ের এ রকম অপমানমূলক কথাবার্তায় খেপে গেলেন এবং রাসূলকে (সা) সম্বোধন করে বললেনঃ “আপনি অবশ্যই আমাদের মজলিসে এসে আমাদের হেদায়াত দেবেন। আমরা তা পছন্দ করি।” আরেকজন আনসার ইবনে উবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেনঃ “আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহর (সা) গাধার গন্ধও তোমার থেকে উত্তম।” মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহুদীদের মধ্যে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি চলতে থাকল যা শেষ পর্যন্ত গালিগালাজে গিয়ে ঠেকল। তারা খেজুরের ডালপালা, জুতা ও খালি হাতে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের থামালেন ও শান্ত করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর গাধায় চড়ে সা'দ বিন উবাদার (রা) বাসগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তিনি সা'দের (রা) গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে সব খুলে বললেন। সা'দ (রা) ও আবদুল্লাহ বিন উবাই দুজনই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সরদারদের অন্তর্ভুক্ত। নবীজি (রা) সা'দকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “হে সা'দ, তুমি কি শুনেছ আবু হুবাব (অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন উবাই) কি বলেছে? সে তো এই এই বলল।” সা'দ বললেন, “হে রাসূলুল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা ও উপেক্ষা করুন। সেই সত্ত্বার শপথ, যিনি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। আল্লাহ আপনার ওপর সত্য নাযিল নাযিল করেছেন। এ শহরের লোকেরা তাকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল । এরপর আল্লাহ যখন আপনাকে আমাদের মাঝে নিয়ে এলেন, তখন আমরা তাকে পরানোর জন্য একটি মুকুটের ব্যবস্থাও করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ যে সত্য আপনার ওপর নাযিল করেছেন তা দ্বারা এর অন্যথায় করলেন। ইবনে উবাই তা মুখ বুজে সহ্য করলো। তাই সে এখন তাই করছে যা আপনি দেখেছেন।” রাসূলুল্লাহ (সা) ইবনে উবাইকে মাফ করে দিলেন এবং তার এই অবস্থানকে উপেক্ষা করে গেলেন।

এরপর বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয় দিলেন। মুশরিকদের শীর্ষ সরদাররা যুদ্ধে নিহত হল, আবদুল্লাহ বিন উবাই যাদের দ্বারা প্রভাব বিস্তার এবং যাদের শত্রুতার মাধ্যমে নিজ শক্তি বৃদ্ধির কথা ভাবছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধের পর তার আর কিছুই করার রইল না। সে তার মুশরিক সঙ্গীদের বললঃ “এ ব্যাপারটি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।” এরপর সে ও তার সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ইসলামের ওপর বাই'আত নিল এবং

বাহ্যিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করল, যদিও তাদের অন্তর তখনো ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে পরিপূর্ণ এবং রূহানী রোগে আক্রান্ত।[10]

১) এ ব্যাপারটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় যে, নবী (সা) এমন একটি জমায়েতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে মুসলিম, মুশরিক এবং ইয়াহুদীরা ছিল। কিন্তু তিনি মুশরিক ও ইয়াহুদীদের সাথে বসা ও মেলামেশা করার জন্য মুসলিমদের নিন্দা করেন নি। বরঞ্চ জমায়েতে যা হওয়ার তা হওয়ার পর তিনি জমায়েত ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু মুসলিমদের জমায়েত ছেড়ে যেতে বলেন নি। বরঞ্চ তাদের তিনি সেই অবস্থাতেই রেখে গেলেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেলামেশা ও সহাবস্থানই মূলনীতি। একজন মুসলিম তার দ্বীনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ও তার বিশ্বাসে দৃঢ়। অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদের সাথে একসাথে বসা অথবা মেলামেশা করা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না, কেননা একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার চাইতে তাদের প্রভাবিত করতে বেশি সক্ষম।

বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য ছিল, কেননা তাদের নিজেদের বিশ্বাসে আত্মবিশ্বাস কম ছিল। এছাড়াও যখন তারা তর্কবিতর্ক ও যুক্তিপেশের সময় তাদের পেশকৃত যুক্তিও দুর্বল হত। তাদের চিহ্নই ছিল বিচ্ছিন্নতা যেমন কিনা কোরআনে তাদের কথা উঠে এসেছেঃ “আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হঞ্জগোল সৃষ্টি কর” [ফুসসিলাতঃ ২৬]। আর আবদুল্লাহ বিন উবাই এর চিহ্নও তার রাসূলকে (সা) উদ্দেশ্য করে এই কথার মধ্যে ফুটে ওঠেঃ “আপনি আপনার যাত্রাপথে ফিরে যান। যে আপনার কাছে আসবে তাকে এটি (কোরআন) শোনান।”

কাফেররা যখন কোরআন শুনতো অথবা মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করত, তখন নিজেদের ওপর এসবের প্রভাব পড়ার ভয় করত। সেজন্য তারা মুসলিমদের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব বজায় রাখার নীতি অবলম্বন করত, অন্যদিকে সাহাবাগণ ছিলেন তাঁদের ইসলামের কারণে যুগ অনুযায়ী আধুনিক। তাঁরা ছিলেন অধিকতর খোলামন বিশিষ্ট এবং মেলামেশা ও সহাবস্থানে অধিকতর সক্ষম, যেন তাদের এই মেলামেশার ফলে তাদের দ্বীন ছড়িয়ে পড়ে, তাদের দাওয়াতের পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং মুশরিকদের অনুসৃত বিচ্ছিন্নতার নীতি মুখ থুবড়ে পড়ে।

এরপর সময়ের পালাক্রমে আমাদের ওপর এমন জামানা এসে উপস্থিত হল যখন আমাদের কেউ কেউ বিশ্বের খোলামনস্কতাকে আরো বেশি বেশি বদ্ধমনস্কতা দিয়ে মোকাবেলা করছে এবং তাদের দ্বীন ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এমন আচরণ করছে যেন তা কাচের ফলক যা যেকোন সন্দেহের মুখোমুখি হলে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

২) ইবন উবাইয়ের প্রতি আল্লাহর রাসূলের (সা) আচরণেও আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। ইবনে উবাই নবীজিকে (সা) সম্বোধন করে বললঃ "হে ব্যক্তি!" অথচ নবী (সা) যখন ইবনে উবাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে তার লকব ধরে সম্বোধন করেনঃ "তুমি কি শোননি, আবু হুবাব কি বলেছে?" এরপর যখন মুসলিম ও মুশরিকরা নবীজিকে (সা) নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হল, তখন নবী (সা) বিবাদে কোন পক্ষ নেন নি। বরং এর ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে শান্ত করা শুরু করলেন। ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীরা যে উত্তেজনা উস্কে দিতে চেয়েছিল নবী (সা) এই চারিত্রিক মহত্ব দ্বারা সেটা নিয়ন্ত্রণে আনলেন। বরঞ্চ অন্যদের সাথে তাঁর মহৎ আচার আচরণের ফলে ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হতে লাগল এবং তারা যে বিধ্বংসী ফলাফল আশা করেছিল সেটাও বাস্তবায়িত হয় নি।

৩) সা'দ বিন উবাদা (রা) যেভাবে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করেছেন, সেটা ছিল চূড়ান্ত সূক্ষ্মতা ও সচেতনতার ফল। তাঁর কাছে ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারটি মতভিন্নতা কিংবা ইসলামের প্রামাণ্যতার অনুপস্থিতির ফল ছিল না। বরং এটা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তার হিংসা, যার কারণ ছিল ইবনে উবাই যে নেতৃত্বের আশা করছিল রাসূলুল্লাহর (সা) সত্য সহকারে আগমনের ফলে তার সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা) প্রভাব বিস্তার করেন অর্থাৎ গোত্রীয় নেতৃত্বের ওপর নবুওয়াত ও ওহীর সত্য বিজয়ী হয়। এই গোত্রীয় নেতৃত্বেরই আকাঙ্খী ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে রাসূল (সা) ও তাঁর রিসালাতকে দাঁতে দাঁত চেপে মেনে নেয় এবং তাদের প্রতিরোধ করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়। যখন সে দেখল, রাসূলের (সা) নেতৃত্বের ব্যাপারটি মীমাংসিত হয়ে গিয়েছে তখন সে কৌশল পরিবর্তন করে ভেতর থেকে চক্রান্তের রাস্তা বেছে নেয়। ফলে মুসলিমদের এক নতুন ধরনের শত্রুতার মোকাবেলা করতে হয় নিফাক ও মুনাফিকদের পক্ষ হতে।

নবীজিকে (সা) সবচেয়ে কঠিন যে শত্রুতার মোকাবেলা করতে হয়েছিল সেটার জীবাণু ও চালকশক্তি ছিল হিংসা। আবু জাহেল ও হুয়াই বিন আখতাবের শত্রুতা বিশ্লেষণ করলেই তা পরিষ্কার হয়। তাদের শিক্ষক

ইবলিসের হিংসাও অনুরূপ ছিল যখন সে আদমের (আ) দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলঃ “আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।”

এ ধরনের শত্রুরা মারা গেলেও তাদের বিদ্বেষকে কবরে নিয়ে যায়।

৪) এ জন্যই ইসলামের বিরুদ্ধে একের পর এক চক্রান্ত ও অপকৌশল চলতে থাকে। দ্বিতীয় হিজরী বছরেই ইসলাম সেখানে সুস্পষ্ট আধিপত্য লাভ করে। তৃতীয় বছরে ইবনে উবাই ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের আন্দোলন শুরু করে। উহুদ যুদ্ধের কঠিন সময়ে মুসলিমদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা সৃষ্টি করার জন্য যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ইবনে উবাই এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনেই ময়দান থেকে পিছু হটে। এছাড়াও উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিমদের শত্রুরা যাতে যুদ্ধের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারে। চতুর্থ বছরে ইবনে উবাই যা বলছে তা কোরআনে উঠে এসেছেঃ “আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে” [সূরা মুনাফিকুনঃ ৭] এবং “আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কৃত করবে” [সূরা মুনাফিকুনঃ ৮]। এরপর সে উম্মুল মু’মিনীন আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানোতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। পঞ্চম হিজরীতে সালে ইবনে উবাই ও তাঁর সাথের মুনাফিকরা আহযাব যুদ্ধের কঠিন লড়াইয়ে মুসলমানদের ভেতরে থেকে তাদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করে। তারা বলেঃ “আমাদেরকে দেয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ আর কিছু নয়” [সূরা আহযাবঃ ১২]।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উদারতা ও ক্ষমা দিয়ে এসব চক্রান্ত ও নাশকতাকে রুখে দেন। সব ফাসাদকে প্রতিহত করেন। তাঁর সাহাবীদের অন্তরকে একতাবদ্ধ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ইবনে উবাইয়ের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা আরো বৃদ্ধি পায় এবং দুনিয়াতেই সে তার শাস্তির কিছু অংশ পেয়ে যায়। আল্লাহ তাকে লম্বা বয়স দেন যাতে সে আল্লাহর সাহায্য ও মুসলিমদের বিজয় দেখতে পায়; মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখতে পায়; সে প্রত্যক্ষ করে কিভাবে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তাঁর আনীত দ্বীন অনুসরণের বাইয়াত দিতে ছুটে আসছিল। যে রাসূলুল্লাহকে (সা) সে হিংসা করত সেই তাঁকে মদীনার পর পুরো আরবের কর্তৃত্ব হাতে নিতে দেখেছে, দেখেছে কিভাবে রোমের রাজাও রাসূলকে (সা) ভয় পেত। এসব দেখার পরই ইবনে উবাই প্রচন্ড দুঃখ ও কষ্টের বোঝা নিয়ে মারা যায়।

৫) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পরও রাসূলুল্লাহ তার প্রতি সদয় আচরণ করেন। যখন ইবনে উবাই মৃত্যুবরণ করে, তখন নবীজির (সা) কাছে তার ছেলে আবদুল্লাহ (রা) এসে বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে আপনার একটি জামা দিন। আমি এটিকে তার কাফন হিসেবে ব্যবহার করব।" নবীজি (সা) তাঁকে তাঁর একটি জামা দিলেন। এরপর আবদুল্লাহ বললেনঃ "আমাকে তার জন্য জানাযা পড়ার অনুমতি দিন।" এরপর ইবনে উবাইকে নবীজির (সা) জামা দ্বারা কাফন পড়ানো হল। এরপর তার দাফনের আগে নবীজি উপস্থিত হলেন। এরপর যখন নবী (সা) তার জানাযা পড়ানোর জন্য দাঁড়ালেন, তখন উমার (রা) লাফিয়ে তাঁর জামা ধরে বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কি ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়াবেন অথচ আপনার ব্যাপারে একেকদিন এই এই কথা বলেছেন ?" এরপর তিনি ইবনে উবাই কি কি বলেছে তা নবীজির (সা) সামনে তুলে ধরলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মুচকি হেসে তাঁর দিকে ঘুরলেন এবং বললেনঃ "আমার থেকে ক্ষান্ত হও, ওমর।" কিন্তু উমার (রা) বারবার তাঁকে জানাযা না পড়ার অনুরোধ করতে থাকলেন। উমার বললেনঃ "আপনি তার জানাযা পড়াতে চান অথচ আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করে বলেনঃ "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না" [সূরা তাওবাঃ ৮০]।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।" আমি তার জন্য সত্তরেরো অধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা করব।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তার জন্য অনেক লম্বা সময় ধরে জানাযা পড়ালেন। মুজাম্মা' বিন জারিয়া (রা) বললেনঃ "আমি আবদুল্লাহ বিন উবাই এর জন্য রাসূলুল্লাহকে যত লম্বা জানাযা পড়াতে দেখেছি আর কারো জন্য এত লম্বা সময় ধরে তাঁকে জানাযা পড়াতে দেখিনি।" এরপর তিনি জানাযা শেষ করলেন এবং ইবনে উবাইয়ের মৃতদেহকে যখন কবরে নামানোর জন্য নিচে নামানো হল, রাসূলুল্লাহ (সা) তার মৃতদেহকে তুলতে বললেন এবং তাকে নিজ হাটুর ওপর রাখলেন। এরপর তিনি তাঁর পবিত্র লালার কিছু অংশ তার মুখে রাখেন, যাতে দুনিয়াতে ইবনে উবাইয়ের নেয়া শেষ জিনিস রাসূলুল্লাহর (সা) লালা হয়।

৬) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অনেক কথাই তার হত্যার জন্য যথেষ্ট ছিল। যদি এমন কথা তার নাও থাকত, কেবল বনু নাযীরের ইয়াহুদীদের মত রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যুদ্ধরত শত্রুদের সাথে যোগসাজশ থাকাটাই তার হত্যার জন্য যথেষ্ট হত। বনু নাযীর রাসূলের (সা) সাথে যুদ্ধরত ছিল এবং তিনি তাদের দুর্গ অবরোধ করে

রেখেছিলেন। এসময় ইবনে উবাই তাদের কাছে সংবাদ পাঠায়, যা কোরআনে উঠে এসেছেঃ “যদি তোমাদের বের করে দেয়া হয়, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে পড়ব। তোমাদের ব্যাপারে আমরা কারো কথা মানব না। আর যদি তোমাদের সাথে লড়াই করা হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব” [সূরা হাশরঃ ১১]।

পৃথিবীর প্রতিটি রীতিতে এটি বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে বিবেচিত। তার ওপর যদি এ দুটো কথাও যোগ করা হয়ঃ “আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে” [সূরা মুনাফিকুনঃ ৭] এবং “আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কৃত করবে” [সূরা মুনাফিকুনঃ ৮] – তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে। শেষোক্ত কথাটিতে দুর্বল বলতে সে রাসূলুল্লাহকে (সা) ইঙ্গিত করেছে। এরপরও রাসূলুল্লাহ (সা) তার ব্যাপারে সংযম প্রদর্শন করেন, এমনকি উমার বিন খাত্তাবের (রা) মত যারা তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ইবনে উবাইকে হত্যা করতে চেয়েছিল তাদেরও নিবৃত্ত করেন। উমার (রা) তো বলেই বসেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন। আমি মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।” নবী (সা) বলেনঃ “থাক! তাকে ছেড়ে দাও।” রাসূলের এ ব্যাপারটি ছিল কিছু বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে। এগুলো হচ্ছেঃ

ক) ইবনে উবাইকে হত্যা করলে তার হত্যার সংবাদ তো ছড়াত, কিন্তু তার হত্যার আসল কারণ ছড়াত না। এ ঘটনার এমন ভুলভাল ব্যাখ্যা করা হত, যার ফলে মানুষের রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হত। রাসূলুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যার প্রসঙ্গ আসলে বলেনঃ “মানুষ যেন এমনটা না বলে যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করে”, “মানুষ যেন এমন না বলে যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধ করে, এরপর তাদের হত্যা করে” এবং “আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে এসে থিতু হয়েছি, এরপর তাদের বেঁধে হত্যা করেছি।”

খ) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হেতু ছিল সেসব আনসারদের অনুভূতি, ইবনে উবাই যাদের গোত্রের দায়িত্বশীল ছিল। ইবনে উবাইয়ের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তাদের একটি অংশ ক্রোধান্বিত হত, অন্যরা অসন্তুষ্ট হত, যার ফলে ফিতনা সৃষ্টি হত। নবীজি (সা) তাকে মাফ করে দেয়ার ফল হল এই যে, তার গোত্রের লোকেরাই তার সমালোচনা করতে লাগল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) উমারকে (রা) বললেনঃ “যেদিন তুমি তাকে হত্যা করতে

বলেছিলে, আমি যদি সেদিনই তাকে হত্যা করতাম তাহলে আমি তাদের মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উস্কে দিতাম। কিন্তু আজ যদি আমি তাদেরকে তাকে হত্যা করতে আদেশ দেই, তাহলে তারা তাকে নিজ থেকেই হত্যা করবে।" অর্থাৎ যারা একসময় তার পক্ষ নিয়ে ক্রোধান্বিত হত, তারাই আজ তার ওপর ক্ষিপ্ত এবং তাকে নিন্দা করছে।

এর পিছে রয়েছে স্বার্থ রক্ষা ও অনিষ্ট প্রতিরোধ এবং সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টি এবং ফিতনা ও মতভিন্নতা রোধের মূলনীতি।

৬। উপত্যকার সরদার

সা'দ বিন মু'আয ছিলেন মদীনার আওস গোত্রের আবদুল আশহাল উপগোত্রের সরদার। উমাইয়্যা বিন খালফ ছিল মক্কার কুরাইশ উপগোত্র বনু জুমাহর সরদার। এ দুজন ছিল বন্ধু, যারা পরস্পর দেখাসাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন করতেন। উমাইয়্যা যখন মদীনা হয়ে শামে যেত, তখন সে সা'দের বাড়িতে যেত। অন্যদিকে সা'দও মক্কায় আসলে উমাইয়্যার বাড়িতে যেত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করার পর, সা'দ বিন মু'আয (রা) একবার উমরার জন্য রওনা দিলেন। সা'দ রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর ঈমান আনেন, তাঁর অনুসরণ করেন, তাঁকে আশ্রয় ও সাহায্য প্রদান করেন।

সা'দ যখন মক্কায় পৌঁছেন, তিনি তাঁর বন্ধু উমাইয়া বিন খালফের বাড়িতে গেলেন, এরপর তাকে বললেন, "হে আবু সাফওয়ান! এমন একটা সময়ের কথা ভাবো যখন লোকজন থাকবে না, আমি তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করব।" উমাইয়্যা বললঃ "তাহলে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তখন মানুষও কমে যায়।" মধ্যাহ্ন নিকটবর্তী হলে, সা'দের সাথে উমাইয়্যাও বের হল। মক্কায় প্রচন্ড গরম পড়ার কারণে দিনের এ সময়টা মানুষ ঘরেই থাকে। উমাইয়্যা ভাবেনি, এসময়টাতে তারা দুজন কারো মুখোমুখি হবে।

যখন সা'দ তাওয়াফ করছিলেন, তখন আবু জাহেল তাঁর কাছে এসে বললঃ "কে এই ব্যক্তি যে নিরাপদে কাবা তাওয়াফ করছে?" সা'দ ছিলেন একজন সম্মানিত যুবক। যখন তাঁকে সম্বোধন করা হল তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইলেন না। তিনি আবু জাহেলের জবাবে বললেনঃ "আমি সা'দ বিন মু'আয।" আবু জাহেল বললঃ "আমি তোমাকে মক্কায় নিরাপদে তাওয়াফ করতে দেখছি। অথচ তোমরা মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আশ্রয় দিয়েছ এবং তাঁকে সাহায্য করার ঘোষণা দিয়েছ।" সা'দ বললেনঃ "হ্যা।" আবু জাহেল বললঃ "আল্লাহর শপথ! তুমি যদি আবু সাফওয়ানের সাথে না থাকতে তাহলে তোমার পরিবারের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না।" সা'দ আবু জাহেলের চেয়েও উঁচু গলায় জবাব দিলেনঃ "আল্লাহর শপথ! যদি তুমি আমাকে যেতে বাধা দিতে তাহলে আমিও তোমাকে বাধা দিতাম যা তোমার জন্য অধিকতর খারাপ হত। তোমাদেরকে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে মদীনার ভেতর দিয়ে যেতে বাধা দিতাম।" উমাইয়্যা সা'দকে উদ্দেশ্য করে বললঃ "আবু জাহেলের

ওপর তোমার কণ্ঠ চড়াও করো না। সে এই উপত্যকাবাসীদের সরদার।” সা’দ ও আবু জাহেল পরস্পর গালাগালি ও কথা কাটাকাটি করতে লাগল। উমাইয়্যা সা’দকে ধরে বলতে লাগলঃ “আবু জাহেলের ওপর তোমার কণ্ঠ চড়াও করো না। সে এই উপত্যকাবাসীদের সরদার।” সা’দ এটা শুনে উমাইয়্যার ওপর রাগান্বিত হলেন। উমাইয়্যার তো উচিত ছিল তার অতিথি ও বন্ধুকে সমর্থন দেয়া এবং আবু জাহেলকে এ ধরনের কথা বলতে না দেয়া। সেজন্য সে উমাইয়্যার বুকে ঠেলা দিয়ে বললেনঃ “আমার থেকে ক্ষান্ত হও, হে উমাইয়্যা। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ “তারা তাকে (উমাইয়্যা) হত্যা করবে।”” উমাইয়্যা বললঃ “আমাকে হত্যা করবে?” সা’দ বললেনঃ “হ্যা।” উমাইয়্যা জিজ্ঞাসা করলঃ “মক্কায়?” সা’দ বললেনঃ “সেটা জানি না।” উমাইয়্যা এটা শুনে প্রচন্ড ভয় পেল এবং বললঃ “আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ কখনো মিথ্যা বলে না।” এরপর উমাইয়্যা যখন তার পরিবারের কাছে ফিরে গেল সে তার স্ত্রীকে বললঃ “হে উম্মে সাফওয়ান! তুমি কি দেখনি আমার ইয়াছরিবের ভাই (সা’দ) আমাকে কি বলেছে?” তার স্ত্রী বললঃ “কি বলেছে?” উমাইয়্যা বললঃ “সা’দ দাবী করেছে, মুহাম্মাদ নাকি তাদের বলেছেঃ “তারা আমাকে হত্যা করবে।”” তার স্ত্রী বললঃ “তোমাএ মক্কায় হত্যা করবে?” উমাইয়্যা বললঃ “তা জানি না।” তার স্ত্রী বললঃ “মুহাম্মাদ আমাদের ছাড়বে না। আল্লাহর শপথ সে কখনো মিথ্যা বলে না।” উমাইয়্যা বললঃ “আল্লাহর শপথ! আমি মক্কা ছেড়ে বের হব না।”

বদরের দিন আবু জাহেল মানুষকে এ বলে যুদ্ধের জন্য জড়ো করলঃ “তারা তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা ধরে ফেলেছে।” আবু জাহেল এটাকে রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাঁকে ও তাঁর রিসালাতকে উপড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে কুরাইশদের একত্রিত করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখছিল। উমাইয়্যার তখন সা’দ বিন মু’আযের বলা কথা মনে পড়ে গেল। সে কুরাইশদের সাথে বের না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করে ফেলল। এটা জানতে পেরে আবু জাহেল তার কাছে এসে বললঃ “হে আবু সাফওয়ান! আপনি এই উপত্যকাবাসীদের সরদার। মানুষ যখন দেখবে, আপনি পিছে পড়ে আছেন, তখন তারাও আপনার সাথে পিছে পড়ে থাকবে। আপনি আমাদের সাথে এক বা দুদিন চলুন।” আবু জাহেল উমাইয়্যাকে তাড়না দিতেই থাকল। একসময় উমাইয়্যা বললঃ “যেহেতু আপনি আমার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছেন, তাহলে আমি মক্কায় সবচেয়ে ভালো উট কিনবো।” যাতে যুদ্ধে পরাজয় ঘটলে সে সবার আগে পালাতে পারে এবং এক্ষেত্রে তাকে কেউ টপকে না যেতে পারে। এরপর সে তার স্ত্রীকে গিয়ে বললঃ “হে উম্মে সাফওয়ান! আমাকে প্রস্তুত করো।” তার স্ত্রী তাকে বললঃ “হে আবু সাফওয়ান! আপনি কি ভুলে গিয়েছেন আপনার ইয়াছরিবী ভাই আপনাকে কি

বলেছিল?” উমাইয়্যা বললঃ “না, আমি ভুলিনি। আমি তাদের সাথে অল্প কিছুদূর যেতে চাই।” উমাইয়্যা উট কিনল এবং কুরাইশ বাহিনীর সাথে বের হল। সে যখনই তার উট থেকে নামত, তার উটের লাগাম তার হাতেই থাকত। বদর পর্যন্ত এভাবেই চলছিল। এরপর যুদ্ধ শুরু হল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুমিনদের ওপর আল্লাহর সাহায্য নাযিল হল। মুশরিকরা পরাজিত হল; তাদের বড় বড় সরদাররা নিহত হল। সবচেয়ে প্রথম আঘাত আসে আবু জাহেলের ওপর, যে উমাইয়্যাকে উস্কানি দিয়ে ও বিপথে পরিচালিত করে যুদ্ধে এনেছিল। উমাইয়্যা নিজ চোখে কুরাইশদের পরাজয় প্রত্যক্ষ করেছিল এবং কিভাবে তার আশেপাশের কুরাইশীদের ঘিরে ধরেছে। সে মুশরিক নেতৃস্থানীয়দের যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়ে পড়ে থাকতে দেখল, যেন যুদ্ধ তার ভারসমূহকে বের করে রাখছিল। এমন সময় বিলাল বিন রাবাহ (রা) উমাইয়্যাকে দেখতে পেল। বিলাল ছিল মক্কায় উমাইয়্যার দাস। বিলাল (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন উমাইয়্যা তাঁকে দ্বীনের ব্যাপারে ফেতনায় ফেলার জন্য তাঁর ওপর চরম নির্যাতন চালায়। উমাইয়্যাকে দেখার পর বিলাল আনসারদের মধ্য থেকে চিৎকার করে উঠলেনঃ “ঐ যে উমাইয়্যা বিন খালাফ। যদি সে বেঁচে চায় তো আমি বাঁচব না।” আনসাররা উমাইয়্যা বিন খালফকে চিনে ফেললো এবং হত্যা করল। বিলালও উমাইয়্যার হত্যায় শরীক ছিল।

আর এভাবেই রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উমাইয়্যার জীবনের ইতি ঘটে। আনসাররাই তাকে হত্যা করে, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) তার হত্যাকারী হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এটা ছিল তার জন্য এক তিক্তকর মৃত্যু। সে তার চারপাশের সহচরদের ওপর পরাজয় নেমে আসতে দেখার পর নিহত হয়েছে। নিহত হওয়ার আগে সে বিলালের চেহারা দেখেছে, যাঁকে সে নিজ হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছে।

যেন সা’দ বিন মু’আয এ দৃশ্য দেখে বলছিলেনঃ “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তো আমাদের সাথে এটার ওয়াদাই করেছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল” [সূরা আহযাবঃ ২২][11]

১) উমাইয়্যার নিহত হওয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী থেকে একটা বিষয় খেয়াল করার মত। মুশরিকদের মন নবীজির (সা) সত্যবাদীতার বিষয়ে কতটা আশ্বস্ত ছিল! তারা জানতো, নবী (সা) কখনো মিথ্যা বলেন না। উমাইয়্যা নিজেই তা ঘোষণা করেছিল যখন সে প্রথমবার যখন সা’দ বিন মু’আযের নিকট

থেকে ভবিষ্যদ্বাণীটি শুনল। উমাইয়্যার স্ত্রীও উমাইয়্যার মত একই কথাই বলেছিল। এরপর উমাইয়্যার সতর্ক হওয়া এবং উমাইয়্যার স্ত্রী কর্তৃক তাকে সতর্কীকরণের ঘটনা ঘটে।

নবীজির (সা) সত্য কথা বলার বিষয়টি মুশরিকদের অন্তরে একেবারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। আর এটাই প্রমাণ করে, মক্কার মুশরিকদের অবিশ্বাস ছিল অবহেলা ও একগুঁয়েমিবশত। তাদের অবস্থা কোরআনে এভাবে উঠে এসেছেঃ "অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে" [সূরা আন'আমঃ ৩৩]। কি অদ্ভূত ব্যাপার যে, উমাইয়্যা যখন শুনলো, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুসলিমরা তাকে হত্যা করবে – সে তা বিশ্বাস করে ফেলল; কিন্তু যখন তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সবার প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল" – তখন উমাইয়্যা তা বিশ্বাস করে নি। সে কিভাবে নবীজির (সা) কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করত, তাহলে তো সে তো তার ব্যাপারে আল্লাহর কথাকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করত। এটা তাদের মধ্যকার বৈপরীত্য যা সুস্পষ্ট করে দেয় যে, "তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল" [সূরা নামলঃ ১৪]।

২) আমরা এ ঘটনা থেকে দেখতে পাই যে, মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে মানবীয় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মুসলিমরা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব, একে অপরের কাছে যাতায়াত এবং আতিথেয়তার মত মানবিক সম্পর্ক ছিন্ন করাকে নিজেদের ইসলাম, ঈমান ও শিরকের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদের দাবী মনে করত না। সেজন্যই নবীজির (সা) হিজরত, তাঁকে সাহায্য-সমর্থন দেয়ার পরও সা'দ ও উমাইয়্যার পারস্পরিক যাতায়াত বন্ধ হয় নি। একইভাবে একইভাবে উমাইয়্যা এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফের মধ্যেও পারস্পরিক পরিবার ও সম্পদের দেখাশোনা ও প্রতিনিধিত্ব করার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মক্কায় আবদুর রহমান বিন আওফের বিষয়াদি উমাইয়্যা দেখাশোনা করত আর মদীনায় উমাইয়্যার বিষয়াদি আবদুর রহমান দেখাশোনা করতেন।

মুসলিমরা তো মানব সমাজেরই একটি অংশ। তারা নিজেদের মধ্যে এবং অন্য সম্প্রদায়ের সাথে উঁচু মাপের চারিত্রিক মানদন্ড এবং মহৎ মানবীয় মনোভাব বজায় রেখেই লেনদেন করে। তারা নিজেদের ইসলামের কারণে অন্যদের থেকে মানসিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা জরুরী মনে করে না।

৩) এ ঘটনায় নববী মোজেযা ফুটে উঠেছে। নবী (সা) আনসারদের উদ্দেশ্য করে প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, তারা উমাইয়্যা বিন খালফকে হত্যা করবে। তারা ছিল মদীনায় আর উমাইয়্যা ছিল মক্কায়। এমনটা যে ঘটবে

এটা কার চিন্তায় এসেছিল! উমাইয়্যা যদি নিজ বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করত, তাহলে এমনটা লেখা হয়ে থাকত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন যা বাস্তবায়িত হয় নি।

কিন্তু নবীজি (সা), যিনি কখনো সত্য ছাড়া কিছু বলতেন না, পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে নিজ রবের পক্ষ থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন। আর তাঁর সাহাবীরাও তাঁর সত্যবাদিতার ওপর পূর্ণ ঈমান রেখেই এই ভবিষ্যদ্বাণী গ্রহণ করেছিলেন। এরপর এক বছরও যায় নি, উমাইয়্যা মুশরিক বাহিনীতে শামিল হয়ে বদরে এসে উপস্থিত হল, যারা ঔদ্ধত্য ও জাঁকজমকের সাথে মক্কা থেকে বেরিয়েছিল। উমাইয়্যা যুদ্ধে আনসারদের তলোয়ার দ্বারা নিহত হয়। উমাইয়্যার সাবধানতা এবং তার ক্রয়কৃত মক্কার শ্রেষ্ঠ উট কোন কাজে আসে নি। রাসূলুল্লাহর (সা) ওয়াদা সত্য প্রমাণিত হয় এবং তা মুশরিকদের তাদের অবস্থায় ঘিরে ধরে।

৪) আমরা এখানে উমাইয়্যার প্রচন্ড সাবধানতা সত্ত্বেও তাকে বিভ্রান্ত ও প্রলুব্ধ করার ক্ষেত্রে আবু জাহেলের দক্ষতা দেখতে পাই। সে উমাইয়্যাকে উস্কানী দেয়ার জন্য এবং তার বড়ত্ব ও অহংকারকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে বলেঃ "হে আবু সাফওয়ান! আপনি এই উপত্যকাবাসীর একজন সরদার। আপনি যদি পিছিয়ে থাকেন তাহলে আপনার দেখাদেখি অন্যরাও আপনার সাথে পিছিয়ে থাকবে।" আবু জাহেল উমাইয়্যার মনে তার মর্যাদা ও দায়িত্ব এবং মানুষ যে তার অনুসরণকারী সে অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

এরপর সে তাকে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত করার জন্য বলেঃ "সৈন্যবাহিনীর সাথে অন্তত এক বা দুইদিন চলুন।" আবু জাহেল জানত যে, উমাইয়্যা যদি এক বা দুইদিন সৈন্যবাহিনীর সাথে চলে, তবে তার পক্ষে আর তার উটে চড়ে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলা সম্ভব না যেঃ "আমি এখন মক্কায় ফিরে যাচ্ছি। তোমরা যুদ্ধের ময়দানের দিকে তোমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখো।" তলোয়ারবিদ্ধ হয়ে মরাও এর চেয়ে সহজ। আর এজন্যই এক বা দুইদিন চলার পর তার পক্ষে আর ফিরে যাওয়া এবং নিজ মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হয় নি, যে ব্যাপারে সে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করেছিল। কিন্তু উমাইয়্যাকে ধোঁকার মাধ্যমে এ পথে নিয়ে আসে আবু জাহেল তার অসাধারণ দক্ষতা ও সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করে।

এখানে যে বিষয়টি লক্ষ্য করার মত তা হচ্ছে, পথভ্রষ্টতায় যারা নেতৃত্ব দেয় তাদের সূক্ষ্মবুদ্ধির অভাব হয় না। বরং তাদের থাকে সহজাত ও উচ্চতর দক্ষতা এবং যোগাযোগ ও প্রভাব বিস্তারে অসাধারণ ক্ষমতা। কিন্তু তাদের এতসব দক্ষতা ও গুণ ফেতনা ও অন্যদের পথভ্রষ্ট করতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সময় আসলে তাদের ও

তাদের কর্তৃত্ব অনুসারীদের ঠিকই জঘন্য আযাব ঘিরে ধরে। এরা তখন নিজেদের অনুসারীদের কোন উপকারে আসে না কারণ এরাও তাদের সাথে আযাব ভোগে শরীক থাকে।

৫) এখানে সা'দ (রা) প্রজ্ঞা ও সাহসের সমন্বয় কিভাবে করেছিলেন তা লক্ষ্য করার মত। তিনিই প্রথম দিনের এমন এক সময়ের কথা জানতে চাইলেন যখন মানুষজন থাকে না। তার পক্ষে কুরাইশদের মোকাবেলা করার সক্ষমতা ছিল না আর তিনি সংঘাতে যেতে ইচ্ছুকও ছিলেন না। কুরাইশরা যে চাপা উত্তেজনার মধ্যে বসবাস করছিল সে পরিবেশে জন্য এটা ছিল সা'দ যথার্থ পলিসি।

কিন্তু তিনি যখন আবু জাহেলের ডাক শুনতে পেলেন, তিনি নিজের পরিচয় লুকাননি, আর না নিজের বক্তব্য প্রদানে দুর্বল হয়ে পড়েন। বরং তিনি চূড়ান্ত সম্মান, সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে আবু জাহেলের কথার জবাব দিয়েছেন। তিনি রাজনীতিতে ছিলেন যেমন প্রজ্ঞাবান, তেমনি প্রতিপক্ষের মোকাবেলাতেও ছিলেন সাহসী। তিনি প্রত্যেক পক্ষের সাথে সে পক্ষের উপযুক্ত আচার আচরণ দেখান। প্রতিটি অবস্থার জন্য তিনি মানানসই নীতি অনুসরণ করেন।

৬) আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, নবীজি (সা) মাত্র তিন বছর আগে ইসলাম গ্রহণকারী একজন ত্রিশ বছরের যুবককে মদীনা থেকে মক্কায় সফর করার অনুমতি দিয়েছেন। এটা ছিল সেই মক্কা যা ছিল মূর্তি ও পৌত্তলিকতার ঘাঁটি এবং যেখানকার মানুষের রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ছিল চরম শত্রুতা। মক্কায় যাওয়ার কারণে সা'দ পৌত্তলিকতা দ্বারা প্রভাবিত ও ফেতনায় আপতিত হবে এ আশঙ্কা নবীজি (সা) করেন নি। আর সা'দও নিজ দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে অস্থিরতা নিয়ে মক্কায় সফর করেন নি।

এরপর সেখানে গিয়ে তিনি যে নীতি অনুসরণ করেন তা যদি রাসূলুল্লাহ (সা) দেখতে পেতেন, তাহলে সা'দের সাহসিকতা, শক্তি, দৃঢ়তা এবং যথার্থতা দেখে তাঁর চক্ষু শীতল হত।

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাহাবাদের অন্তর যে শক্তিশালী মানসিক ও বিশ্বাসগত শক্তি দ্বারা গড়ে উঠেছিল তা তাদের আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও পরিতৃপ্তিতে ফুটে উঠত। তবে তাঁদের ওপর রাসূলের (সা) অভিভাবকত্ব এবং তাঁদের মধ্যকার সংহতির মানে কখনো অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নতা ও নিরন্তর প্রতিপালনের মধ্যে থাকা বুঝাত না।

৭। ধীরে!

ইয়াহুদীদের এই দলটি ইয়াছরিবকে নিজেদের বাসভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিল। তারা ইয়াছরিবের পথে আসতে কুরা উপত্যকার মত সবচেয়ে উর্বর, সুন্দর ও প্রাচুর্যে ভরা স্থানসমূহ বেছে নিয়েছিল। তারা মূলত সেই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভূমি খুঁজছিল যে ভূমিতে সেই নবী হিজরত করবেন, যাঁকে তারা অনুসরণ করবে। তারা এমন এক নবীর কথা বলত, যিনি পাথুরে ও খেজুরগাছ সমৃদ্ধ এলাকায় প্রেরিত হবেন। এজন্যই তারা এই নবী ও তাঁর হিজরতের অপেক্ষায় থাকতে এই ভূমিকে বেছে নিল ও এখানে বসতি স্থাপন করল। "ইতিপূর্বে তারা প্রার্থনা করতো যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের উপরে বিজয়ী হবার জন্যে" [সূরা বাক্বারাঃ ৮৯]। তারা সেই নবীর সাহায্য কামনা করত এবং আরব মুশরিকদের সেই নবীর প্রেরিত হওয়ার হুমকি প্রদান করত।

অবশেষে সেই পূর্বাভাসকৃত নবীর উত্থান হল যাঁর অপেক্ষায় তারা ছিল এবং তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদের অঞ্চলে হিজরত করলেন। কিন্তু সেই নবী তাদের মধ্যে থেকে উত্থিত হয় নি, হয়েছিল আরবদের মধ্য থেকে। "কিন্তু যখন তাদের কাছে এলেন যাঁকে তারা চিনতে পারল তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে বসলো।" এ অবিশ্বাস ছিল হিংসা উদ্ভূত এবং কেন তিনি তাদের মধ্য থেকে আসেন নি সেইটা মানতে না পারার কারণে। "অতএব অবিশ্বাসীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত" [সূরা বাক্বারাঃ ৮৯]।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় এলেন, তিনি ইয়াহুদীদের সাথে চারিত্রিক মহত্বের সাথে আচার-আচরণ করলেন, যেমনটা কিনা তাঁর প্রতিপালক তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেনঃ "নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" [সূরা ক্বালামঃ ৪]।

কিন্তু ইয়াহুদীদের অন্তর বিদ্বেষ ও হিংসার অন্ধকারে আবদ্ধ থেকে যায়। আর সেজন্যই তাদের আচরণ ও কথাবার্তা থেকে তাদের অন্তরের লুক্কায়িত জিনিস প্রকাশিত হয়ে পড়ত। এর একটি উদাহারণ হলঃ একবার একদল ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল এবং তাঁকে সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে 'আসসালামু আলাইকুম' না বলে, বললঃ "আস সামু আলাইকুম [আপনার ওপর সাম বর্ষিত হোক], হে আবুল ক্বাসিম"। 'আস-সাম' অর্থ মৃত্যু। তারা শব্দের গঠন পরিবর্তন করে ফেলল, যদি বাইরে থেকে সম্ভাষণটা নিরীহ

মনে হচ্ছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সম্ভাষণটি ছিল বিদ্বেষপূর্ণ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তা বুঝে ফেললেন এবং জবাবে বললেনঃ “ওয়া আলাইকুম [তোমাদের ওপরও সাম বর্ষিত হোক]।” আয়েশাও (রা) সম্ভাষণটা বুঝে ফেললেন কারণ ইয়াহুদীদের আগমন তাঁর ঘরেই হয়েছিল। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সমর্থনে রাগান্বিত হয়ে ইয়াহুদীদের জবাব দিলেনঃ “বাল আলাইকুম আস-সাম ওয়াযযাম [তোমাদের জন্যও মৃত্যু, ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা]। তোমাদের ওপর আল্লাহর লানত ও ক্রোধ বর্ষিত হোক।” রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশাকে (রা) বললেন, “আস্তে, হে আয়েশা! অশোভন হয়ো না। কঠোরতা ও অশোভনীয়তা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা অশোভন ও অশালীন লোকদের পছন্দ করেন না। নম্র হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ নম্র এবং সবকিছুতে নম্রতা পছন্দ করে।” আয়েশা (রা) বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কি শুনেন নি তারা কি বলেছে? তারা ‘আস-সামু আলাইকুম’ বলেছে।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “তুমি কি শোননি, আমি তাদের কি বলেছি? আমিও তাদের ‘ওয়া আলাইকুম’ বলেছি। তাদের ব্যাপারে আমার দোয়া কবুল হবে, কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের দোয়া কবুল হবে না। হে আয়েশা! নম্রতা সবকিছুকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে, কিন্তু নম্রতাকে কোন জিনিস থেকে সরিয়ে ফেলা তা কেবল কদার্যাকারই ধারণ করে।”[12]

এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ব্যাপারগুলো হলঃ

১) প্রথমটি হল ইয়াহুদীদের সাথে নবীজির (সা) ব্যবহার। যেমনটা কিনা দেখা যায়, নবী (সা) তাদের সাথে সুমহান ও উদার আচরণ করেছেন। তাদের সাথে নম্রতা ও সংযম দেখিয়েছেন, যদিও তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল এবং তাদের জিহবা ফসকে তাদের অন্তরের লুক্কায়িত অনুভূতিগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। এরপর তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী তাদের সাথে উত্তম আচরণ ও প্রতি-আচরণ করেন। এর চাইতে মহৎ ও উদার আচরণ আর কি হতে পারে যে, তিনি তাদের জন্য তাঁর ঘরের দরজা খুলে দেন, তাদের পাগুলো তাঁর ঘরের জাযিম পদদলিত করে, তারা তাঁর পবিত্র হুজরাসমূহে প্রবেশ করে, যেগুলো থেকে আল্লাহ সমস্ত অপবিত্রতা দূর করে সেগুলোকে পবিত্র করেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় নবীজি (সা) তাদের সাথে অশেষ বিশ্বস্ততার সাথে আচার-ব্যবহার করেছেন। সেইসাথে তিনি সংঘাত নিয়ন্ত্রণ, সম্প্রীতি সৃষ্টি এবং তাদের হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দিতেও অনেক প্রচেষ্টা চালান। আর এজন্যই তারাও তাঁর বাড়িতে তাঁর সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে আসত আর তিনিও তাদের ঘরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেতেন, যা থেকে নবীজির (সা) আচার-আচরণে রিসালাতের ব্যাপারে নিজ আত্মবিশ্বাস ও চারিত্রিক মহত্ব ফুটে ওঠে।

২) আমরা দেখতে পাই, নবীজি (সা) আয়েশাকে (সা) অশালীন হতে নিষেধ করেছেন, যদিও আয়েশা (রা) তাঁকে সমর্থন করতে গিয়েই রাগান্বিত হয়েছিলেন। আয়েশা (রা) যে উস্কানীমূলক সম্ভাষণ শুনেছিলেন, সেটা নবীজিও (সা) শুনেছিলেন। এরপরেও তিনি আয়েশাকে (রা) অশালীন হতে নিষেধ করেন, পাছে তিনি তাতে অভ্যস্ত হয়ে যান। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য মুমিনদের সাথে যায় না। আল্লাহও এটা পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ যা অপছন্দ করেন মুমিন তা পরিহার করে ও তা থেকে বেঁচে থাকে এবং তা যেন তার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে পরিণত না হয় সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালায়। তাই নবীজির (সা) এই নিষেধটি মূলত আয়েশার (রা) জন্য একটি প্রশিক্ষণ ছিল, যদিও ইয়াহুদীরা যা বলেছিল তা ছিল খুবই জঘন্য। কিন্তু তিনি আয়েশার (রা) শুদ্ধতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে অশালীনতার কিছু সেটাকে স্পর্শ না করে। নবীজি (সা) ইয়াহুদীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন যাতে তাদের অন্তর সত্য স্বীকার করে নেয় এবং সে অনুযায়ী তারা সাড়া দেয় এবং সেইসাথে তাদের ওপর আল্লাহর হুজ্জত চূড়ান্তভাবে কায়েম হয়ে যায়।

৩) আমরা দেখি নবীজি (সা) আয়েশাকে (রা) সহৃদয়তার সাথে নম্রতার আদেশ দেন এবং সে ব্যাপারে তাঁকে উদ্দীপ্ত করেন। তিনি তাঁকে বলেন, নম্রতা হচ্ছে আল্লাহর গুণ এবং বান্দা তার সব ব্যাপারে নম্রতা অবলম্বন করবে এটা মহাসম্মানিত আল্লাহ পছন্দ করেন। নম্রতা সবকিছুকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে, আর নম্রতাহীনতা সবকিছুকে কদর্য করে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, নবীজি (সা) ইয়াহুদীদের সাথে পর্যন্ত নম্রতা দেখিয়েছেন এবং নম্রতার আদেশ দিয়েছেন, যদিও তাঁর রব তাঁকে জানিয়েছেন যে, ইয়াহুদীরা হচ্ছে সবচেয়ে কঠোর শত্রু। তারাই এক্ষেত্রে কথোকপককের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করার মাধ্যমে সীমালংঘন করে শত্রুতার সূচনা করেছে। যদি কোন দলকে নম্র আচরণ পাওয়ার অযোগ্য মনে করতে হয় তাহলে তারা ইয়াহুদীই হওয়ার কথা এবং উপরোক্ত ঘটনার ক্ষেত্রে তো এটা আরো বেশি সত্য। কিন্তু এরপরেও নবী (সা) তাদের সাথে নম্র আচরণের আদেশ দিয়েছেন। তাই অবাক করা ব্যাপার নয় যে, এই নবীজিই (সা) সকল ব্যাপারেই নম্রতা অবলম্বনের জন্য উৎসাহিত করেছেন।

এখন আমাদের এ প্রশ্ন করাই বাকি আছে যেঃ যদি নবীজি (সা) সবচেয়ে কঠোর শত্রুর সাথে নম্র আচরণ করে থাকেন এবং সে ব্যাপারে আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা আমাদের জীবনে নিজেদের মধ্যে এবং দ্বীন ও ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ নিজেদের ভাইদের সাথে কতটুকু নম্রতা অবলম্বন করে থাকি ? যদি নম্রতা আমাদের সব বিষয়কে সৌন্দর্যমন্ডিত করত, তাহলে আমাদের সমাজের অবস্থা আর কেমন হত ?

৪) আমরা এ ঘটনা থেকে এটাও দেখতে পাই যে, নবীজি (সা) ইয়াহুদী আগন্তুকদের সম্ভাষণ ঠিকই বুঝেছিলেন। কিন্তু এরপরেও জবাব দিতে গিয়ে তারা যা বলেছে সেটার বেশি তিনি বলেন নি। তিনি বলেছেন, "ওয়া আলাইকুম"। তারা যা বলেছে সেটার জবাব দিতে গিয়ে তিনি সীমালংঘন করে ও বাড়িয়ে কিছু বলেন নি।

এটা হচ্ছে প্রত্যুত্তরের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সুবিচার। যদি তারা ভালোভাবে সম্ভাষণ জানাত, তাহলে নবীজি (সা) তাদের চাইতেও ভালোভাবে এর উত্তর দিতেন। কিন্তু তারা যখন খারাপভাবে সম্ভাষণ দিল, তিনি স্রেফ অনুরূপভাবেই তাদের জবাব দিলেন। তিনি উত্তরের ক্ষেত্রে কিছু বাড়িয়ে বলেন নি। এই সম্ভাষণের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে অন্য কোন ব্যবস্থাও নেন নি। অথচ তিনি যদি তেমনটা করতে চাইতেন, তাহলে তা করার মত নেতৃত্ব ও ক্ষমতা তাঁর ছিল।

৫) আমরা দেখেছি, নবীজি (সা) কিভাবে মদীনায় শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ ছড়িয়েছেন, যেখানে সবাই নিজেদের মুহাম্মাদের (সা) আশ্রয়াধীন মনে করত। ইয়াহুদীরা নিশ্চিন্তে নবীজির (সা) হুজরায় প্রবেশ করে। তারা যখন নবীজিকে (সা) বক্রভাবে সম্ভাষণ জানাল, তারা এমন কিছু বলে নি যা কেবল তারাই বুঝতে পারত। রাসূলুল্লাহ (সা) সেটা সাথে সাথে বুঝেছেন, এমনকি অল্প বয়স সত্ত্বেও আয়েশাও (রা) তা বুঝেছিলেন। কিন্তু তারা তো নবীজি (সা) প্রদত্ত নিরাপত্তাধীন ছিল। তারা জানত যে, রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষে কখনো এর জবাবে সীমালংঘন করা বা প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব নয়।

৬) কিছু নিষ্ফলা অন্তর রয়েছে যাদের সাথে চারিত্রিক মহত্ব কোন কাজে আসে না, আর না চমৎকার আচার-আচরণ, সুন্দর লেনদেন এবং চুক্তির যথার্থ রক্ষা তাদের অন্তরের বিদ্বেষের আগুনকে নেভাতে পারে। ইয়াহুদীদের এই গোষ্ঠীটির সাথে এমনটাই হয়েছিল যদিও নবীজি (সা) তাদের সাথে ভালো আচার-ব্যবহার করেন, তাদের জন্য নিজ ঘরের দরজা খুলে দেন এবং তারা তাঁর ঘরের জাযিমের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। কিন্তু তাদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে যায় যেখান থেকে কেবল অন্তরের গরলই উথলে পড়ে। ইয়াহুদীরা তো শব্দ ওলট-পালটে পটু। তাদের এই বিকৃত সম্ভাষণ সত্ত্বেও নবীজি (সা) তাদের সাথে স্বীয় নৈতিকতা, সচ্চরিত্র এবং মহত্ব অনুযায়ী ব্যবহার করেন, তাদের চারিত্রিক নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করেন নি। তাঁর, তাঁর পরিবার ও তাঁর স্ত্রীদের ওপর আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

৮ | বালক

এক ইয়াহুদী বালক তার রুগ্ন শরীর নিয়ে মৃত্যুশয্যায়। তখনো সে একজন কিশোর মাত্র। সে নবীজির (সা) খেদমত করত; তাঁর ওযুর পানির ব্যবস্থা করে দিত, জুতা এগিয়ে দিত ও তাঁর অন্যান্য কিছু প্রয়োজন পূরণ করে দিত। নবীজি (সা) তাকে না পেয়ে খবর নিতে তার বাড়িতে গিয়ে তাকে অসুস্থ অবস্থায় পেলেন। তিনি বালকটির নিকটবর্তী হয়ে তার মাথার কাছে বসলেন। বালকটির পিতাও তাঁর মুখোমুখি বসা ছিল। নবীজি (সা) সকরুণ ও দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে কিশোর বালকটির দিকে তাকালেন। বালকটি তখন দুনিয়াকে পিছে ছেড়ে যাচ্ছে ও আখেরাতের নিকটবর্তী হচ্ছে। এ মুহূর্তে বালকটির যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেদিকে নবীজি (সা) তাকে আহবান করলেন, আর তা হচ্ছে সেই দ্বীন যা তিনি তাঁর রব থেকে পেয়েছেন। নবীজি (সা) তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়ে বললেনঃ “ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল – এ সাক্ষ্য দাও।”

বালকটি যে মুহাম্মাদ (সা) থেকে এই আহবান পেল, সেই মুহাম্মাদের (সা) খেদমত সে করেছে, তাঁকে সে ভালো করে চিনত এবং তাঁর আচার-আচরণ সম্পর্কে অবগত ছিল। সে জানত, এই আচরণ নবীদের আচরণ, স্বৈরাচারী ও প্রতারকদের আচরণ নয়। এ ডাক পাওয়ার পরও সে নিকটে বসা তার পিতার কর্তৃত্বের সামনে অসহায় ছিল। সে বারবার তার দৃষ্টি এপাশ-ওপাশ করতে লাগল এবং তার পিতার দিকে তাকাল। সে তার পিতার অনুমতির অপেক্ষায় ছিল। আবার সে নবীজির (সা) দিকেও দৃষ্টি ঘুরাচ্ছিল যেন সে তার জীবনের রয়ে যাওয়া অল্প কিছু মুহূর্তের সাথে পাঞ্জা লড়ে যাচ্ছিল। তার পিতা তাকে বললঃ “আবুল ক্বাসিমের কথা শুনো। তিনি তোমাকে যা বলতে বলেন তা বলে ফেলো।” জীবনের শেষমুহূর্তে থাকা বালকটির ঠোঁটদ্বয় থেকে এই সত্য কালেমা বেরিয়ে এলঃ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল”। বালকটি কালেমায়ে শাহাদাত বলার সাথে সাথে তার জীবনের বাকি কিছু মুহূর্তও শেষ হয়ে এল। সে তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল এবং মৃত্যুবরণ করল।

এরপর নবীজি (সা) বালকটির হেদায়াতপ্রাপ্তি ও তার সুন্দর ইতির সুসংবাদ নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং বললেনঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বালকটিকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।” এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের কাছে গিয়ে বললেনঃ “তোমাদের ভাইয়ের ওপর জানাযা পড়ো।”[13]

***এ কাহিনীতে কিছু লক্ষ্যণীয় ব্যাপার রয়েছে। নবী (সা) এবং ইহুদীর মধ্যকার এই মুহূর্ত আসলেই চমৎকার। নবীজির (সা) ঘরে ইয়াহুদী বালকও থাকত, যে নবীজির (সা) বিশেষ খেদমত, ওযু এবং জুতার দায়িত্বে ছিল। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সাহাবীগণের সবাইই নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের নবীজির (সা) খেদমতে নিয়োজিত করতে উদগ্রীব ছিলেন। এরপরও এই ইয়াহুদী বালকের কপালেই এই সৌভাগ্য ও সম্মান জোটে।

*এখানে মুশরিক ও ইহুদীসহ কাফেরদের সাথে আচরণের সুস্থির মানসিকতার সন্ধান মেলে। সেখানে কোন ধরনের উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা ছিল না। এই নবীজিই (সা) এক জমায়েতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহুদীরা একসাথে জড়ো হয়েছিল। তিনি তাদের সাথে বসেন, কথা বলেন, তাদেরকে দাওয়াত দেন এবং এরপর চলে যান। নবীজি (সা) তাদের বাড়িতেও যেতেন এবং তারা দাওয়াত দিলে তা কবুল করতেন। তাঁর নিজের ঘরও তাদের জন্য সবসময় খোলা থাকত। এর ফলে যে নৈকট্য সৃষ্টি হয় তাতে একজন অমুসলিম বালকও নবীজির (সা) বিশেষ খেদমতের দায়িত্ব নেয়।[14][15][16]

এসব কিছুই ছিল শক্তিমত্তা ও আত্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। এই মেলামেশা ছিল এই দ্বীন ও এর অনুসারীদের পরিচিত করানো এবং অমুসলিমদের অন্তরে এই দ্বীন কবুল করা বা এর ব্যাপারে অবগত হতে যে বাধা ছিল তা ধ্বসিয়ে দেয়ার সবচেয়ে সহজ রাস্তা।

এজন্যই বালকটি মৃত্যুশয্যায় নবীজির (সা) যে দাওয়াত পেয়েছিল তা সে রিসালাত ও রাসূলের (সা) ব্যাপারে অজ্ঞাত অবস্থায় পায় নি। নবীজির (সা) সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে তার নিকট তাঁর নবুওয়াতের দলিল ও তাঁর দাওয়াতের সত্যবাদিতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে নবীজির (সা) আহবানের প্রতি ্তার যে সাড়া তার ভিত্তি ছিল পূর্বের জানাশোনা এবং ঘনিষ্ঠ মেলামেশা।

*একইভাবে আমরা অমুসলিমদের সাথে মানবিক আচরণের উদাহারণও এখানে দেখতে পাই। আল্লাহ তাঁকে পুরো মহাবিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক করে পাঠিয়েছেন। তাঁর অনুসৃত নীতিতে অমুসলিম যুদ্ধবন্দীদের খাওয়ানো হয়, তাদের রোগীদের দেখতে যাওয়া হয়, তাদের লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়ানো হয়। "সে কি একজন মানুষ নয়?" এজন্যই এই ইয়াহুদী বালককে দেখতে নবীজির (সা) আগমন কোন নেতা বা দায়িত্বশীলকে দেখতে আসার জন্য নয়, বরং একটি অল্পবয়স্ক খাদেমকে দেখতে আগমন ছিল। নিঃসন্দেহে তা ছিল মানবীয় মহত্ব, নৈতিক উদারতা এবং মুহাম্মাদী মহানুভবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা রাসূলের (সা) উত্তম অনুসারী হিসেবে সাহাবা ও তাবেয়ীগণ যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা মানবীয় অন্তরসমূহের প্রতিবন্ধকতা খুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহর নূর ও হেদায়াতের আলো দ্বারা সেগুলোকে আলোকিত করেছেন।[17]

*এরপর প্রশ্ন উঠতে পারে, নবীজির (সা) এরকম প্রচন্ড উচ্ছাস ও উদ্বেল আনন্দে মূর্ত হওয়ার গোপন রহস্য কি ছিল? তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করে বলেছিলেনঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার মাধ্যমে বালকটিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।" এরপর তিনি ঐ বালক এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিলেন এবং তাঁদের ওপর তার জানাযার নামায পড়ার দায়িত্ব তুলে দিলেনঃ "তোমাদের ভাইয়ের ওপর জানাযা পড়।"

প্রশ্ন হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবাগণ একটি ছোট বালকের ইসলাম গ্রহণ এবং মৃত্যুবরণ থেকে কিভাবে লাভবান হলেন? সেই বালক তাঁদের সাথে কোন যুদ্ধে যায় নি, সে জুমার নামাযও আদায় করে নি, তাঁদের জন্য সেই বালক কোন ধনসম্পদও রেখে যায় নি, আগের মত সেই বালক আর রাসূলুল্লাহর (সা) খেদমতও করতে পারবে না। তাহলে এই খুশি কেন?

মানুষের হেদায়েত এবং জাহান্নামের তলানী থেকে তাদের রক্ষা করাই ছিল নবীজির (সা) চিন্তা, যে উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জীবন পার করেছেন। তাঁর সব অনুভূতির এর সাথে জড়িত ছিল, খুশি হোক কিংবা দুঃখ, রাগ হোক কিংবা খুশি। আর সেজন্যই বালকটির ইসলাম গ্রহণে তিনি এমন খুশি হয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াতের কারণে একজন মানুষ পথভ্রষ্টতার পর হেদায়েত লাভ করেছে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়েছে – এ নেয়ামতের জন্য তিনি তাঁর রবের প্রশংসা করেছেন, যদিও ইসলাম গ্রহণের পরপরই বালকটি মৃত্যু বরণ করেছিল। যে

নবীজি (সা) এমনটা খুশি হয়েছিলেন, তিনি দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রত্যাখ্যানে এতটাই দুঃখিত হতেন যেন তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। "কাজেই হয়ত বা তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে তোমার নিজেকে তুমি দুঃখে কাতর করে তুলবে যেহেতু তারা এই নতুন বাণীতে বিশ্বাস করছে না" [সূরা কাহফঃ ৬]।

নিজেদের আদর্শের দিকে আহবানকারীগণের অন্তরে তাদের আহবান এক ধরনের আবেগানুভূতির স্থান দখল করে। নিজেদের আহবানের সাথে তাদের মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাব তাদের অনুভূতি ও অস্তিত্বে ফুটে ওঠে। রাসূলুল্লাহও (সা) এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

*আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবীজির (সা) সদাপ্রস্তুত থাকা। তিনি দাওয়াত, হেদায়েত ও আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার কোন সুযোগই বাদ দিতেন না, যদি তা রুগ্নদেহী রোগীর শেষ কিছু মুহূর্তের সাথে পাল্লা দিয়ে করতে হত এরপরও।

তাঁর এই রোগী দেখতে যাওয়া থেকে মহিমান্বিত বিনয়, মাধুর্যমন্ডিত চুক্তিরক্ষা, নম্রতা, বিনম্রতা ফুটে ওঠে। আর এজন্যই এই নবীর জীবনে চারিত্রিক মহত্বের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। "হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর" [সূরা আহযাবঃ ৫৬]

৯। উদার মুশরিক

বদরের যুদ্ধ শুরু তেমন হয়েছিল একটি নৈতিক শিক্ষা দিয়ে, এর শেষও হয়েছিল একটি নৈতিক শিক্ষা দিয়ে। যে নবীকে উত্তম আদর্শের পূর্ণতা দান করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, সেই নবী যুদ্ধের ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেও এর বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

প্রথম শিক্ষাটি ছিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই। মুসলিমদের অন্তরসমূহ মক্কার কুরাইশদের জুলুমের তিক্ত স্মৃতি এবং আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ভরপুর ছিল, যা কুরাইশরা নিজেদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ও ঔদ্ধত্য দ্বারা অর্জন করে নিয়েছিল। এমতাবস্থায় নবীজি (সা) একজন মুশরিককে রক্ষার ঘোষণা দিলেন, যে ছিল কুরাইশ বাহিনীরই একজন এবং মক্কা থেকে বদরে নিজ অস্ত্র নিয়ে এসেছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এরপরও নবীজি (সা) বললেনঃ "যে যুদ্ধক্ষেত্রে আবুল বাখতারী বিন হিশামের সম্মুখীন হবে, সে যেন তাকে হত্যা না করে।"

শৌর্য ও মহত্বের দিক দিয়ে এই ব্যক্তি যে অন্য মুশরিকদের থেকে অগ্রসরমান ও ব্যতিক্রম ছিল সেদিকে নবীজির (সা) দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। মক্কায় রাসূলুল্লাহকে (সা) কষ্ট প্রদানের ব্যাপারে এ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সংযত আচরণ প্রদর্শন করে। বনু হাশিমকে শিয়াবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ করার ওপর যে নিষ্ঠুর চুক্তিপত্র লিখিত হয়েছিল তা বাতিল করার ব্যাপারে তার প্রকাশ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। নবীজি (সা) তাঁর এই পূর্বের ভূমিকার কথা মনে রেখেছিলেন এবং তাকে রক্ষা ও হত্যা না করার কথা ঘোষণা করেছিলেন, যদিও সে ছিল একজন মুশরিক এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

দ্বিতীয় নৈতিক শিক্ষাটি ছিল বদরের ময়দানে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুসলিমরা বিজয়ের ফলস্বরূপ ৭০ জন যুদ্ধবন্দী লাভ করল। এসব বন্দীর মধ্যে ছিল নবীজির (সা) সবচেয়ে কঠোর শত্রুরা এবং এদের বেশিরভাগই ছিল নবীজিকে (সা) কষ্ট প্রদানে হিংস্র, যেমনঃ নাযর বিন হারিছ, উক্ববা বিন আবী মু'ঈত।

মুসলিমদের অন্তরসমূহ মক্কায় এসব অত্যাচারীদের আরোপিত পীড়াদায়ক অত্যাচার, দুর্বল মুসলিমদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও নবীজির (সা) প্রতি দুঃসাহস দেখানোর স্মৃতি মনে রেখেছে। মুসলিমদের হৃদয়ে তখন এসব

বন্দীর প্রতি ছিল কঠোরতা এবং নিষ্প্রভতা। মুমিনদের অন্তরসমূহের সেসময় সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল নিজেদের প্রতিশোধস্পৃহার পূরণ, যা তাদের হৃদয়ের ক্রোধ দূর করবে। ঠিক তখনই নবীজি (সা) তাঁর সামনে থাকা এসব বন্দীদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ “যদি মুত’ঈম বিন আদী জীবিত থাকত এবং সে এসব কলুষিত লোকদের মুক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করত তাহলে আমি এদের ছেড়ে দিতাম।” নবীজি ঘোষণা দিলেন, এদের সকলের মুক্তি পেত যদি মুত’ঈম বিন আদী রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতঃ “হে মুহাম্মাদ! এদের আমার জন্য ছেড়ে দাও।” নবীজি (সা) তাদের সবাইকে মুত’ঈম বিন আদীর জন্য ছেড়ে দিতেন এবং সকল প্রতিশোধস্পৃহা ঠান্ডা হয়ে যেত, যদিও তাদের প্রত্যেকেরই ছিল অপরাধের ইতিহাস। আর এসব কিছুই হত মুত’ঈম বিন আদী তাদের মুক্তির ব্যাপারে কথা বললে অথবা সুপারিশ করলে।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, মুত’ঈম বিন আদী মুশরিক হিসেবে জীবনযাপন ও মৃত্যুবরণ করেছে। মহাকালের একদিনের জন্যও সে বলেনিঃ “হে রব! শেষ বিচারের দিন আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিও।” কিন্তু সে ছিল সাহসিকতা ও শৌর্যের অধিকারী। তার শৌর্যের একটি উদাহারণ ছিল, নবী (সা) যখন তায়েফ থেকে ফিরে আসেন, তখন সে তাঁকে আশ্রয় দেয় এবং কুরাইশরা তা মেনেও নেয় ও মুত’ঈমকে উদ্দেশ্য করে বলেঃ “আপনি এমন ব্যক্তি যার অঙ্গীকারকে তুচ্ছ করে দেখা হয় না।”

তার সে মহত্বের সাথে প্রজ্ঞা ও মতের যথার্থতার সম্মিলনও ঘটিয়েছিল মুত’ঈম। নবীজির (সা) হিজরতের পর সে কুরাইশদের জড়ো করে বলেছিলঃ “তোমরা মুহাম্মাদের সাথে যা করার করেছো। কিন্তু এখন মানুষের মধ্যে তোমরা তার ব্যাপারে সবচেয়ে সংযত হও।”[18]

বদরের নৈতিক শিক্ষাঙ্গন থেকে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষাসমূহ পাইঃ

১) কাফের ও প্রতিপক্ষ যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও মহৎ মানুষের মহৎ কর্মের স্মরণ এবং শৌর্যের অধিকারী মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া। শিরকের মত ধর্মীয় বিষয়ে তাদের সর্বোচ্চ ভুলের কারণে শৌর্য ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার মত তাদের দুনিয়াবী গুণাগুণকে স্মরণ করা যাবে না এমন কোন কথা নেই।

২) পূর্বে যারা চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও মহানুভবতা দেখিয়েছে তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) বিশ্বস্ত আচরণ ও উত্তম প্রতিদান। তিনি সামরিক সংঘাত, উত্তেজনা ও ক্ষোভ এবং ক্রোধোন্মত্ততার মত এমন কঠিন সময়েও

তাদের চারিত্রিক মহানুভবতা এবং এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কথা বলেছেন।

এসব নৈতিকতাবাদীরা এমন একজনের সাথে সচ্চরিত্রের সাথে আচরণ করেছে যাঁকে উত্তম আদর্শে পূর্ণতা আনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। যিনি নিজের আচরণ ও শব্দ দিয়ে বলেছেনঃ "চুক্তি রক্ষা করা ঈমানের অঙ্গ।" এজন্যই সুমহান নবী (সা) এসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেগুলোর উল্লেখ করেছেন এবং আরো উত্তম রূপে সেগুলোর প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।[19]

৩) নবী (সা) এসব কথা এমন প্রেক্ষিতে বলেছেন যে প্রেক্ষিতে এগুলো বলা যেতে পারে বলে কারো ধারণায় ছিল না, কেননা এ প্রেক্ষিত ছিল সামরিক সংঘর্ষ এবং প্রতিশোধস্পৃহা ও ক্রোধাগ্নি নিবারণের সুযোগের প্রেক্ষিত। কিন্তু নবীজি (সা) এসব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে নিজের নৈতিক অবস্থান সুস্পষ্ট করেন। এটা কোন রাজনৈতিক কৌশল ছিল না, ছিল নৈতিকতাভিত্তিক নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ।

৪) নবী (সা) এসব উদার মুশরিকদের ব্যাপারে এরূপ কথা তাদের পরিবারবর্গ বা আত্মীয়দের শোনানোর জন্য বলেন নি। তিনি তাঁর ওপর ঈমান আনা সাহাবীদের সামনে এসব বলছিলেন, যাতে তাঁদের অন্তরে এক স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণমূলক উপায়ে এসব নৈতিক বৈশিষ্ট্যের মহত্ব এবং এ বৈশিষ্ট্যধারীদের মর্যাদার ব্যাপারটি গেঁথে দিতে পারেন, যদিও সে বৈশিষ্ট্যধারী একজন মুশরিক হয়। এর কারণ, এসব নৈতিক আচরণের আরো উত্তম প্রতিদান দিতে তো সাহাবাদেরই অগ্রসরমান থাকার কথা। ইনসাফের মানদন্ড মেনে চলা এবং মানুষকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়াটাই ছিল নবীজির (সা) শিক্ষা।

৫) সাহাবাগণ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এর মানে খুব ভালোভাবে বুঝে নিয়েছিলেন। আর তাই তারা ইনসাফ অবলম্বন করেছেন, মানুষের হক আদায় করেছেন এবং মানুষের মর্যাদা মাথায় রেখেছেন, যদিও সে ব্যক্তি ধর্ম, দেশ ও লিঙ্গভেদে তাঁদের থেকে ভিন্ন থাকত। মুত'ঈম বিন আদী যখন মারা যায়, তখন হাসসান বিন ছাবিত (রা) তার স্মরণে একটি কবিতা লিখেন যেখানে তিনি মুত'ঈমের অর্জনগুলো উল্লেখ করেন এবং তার সচ্চরিত্রের প্রশংসা করেন। আমর বিন আস (রা) রোমানদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন যেগুলো ছিল চারিত্রিক গুণাবলীর অংশ এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।[20]

৬) নবীজির (সা) উপরোল্লিখিত শিক্ষার অর্থের স্পষ্টতা এবং তাঁর প্রশিক্ষণে এর সুস্পষ্টতা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় তা মেনে চলতে ব্যর্থ হই। অনেক লোককে দেখা যায় পাশ্চাত্যের ব্যাপারে অতিমুগ্ধতা নিয়ে কথা বলতে। অপরপক্ষে অনেককে দেখা যায় তারা পাশ্চাত্যের কোন নৈতিক গুণ কিংবা তাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলা পরিহার করে চলে, যেগুলো বাস্তবিক অর্থেই তাদের সভ্যতার শক্তিমত্তার কারণ। আমরা অনেকসময় মানুষ যেসব ভুল করে বসে সেগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারি না। সম্ভবত এমন কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা আমাদের জন্য মানসিকভাবে কঠিন হয় যাদের সাথে আমাদের ইজতিহাদী বা এরকম কোন ভিন্নতা আছে। কিন্তু নবী (সা) এ ব্যাপারে ইনসাফের মানদন্ডকে চূড়ান্তভাবে মেনে চলেছেন, যেখানে তাঁর ও প্রশংসিত ব্যক্তিদের মাঝে শিরকে আকবরের ফারাক ছিল। আমাদের দ্বীনি ভাইদের সাথে একই মানদন্ড ব্যবহার করা আমাদের জন্য আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, যেখানে আমাদের মধ্যকার মিল আমাদের মধ্যকার ফারাকের তুলনায় এবং যেসব উপাদান আমাদের নিকটে আনে তা আমাদের দূরে ঠেলে দেয় এমন উপাদান থেকে অনেক বেশি। আমরা যেন আমাদের ভাইদের ভুলগুলোকে এমন শৃঙ্খল না বানাই যেটাতে আমরা তাদের বন্দী করে রাখব, যার কারণে আমরা তাদের উৎকর্ষতা ও গুণাবলীর দিকে আর তাকাবোও না।

১০। তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী?

সে তরুণটির চোখের মণি ছিল কুচকুচে কালো। তাঁর অন্তরটা ছিল আলোকিত। তিনি ছিলেন লম্বা ও সুন্দর। তাঁর নয়নজোড়া থেকে বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন ঠিকরে পড়ত। অল্প বয়স সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সম্মানের অধিকারী। তাঁর বয়স বিশ থেকে অল্প একটু বেশি ছিল। অথচ রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে সম্মান ও নৈকট্যের এমনই স্থান ছিল তাঁর যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেনঃ "হে মু'আয, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে তাঁর জন্যই ভালোবাসি।" জবাবে মু'আযও বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! আমিও আপনাকে তাঁর জন্যই ভালোবাসি, হে রাসূলুল্লাহ।"[21]

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মর্যাদা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে বলেছেনঃ "কেয়ামতের দিন মু'আয উলামাদের অগ্রভাগে থাকবে।" তিনি আরো বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে মু'আয হালাল ও হারামের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী।" তিনি ছিলেন সেই চারজনের চতুর্থজন যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশাতেই পুরো কোরআন মুখস্থ করেছিলেন।
222324

মু'আয সচেতনতার সাথে এ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন নবীজির (সা) ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের মাধ্যমে। তিনি তাঁর গোত্র বনু সালিমার বসতিস্থান থেকে এসে নবীজির (সা) সাথে সালাত আদায় করতেন এবং তাঁর মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি নবীজির (সা) সাথে এশার সালাত আদায় করে এরপর নিজ গোত্রের নিকট ফেরত যেতেন। তারা তাঁর অপেক্ষায় থাকত যেন তিনি তাদের নামায পড়ান। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যকার সবচেয়ে উত্তম ক্বারী ও বিজ্ঞ। এরতিনি তিনি তাদের সাথে আবার এশার সালাত আদায় করতেন, যা ছিল তাঁর জন্য নফল কিন্তু তাঁর গোত্রের জন্য ফরয।

এই ক্বারী ও আলেম তরুণ এমন মর্যাদা অর্জন করেছিলেন যা ছিল পথপ্রদর্শনকারী। একবার মু'আয রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সালাত আদায় করলেন, এরপর নিজ গোত্র বনু সালিমার কাছে ফিরে গেলেন। তারাও অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি তাদের সাথে এশার সালাত সূরা বাক্বারা দিয়ে শুরু করলেন। তরুণ ক্বারী হওয়ায় তিনি ধীরে ধীরে সূরা বাক্বারা তেলাওয়াত করতে লাগলেন, যা ছিল কোরআনের

সবচেয়ে লম্বা সূরা। যারা তাঁর তেলাওয়াত শুনত, তারা ভাবতো এই হয়ত এখুনি মু'আয তাঁর তেলাওয়াত শেষ করবেন।

তাঁর পিছে এক তরুণ সালাত আদায় করছিল, যে হাতের কাজকর্ম এবং উটকে পানি পান করানোতে তার সারাদিন ব্যয় করেছে। সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তার জন্য সেদিনটিতে অনেক খাটুনি গিয়েছিল। এর ওপর সে মু'আযকে (রা) ধীরে সুস্থে অনেক লম্বা এক সূরা তেলাওয়াত করতে দেখছিল। অবসন্ন হওয়ায় সালাতে লম্বা ক্বিয়ামের শক্তি তার ছিল না। সে নামায ছেড়ে দিয়ে একাকী সহনীয় দৈর্ঘ্যের সালাত আদায় করে নিল। এরপর সে মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজ উটের লাগাম ধরে প্রস্থান করল। সালাত শেষ করার পর মু'আযকে এ ব্যাপারে জানানো হল। তিনি বললেনঃ "ঐ লোক নিশ্চয়ই একজন মুনাফিক।" মু'আযের কথা সে তরুণের কানে পৌঁছালো। সে পরদিন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গেল যখন মু'আয তাঁর কাছেই ছিল এবং বললঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আমরা এমন এক গোষ্ঠী যারা নিজ হাতে কাজ করি এবং নিজ হাতে জমিতে পানি দেই ও পশুপাখিদের পান করাই। মু'আয তো আপনার কাছে দীর্ঘসময় থাকে, এরপর তিনি আমাদের কাছে ফিরে এসে আমাদের সালাতে লম্বা তেলাওয়াত করেন। তিনি আমাদের সাথে গতকাল সালাত আদায় করার সময় সূরা বাক্বারা তেলাওয়াত করেন। এর ফলে আমি সংক্ষেপে একা একা সালাত আদায় করি। এখন তিনি বলছেন, আমি নাকি মুনাফিক!"

এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) মু'আযের উদ্দেশ্যে বললেনঃ "হে মু'আয, তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? যখন তুমি সালাতে ইমামতি করবে তখন সালাতে সূরা শামস, সূরা দ্বোহা, সূরা আ'লা, সূরা লাইল তেলাওয়াত করবে। তোমার পিছে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং জরুরী কাজে ব্যস্ত লোকেরা সালাত আদায় করে।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সেই আনসারী তরুণেকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কিভাবে তোমার সালাত আদায় কর, হে ভ্রাতুষ্পুত্র?" সে জবাব দিলঃ "আমি সূরা ফাতিহা পড়ি, এরপর তাশাহহুদ পড়ি। এরপর আমি পড়িঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান নার' [হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই]। আল্লাহর শপথ! আমি আপনার ও মু'আযের তেলাওয়াত ভালোভাবে বুঝি না।" রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "আমরাও এর চারপাশে ঘুরে থাকি।" এরপর তরুণটি বললঃ "সেটা মু'আয শীঘ্রই জানতে পারবে যখন সেই জাতি এগিয়ে আসবে।" সে জাতি দ্বারা কুরাইশ বুঝাচ্ছিল। তারা সবাই জানত যে, কুরাইশদের উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে।

উহুদ যুদ্ধে সেই তরুণ অংশ নেয় এবং শাহাদাত বরণ করে। নবী (সা) মু'আযকে (রা) বললেন, "তোমার আর আমার প্রতিদ্বন্দীর (আনসারী তরুণ) কি অবস্থা?" মু'আয বললেন, "আল্লাহ সত্য বলেছেন আর আমি মিথ্যা বলেছি। সে শাহাদাত বরণ করেছে।"[25]

১) এই ঘটনার সর্বপ্রথম শিক্ষা হচ্ছে ইবাদতের মর্যাদা ও তা আদায় করার পদ্ধতির মধ্যে ফারাক করা। সালাত হচ্ছে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের পর দ্বীনের সবচেয়ে বড় রুকন। এটা ইসলামের খুঁটি এবং মু'মিনদের আনন্দের উৎস। কিন্তু মুসল্লীদের জন্য কাঠিন্য সৃষ্টি করে এমনভাবে সালাত আদায় করা ভুল। নবীজি (সা) এ কারণেই মু'আযের (রা) ওপর রাগান্বিত হয়েছেন এবং তাঁকে কঠোরভাবে বকা দিয়েছেন।

শরীয়তের দলিল এবং তা বাস্তবায়নের মানবীয় ইজতিহাদের মধ্যিকার পার্থক্যও সুন্নাতে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ফজরের সালাত লম্বা করা ইমামের ওপর নবীজি (সা) যে রাগ দেখিয়েছেন, উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কখনো তিনি এরকম রাগ দেখান নি। তিনি বলেনঃ "হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা অন্যদের দূরে সরিয়ে দেয়। তোমরা যারাই সালাতে ইমামতি করবে তাদের উচিত সালাত সংক্ষিপ্ত করা", যদিও স্বয়ং তাঁর ওপরই এই আয়াত নাযিল হয়ঃ "আর ফজরের কুরআন পাঠ। নিঃসন্দেহ ফজরের কুরআন-পাঠ পরিলক্ষিত হয়" [সূরা ইসরাঃ ৭৮]।[26]

একইভাবে তিনি উসামা বিন যায়েদেরও (রা) কঠোর নিন্দা করেন যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলা সত্ত্বেও এক লোককে হত্যা করে বসেন। যদিও উসামা লোকটিকে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর পথেই হত্যা করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহই (সা) তাঁকে এ যুদ্ধাভিযানের দায়িত্ব দেন।[27]

অনুরূপভাবে নবীজি (সা) এক লোকের উপর ক্রোধান্বিত হন যে তার পুরো সম্পদুই সাদাকা করে দিয়েছিল। রাসূল (সা) রাগে তার সম্পদকে তার দিকেই ছুঁড়ে মেরে বলেনঃ "তোমাদের কেউ কেউ সাদাকা করার জন্য তার সব সম্পদ নিয়ে আসে, এরপর সে মানুষের কাছে হাত পাতে। সাদাকা হতে হবে সম্পদের উদ্বৃত্ত হতে", যদিও নবীজি (সা) বলেছেনঃ "সাদাকা হচ্ছে প্রমাণ।"[28][29]

দ্বীনের কোন রীতি ও এর মর্যাদা এবং এর বাস্তবায়ন ও আদায়ের পদ্ধতির মধ্যে এই পার্থক্যের ফলেই কোন কাজের সমালোচনা ও এটাকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং ভুলগুলোকে সংশোধন করা আয়ত্ত্বসাধ্য করে

তুলেছে।

কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন আমলের ফযীলত ও এগুলোর আদায় করার পদ্ধতির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়। এর ফলে কিছু লোক ভুলভাবে ইসলামের খুঁটি সালাত কায়েম করতে গিয়ে মানুষের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি কিছু লোক ভুলভাবে ইসলামের চূড়া জিহাদ ভুলভাবে কায়েম কতে গিয়ে মানুষ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার কিছু মানুষ ইসলামের শি'আর 'নাহি আনিল মুনকার (অসৎ কাজে নিষেধ)' ভুলভাবে কায়েম করতে করতে গিয়ে মানুষের ক্ষতি করে বসে। অথচ 'নাহি আনিল মুনকার' হচ্ছে ধ্বংস হতে এই উম্মতের রক্ষাকবচ। আবার কিছু লোক উপদেশ দিতে গিয়ে মানুষের বিরক্তি এমনকি কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অথচ তা হৃদয় জাগানোর কথা ছিল। এরকম আরো উদাহারণ দেয়া যেতে পারে।

ইসলামের বিভিন্ন শি'আর কায়েম করতে গিয়ে আমাদের পক্ষে ভুলক্রুটি করে ফেলা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আবার আমরা নিষ্পাপ রাসূলগণ কিংবা ফেরেশতাদের মত যতদিন না ইসলামের শি'আর কায়েম করতে পারি, ততদিন হাতে হাত ফেলে বসেও থাকতে পারি না। কিন্তু আমরা আরো বড় ভুল করে বসি যখন এসব শি'আর কায়েমে নিজেদের ভুলের যে সমালোচনা হয় কোরআন ও সুন্নাহ ব্যবহার করে সেটা থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে যাই। অথচ এসব ব্যবহৃত এসব কোরআনের আয়াত বা সুন্নাহ থেকে এসব শি'আরের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় মাত্র। যখন আমরা জামায়াতে সালাত লম্বা করে ফেলি, এর সমালোচনার জবাবে আমরা কোরআনের এই আয়াত ব্যবহার করিঃ "নিশ্চয়ই তা কঠিন একমাত্র বিনয়ীদের জন্য ছাড়া" [সূরা বাক্বারাঃ ৪৫]। যখন আমরা জিহাদ কায়েম করতে গিয়ে ভুল করে ফেলি তখন আমরা নসীহত ও সমালোচনার জবাবে এই আয়াত ব্যবহার করে নিজেদের রক্ষা করিঃ "তোমাদের ওপর যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়" [সূরা বাক্বারাঃ ২১৬]। যখন আমরা 'অসৎ কাজে নিষেধ' করতে গিয়ে ভুল করে ফেলি তখন সমালোচনার জবাবে 'জাহাজ ডোবা' এবং 'অসৎ কাজের প্রতি ঘৃণা রাখার নিচে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান না থাক' এ দুটো হাদীস ব্যবহার করি। এভাবে আমরা বিভিন্ন আমলের ফযীলত ও গুরুত্বের ওপর কোরআন ও হাদীসের দলিলগুলোকে তাদের যথার্থ স্থান থেকে সরিয়ে এসব আমল কায়েমে নিজেদের ভুলের দলিল হিসেবে ব্যবহার করি।

অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত কায়েমে যে ভুল সেটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সহজ সরল কর্মপদ্ধতি বিধৃত করেছেনঃ "হে মু'আয! তুমি কি ফেতনার কারণ হতে চাও", "হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়"।

একইভাবে নবীজি (সা) জিহাদ কায়েমে ভুলের ব্যাপারে বলেনঃ "তুমি কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও লোকটিকে হত্যা করলে ?", "হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি আপনার কাছে দায়মুক্তি চাই।"[30]

আর এভাবেই নবীজির (সা) সামনে যে আমলগুলোকে পেশ করা হত সেগুলো আদায়ের সঠিক পদ্ধতি অকপটভাবে বলে দেয়া হত। একইভাবে আমলের যেসব ভুল তাঁর সামনে পেশ করা হত, সেগুলোকে অকপটভাবে তিনি সংশোধন করে দিতেন।

২) আবদুল্লাহ বিন আদী বিন খিয়ার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি উমারকে (রা) মিম্বার থেকে বলতে শুনেছিঃ 'হে লোকসকল আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের নিকট অপছন্দনীয় করে ফেলো না।' তাঁকে প্রশ্ন করা হলঃ 'এটা কি করে সম্ভব ? আল্লাহ আপনার সংশোধন করুন।' উমার (রা) বললেনঃ 'এটা এভাবে যে, তোমাদের কেউ ইমাম হয়ে সালাতে ক্বিয়াম দীর্ঘ করে, এরপর ফলে মুক্তাদীদের নিকট ক্বিয়ামে যা পড়া হয় তা অপছন্দনীয় হয়ে ওঠে।'

আমীরুল মু'মিনীনের ওপর আল্লাহ রহম করুক। আমরা আল্লাহর বান্দাদের নিকট ইসলামের কত শি'আরকেই না অপছন্দনীয় করে তুলেছি! আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি।

১১। উহুদ ও ইয়ারমুকের মাঝে

মানুষের কল্পনাশক্তি যদি এমন এক অদ্ভুত কাহিনী চিন্তা করতে চায় যেটার চাইতে বেশি অদ্ভুত আর কিছু হতে পারে না, তবে বাস্তবতাও অনেকসময় কল্পনার চাইতেও অধিক কাল্পনিক হতে পারে। এই গল্পের শুরুটা হয়েছিল তৃতীয় হিজরী সালে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে মুশরিক বাহিনী রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথের মুসলিমদের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মুশরিক বাহিনীর প্রধান আবু সুফিয়ান সাখর বিন হারব তার উচ্চতর রাজনৈতিক, সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক দক্ষতার মাপকাঠি অনুযায়ী তার বাহিনীকে প্রস্তুত করছে। সেজন্য সে তার সাথে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এমন সব তরুণদের বেছে নিয়েছে যারা যুদ্ধের দক্ষতা ও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি শত্রুতায় সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। এরা ছিল মক্কায় রাসূলের (সা) প্রথম সারির প্রতিপক্ষ ও শত্রুভাবাপন্ন সরদারদের সন্তান। তাদের মনে শত্রুতা ও হিংস্রতার শিকড় অনেক গভীরে ছিল, যা তারা তাদের পিতাদের থেকে পেয়েছিল এবং তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান বাহিনীর ডানের অংশের নেতৃত্ব দিল খালিদ বিন ওয়ালিদের হাতে এবং বাম অংশের নেতৃত্ব দিল ইকরিমা বিন আবু জাহল বিন হিশামের হাতে। এ তিনজনই ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষ ও প্রায় একই রকমের প্রতিশোধস্পৃহা বহন করত। প্রায় এক বছর আগে বদরের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের ছেলে হানযালা নিহত হয়, আবু জাহেলও বদরে নিহত হয়, যে ছিল ইকরিমার পিতা ও খালিদের চাচা।

উহুদ যুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রথমদিকে বিজয় মুসলিমদেরই হয়। এরপর মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ফাঁকাস্থানকে অসাধারণ সামরিক দক্ষতায় ব্যবহার করে খালিদ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হন। মুসলিম বাহিনীর সত্তরজন নিহত হয়, যাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) উৎকৃষ্ট সাহাবা। তাদের লাশ বিকৃত করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা ও সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হামযা বিন আবদুল মুত্তালিবও (রা) ছিলেন। মুশরিকরা যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটেও পৌঁছে গিয়েছিল। শত্রুর আঘাতের ফলে তাঁর শিরোস্ত্রাণ ফেঁটে মাথায় গেঁথে যায়, তাঁর সামনের দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়, নিচের ঠোঁট আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

বর্মের এক দিক তার গালে ঢুকে যায় এবং কপাল ফেঁটে যায়। এমতাবস্থায় তাঁর চেহারা মোবারক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে।

আবু সুফিয়ান এই ছিনিয়ে আনা বিজয়কে সুনিশ্চিত, বিজয়ের ঘোষণা এবং বদরের প্রতিশোধে সফলতা ঘোষণা করতে তাড়াহুড়ো করছিল। সে বললঃ "হুবলের বিজয় হোক, আজকের দিন বদরের বদলাস্বরূপ। যুদ্ধের জয়-পরাজয় পালাক্রমে হয়ে থাকে।" এরপর সে দ্রুত বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়ল, যাতে যুদ্ধের বিজয় সুনিশ্চিত থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় মুখমন্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললেনঃ "এমন জাতি কিয়াভবে সফলতা লাভ করতে পারে যারা নিজ নবীকে আহত করে, তাঁর দাঁত ভেঙ্গে ফেলে এবং তাঁর মুখমন্ডল রক্তাক্ত করে কেবল এজন্য যে তিনি তাদের তাদের প্রতিপালকের দিকে আহবান করেন? যারা আল্লাহর রাসূলের মুখকে আঘাত করে তাদের ওপর আল্লাহর কঠোর আযাব আপতিত হোক।" এরপর কিছুসময় নীরব থেকে নবীজি (সা) বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে মাফ করে দাও কারণ তারা জানে না।"

এরপর এই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীর (সা) ওপর ওহী নাযিল হয়ঃ "হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর" [সূরা আলে ইমরানঃ ১২৮]।

এর দশ বছর পর আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে পড়ল এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। নবীজিও (সা) রফিকে আ'লার কাছে চলে গেলেন। এই গল্পের আরেক পর্ব শুরু হয় হিজরী ১৩ সালে ইয়ারমুকের সীমান্তে, যেখানে মুসলিম বাহিনীর অগ্রসরমান কলাম রোমান বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য, যেটার ফলাফল শাম অঞ্চলে রোমানদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে।

সে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ বিন মুগীরা, সেই যুদ্ধে মৃত্যুর ওপর শপথকারী অংশের প্রধান ছিল ইকরিমা বিন আবু জাহেল এবং যে অংশ নৈতিক দিকনির্দেশনার জন্য নিযুক্ত ছিল তার প্রধান ছিল আবু সুফিয়ান সাখর বিন হারব।

কতই না অদ্ভূত! এরাই ছিল উহুদের মুশরিক বাহিনীর তিন অধিনায়ক। ইয়ারমুকের যুদ্ধে মৃত্যুর ওপর শপথকারী অংশের অধিনায়ক ইকরিমা বিন আবু জাহেল উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে আহবান জানানঃ "কে আছো আমাকে মৃত্যুর ওপর বাইয়াত দিবে?" প্রায় চারশো জন এ বাইয়াত দেয়ার জন্য জড়ো হয় যারা প্রত্যেকে এই চূড়ান্ত যুদ্ধে শাহাদাত কামনা করছিল। এ যুদ্ধে ইকরিমা শহীদ হন। আর আবু সুফিয়ান এ যুদ্ধে তার পুত্র ইয়াযিদের পতাকাতলে ছিলেন। তাঁর বয়স তখন প্রায় ৮০। এ বাহিনীতে তিনি একটিমাত্র চোখ নিয়ে শামিল হয়েছিলেন। তাঁর অপর চোখ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তায়েফের যুদ্ধে শরীক হওয়ার সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আবু সুফিয়ান চিৎকার করে লোকদের জিহাদ ও যুদ্ধে দৃঢ়পদ থাকতে উদ্দীপনা যোগাচ্ছিলেন। তিনি চিৎকার করে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলছিলেনঃ "আল্লাহর শপথ! তোমরা ইসলামের সাহায্যকারী এবং আরবদের দুর্গ। আর এরা শিরকের সাহায্যকারী এবং রোমানদের দুর্গ। হে আল্লাহ! এটা তোমার দিনসমূহের মধ্যে একটা দিন। হে আল্লাহ! আমাদের বিজয় দাও! আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।" মুসলিম বাহিনীর মনস্তত্ত্বের ওপর এ উদ্দীপক কথাবার্তাসমূহের প্রভাব কল্পনা করা যায়! তারা দেখল, এক কুরাইশী বৃদ্ধ, তাঁর আশি বছর বয়স সত্ত্বেও, তাদের আহবান করে যাচ্ছেন, উচ্চস্বরে চিৎকার করে তাদের জড়ো করছেন, যাতে এই যুদ্ধে মুসলিমদের চূড়ান্ত বিজয় হাসিল হয়। মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদ বিন মুগীরা তাদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয় ছিনিয়ে আনেন।[31]

এই কাহিনী থেকে কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ

১) এই কাহিনীর উহুদ ও ইয়ারমুক - এই দুই পর্বকে যখন একত্রে সামনে আনা হয়, তখন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কিভাবে আবু সুফিয়ান, খালিদ ও ইকরিমা – এই তিনজন কি বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছিল! রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাঁকে ও তাঁর রিসালাতকে আক্রমণ এবং চূড়ান্তভাবে শেষ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে গঠিত মুশরিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন এ তিনজন। এরপর এক লম্বা সময় পর তাঁরা সেই একই নবীর দ্বীনের জন্য সাহসিকতার সাথে মৃত্যুকে পরোয়া না করে লড়েছেন। তাঁরা সেই ভয়াবহ ও চূড়ান্ত যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই নবীর রিসালাতের প্রতিনিধি এবং তাঁর দাওয়াতের মুবাল্লিগ হয়ে। অবশেষে ইকরিমা এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন, আবু সুফিয়ান তাঁর বাকি চোখটিও হারান এবং খালিদের নেতৃত্বে যুদ্ধে জয়লাভ হয়।

এসব কিছুই হয়েছে যখন নবীজি (সা) ইন্তেকাল করেছেন। তাই এ তিনজন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, ভয় কিংবা তাঁকে দেখানোর জন্য এই যুদ্ধে অংশ নেন নি, অংশ নিয়েছেন বরং তাঁর দাওয়াত দ্বারা গভীরভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে, তাঁর রিসালাতের প্রতি বিশৃস্ততা থেকে এবং নিজ চোখে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীত সত্যতা অবলোকন করে। এভাবেই তাঁরা তাঁদের পিতাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শত্রুতা ও তাঁদের অন্তরে তিক্ত প্রতিশোধস্পৃহাকে অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হন। তাঁরা ছিলেন আরব, যে জাতি সবচেয়ে প্রতিশোধপরায়ণ, নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষায় সবচেয়ে কঠোর এবং শত্রুতা জারী রাখতে সবচেয়ে দৃঢ়। এরপর এক বিশাল বিপ্লব ঘটে যায়। এর ফলে রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধের অধিনায়করা তাঁর ওফাতের পর তাঁরই দ্বীনের যুদ্ধের অধিনায়ক বনে যান।

যুক্তিকাঠামো, অন্তরের তরবিয়ত, ঈমানের ভিত্তি, দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ, ভিশন, মিশন ও লক্ষ্যের সুস্পষ্টকরণ – এসবকিছুকেই নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়।

এ ছিল দাওয়াতে মুহাম্মাদীর বিস্ময়কর সাফল্যগুলোর একটি, যাতে মৃত অন্তরগুলো জীবিত হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি সুন্দর বীজ যেন কেঁপে উঠে বেড়ে মাটি ফুঁড়ে বের হয়ে আসে।

২) রাসূলুল্লাহর (সা) এই নববী আদাব যেন অভিভূত করে ফেলার মত! তিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের এক কঠিন মুহূর্তে ছিলেন এবং স্বীয় মুখমন্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলে ফেললেনঃ "সেই জাতি কিভাবে সফল হবে যারা তাদের নবীর মুখমন্ডলকে আঘাত করে?" তিনি এই প্রশ্নের অতিরিক্ত কিছু বলেন নি, আর না তাদের কুপরিণতি নির্ধারণ করে দেন, না তিনি আল্লাহর কাছে তাদের ওপর রহম না করার দোয়া করেন, আর তিনি তাদের ওপর আযাবের দোয়া করেন। তিনি স্রেফ জিজ্ঞাসা করেনঃ তারা কি উৎকৃষ্ট সব মুসলিমদের হত্যা, তাদের মৃতদেহকে বিকৃতকরণ, রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর আঘাত করা, যার ফলে তাঁর চেহারা মোবারকে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে – এসব কিছু করার পর সফল হবে? একটি জাতি কিভাবে তাদের নবীর সাথে এরূপ আচরণের পর সফল হতে পারে, অথচ তিনি তাদের আল্লাহর দিকে ডাকতেন? এ ছিল আঘাতপ্রাপ্তি এবং কঠিন দৈহিক ও মানসিক বেদনার এমন এক সময় যখন মূলত আল্লাহর নিকট প্রার্থনার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। কিন্তু নবী (সা) ছিলেন আল্লাহর ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী ও তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয়কারী। আর তাই

তিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে হালকা শিষ্টাচারমূলক তিরস্কার পান এবং তিনি প্রতিপক্ষের ব্যাপারে চূড়ান্ত রকমের কিছু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন নি।

৩) নবীজির (সা) এই বিশেষ প্রশ্ন "সেই জাতি কিভাবে সফল হবে যারা তাদের নবীর মুখমন্ডলকে আঘাত করে?" মানব বিচারে সুস্পষ্ট ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যারাই এ দৃশ্য দেখে থাকবে, তারাই বলবে, যে জাতি নিজেদের নবীর মুখমন্ডলে আঘাত করেছে তারা কখনোই সফল হবে না। তারা কিভাবেই বা সফল হবে যখন তারা রাসূল ও তাঁর রিসালাতের শত্রুতায় চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করেছে? যুদ্ধ ও মূলোচ্ছেদের চেষ্টার চেয়ে বড় কোন প্রচেষ্টা হতে পারে কি? এরপরও আল্লাহর ওহী নাযিল হল তাঁর নবী, তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় সৃষ্টি যেন মানুষের ভাগ্য ও জীবনের পরিণতির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে বসেন এজন্য। "এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার নেই" [সূরা আলে ইমরানঃ ১২৮]। মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণ এবং চিরস্থায়ী সুখের সিদ্ধান্ত নেয়ার ও মূল্যায়ন করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। "বলুন সব ব্যাপারই আল্লাহর হাতে" [সূরা আলে ইমরান: ১৫৪]। শেষ বিচার আল্লাহর জ্ঞান ও এখতিয়ার অনুযায়ী হবে। "হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদের শাস্তি দেবেন কারণ তারা তো জালেম" [সূরা আলে ইমরানঃ ১২৮]। ফক্বীহ সাহাবাগণ এসব আয়াতে মানুষের ওপর আল্লাহর ক্ষমা ও হেদায়েতের শুভলক্ষণ খুঁজে পেতেন। আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে ক্ষমার কথা আযাবের আগে বলেছেন। এই ফক্বীহ সাহাবাগণের মতে হয়তো প্রশ্ন জাগত: তাদের যে অবস্থা তাতে কিভাবে এই ক্ষমা ও হেদায়েত আসবে? কিন্তু মহাজগত পরিচালনার পেছনে আল্লাহর যে কৌশল কার্যকর তা মানুষের দৃষ্টি ও মূল্যায়নের আওতার অনেক উর্ধ্বে। "আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" [সূরা ইউসুফঃ ১০০]।

৪) তাঁরই সামনে তাঁর সাহাবীদের হত্যা ও তাঁদের মৃতদেহকে বিকৃত করা এবং তাঁর নিজের প্রাপ্ত আঘাতের ফলে মুখমন্ডল বেয়ে রক্ত পড়া, এরপর মুশরিকদের হর্ষোল্লাস ও প্রতিশোধস্পৃহা পূরণের কথা শোনা – এসব কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) যে মানসিক ও শারীরিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন, এরপরেও তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের জন্য আল্লাহর রহমত ও তাদের ওপর যেন গযব না আসে সেই জন্য দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমার জাতিকে মাফ করে দিন, কারণ তারা জানে না।" সেই অবস্থায় করা এই দোয়ার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে, আল্লাহর এই বাণীর অর্থ বোঝা যায়ঃ "নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত" [সূরা ক্বালামঃ ৪]। নবীজি (সা) তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন নি। তিনি তাদের জয় কেবল ক্ষমাপ্রার্থনা করে ক্ষান্ত থাকেন নি,

তাদের জন্য দোয়াও করেছেন। তাদের জন্য স্রেফ দোয়াই করেন নি, তাদের অজ্ঞতাকে তাদের জন্য অযুহাত হিসেবে পেশ করেছেন। এটা যদি অযুহাত নাও হয়, তবে এটা মহত্ব ও বদান্যতার চূড়ান্ত উদাহারণ যেটার কোন তুলনা হয় না।

৫) যদিও নবীজি (সা) তাঁর প্রতিপালকের নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ছিলেন এবং নিজ জাতির প্রতি তিনি সবচেয়ে সম্মানজনক ও মহান দায়িত্ব দিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর ওপর এই প্রচন্ড আঘাত আসল তিনি এই আত্মজিজ্ঞাসার বেশি আর কিছু বলেননিঃ “সেই জাতি কিভাবে সফল হবে যারা তাদের নবীর মুখমন্ডলকে আঘাত করে?” তিনি তাদের চূড়ান্ত খারাপ পরিণতির জন্য কিংবা তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন নি।

আর এটা ছিল নিরহঙ্কারিতা ও আত্মকেন্দ্রিক না হওয়ার ওপর এক মহান নববী শিক্ষা। অনেকেই যারা আত্মকেন্দ্রিকতা ও নিজেদের কাজের মুগ্ধতায় ডুবে যায় তাদের এই শিক্ষা অনেক বেশি প্রয়োজন। তারা নিজেদের সম্মানার্হ হিসেবে দেখে এবং ভাবে আল্লাহর কাছে তাদের এমন মর্যাদা আছে যে, কেউ তাদের ক্ষতি করলে আল্লাহ তাদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নিবেন। কেউ যদি তাদের সাথে বেয়াদবি করে, তাহলে সেটাকে অগ্রাহ্য না করে এর জন্য পাকড়াও করা হবে।

৬) এখানে আমাদের জন্য আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে, আমরা যেন কারো ব্যাপারে দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিরাশ না হই এবং তাদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধনের আশা ছেড়ে না দেই। কেউ যদি উপরোল্লিখিত তিনজন অধিনায়কের অবস্থার দিকে তাকায় সে যত আশাবাদীই হোক না কেন, তার পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব ছিল না যে, তাদের শেষ অবস্থা এমন হবে। আর সেজন্যই মানুষকে তার বর্তমানে সীমাবদ্ধ করে ফেলা উচিত নয়। “হয়তো আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়” [সূরা মুমতাহিনাঃ ৭]। এর ফলে মানুষের সামনে আশাবাদের দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং কোমলতা ও সুস্থিরতা দ্বারা সে দিগন্ত প্রসারিত হয়।

১২। মা'উনা থেকে মু'তা

বর্শা খেলোয়াড় হিসেবে সুপরিচিত বনু আমীর প্রধান আবু বারা আমীর বিন মালিক মদীনায় এল। নবীজি (সা) তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে নি, ইসলাম থেকে দূরেও সরে যায় নি। সে বললঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি নজদবাসীদের উদ্দেশ্যে আপনার কয়েকজন সাহাবী পাঠাতেন, তাহলে তারা আপনার দাওয়াতে সাড়া দিত।" রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দিলেনঃ "নজদবাসীরা তাদের ক্ষতি করবে, এ ব্যাপারে আমি শঙ্কিত।" আবু বারা বললঃ "আমি আমি তাদের আশ্রয় দেব।"

নবীজি (সা) তাঁর ৭০ জন বাছাইকৃত সাহাবীকে পাঠালেন, যাঁদেরকে 'কুররা' (কোরআন পাঠকারী) ডাকা হত। তাঁরা দিনে লাকড়ি সংগ্রহ করে তা বিক্রয় করতেন এবং বিক্রয়মূল্য দিয়ে আহলে সুফফার জন্য খাদ্য ক্রয় করতেন। রাতের বেলা তাঁরা কোরআন শিক্ষা করতেন। এরপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে সালাতে দাঁড়াতেন। নবীজি (সা) মুনযির বিন আমরু সা'ইদীকে (রা) তাঁদের আমীর হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এ দলে ছিলেন উরওয়া বিন আসমা, হারাম বিন মিলহান, আমীর বিন ফুহাইরা (রা)।

এই কাফেলা বনু আমীরের বাসস্থান নজদের দিকে চলতে থাকল। পথিমধ্যে তাঁরা 'বি'রে মা'উনা' নামক জায়গা অতিক্রম করলেন। এ জায়গা ছিল বনু আমীর ও বনু সুলাইমের। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আমীর বিন মালিকের ভাতিজা আমীর বিন তুফাইলকে রাসূলুল্লাহর (সা) দ্বীনের দাওয়াত দেয়া। সে তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং তাঁদের বিরুদ্ধে নিজের গোত্রের সাহায্য চাইল। কিন্তু তারা তাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললঃ "আবু বারার দেয়া অঙ্গীকার ভাঙ্গা হবে না।" এরপর সে তার প্রতিবেশী গোত্র বনু সুলাইমের সাহায্য চাইল। তারা তার সাহায্যে সাড়া দিল। তারা এসব সাহাবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করল এবং তাঁদের সবাইকে হত্যা করে ফেলল। তাঁরা তো রাসূলের (সা) প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র, কোন যুদ্ধবাহিনী ছিলেন না।

আল্লাহ সেই রাতেই জিবরাইলের (আ) মাধ্যমে তাঁর নবীকে এই সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এই সাহাবীদের জন্য শোকে কাতর হলেন। আনাস (রা) বলেনঃ "বি'রে মা'উনায় শহীদ সাহাবীদের জন্য

রাসূলুল্লাহ (সা) যেরকম ব্যথিত হয়েছিলেন, আর কারো জন্য তিনি কখনো এতটা ব্যথিত হন নি। তিনি একমাস ধরে ফযরের নামাযে রুকুর পর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতেন। অবশেষে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁর নিকট সেই শহীদ সাহাবীগণ কি অবস্থায় আছে তা বর্ণনা করেনঃ "আমাদের লোকেরা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, (তাঁরা বলল) আমরা আমাদের রবের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং আমরা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি।"

সাহাবাগণও তাঁদের মধ্যকার এহেন বাছাইকৃত লোকদের ওপর আঘাত আসার ফলে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যুবায়ের বিন আওয়াম (রা) বি'রে মা'উনার দুই শহীদ মুনযির বিন আমরু ও উরওয়া বিন আসমার নামানুসারে তাঁর নিজের দুই ছেলের নাম রাখেন মুনযির ও উরওয়া।

এরপর চারবছর পেরিয়ে গেল। মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটল। নবী (সা) হুদাইবিয়ার সন্ধি করলেন। মানুষ যুদ্ধ থেকে নিরাপদ হল এবং ইসলামের প্রচার-প্রসার হতে লাগল। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। হিজরী ৮ম বছরে রাসূলুল্লাহ (সা) হারিছ বিন উমাইর আল-আযাদীকে (রা) চিঠিসহ বুসরার গভর্নরের কাছে। বুসরার গভর্নর তাঁকে রোমের কাইসারের আগে বালক্বা অঞ্চলের গভর্নরের কাছে পেশ করল। বালক্বার গভর্নর কাইসারের পক্ষ থেকে তাঁকে গ্রহণ করে। হারিছ চিঠি হস্তান্তর করেন। গভর্নর চিঠি পড়ে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে শিরোশ্ছেদ করে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যখন এই খবর পৌঁছায় তখন তিনি তিনহাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তাদের শামে প্রেরণ করেন। সেখানে মুসলিম বাহিনী ও রোমান বাহিনীর মধ্যে ভয়ানক লড়াই হয়। রোমান বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। রোমান বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত হয়, তবে নিহতের সংখ্যার ব্যাপারে কিছু জানা যায় না। তবে ঐ মুসলিম বাহিনীর চতুর্থ সর্বাধিনায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) বলেনঃ "আমার হাতে মু'তার দিন ৯টা তলোয়ার ভেঙ্গেছে। শেষে একটি ইয়েমেনী তলোয়ার আমার হাতে রয়ে যায়।" তাহলে এসব তলোয়ার ভাঙ্গার আগে কত রোমান সৈন্যকে খতম করেছে? আর বাকি মুসলিমদের তলোয়ারে কত রোমান সৈন্য নিহয় হয়েছে?! মুসলিমদের নিহত সংখ্যা ১২-র বেশি ছিল না। এরপর খালিদ অসাধারণ সামরিক দক্ষতার সাথে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এটিকে বিজয় হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেনঃ "এরপর বাহিনীর পতাকা আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্যে একটি তলোয়ার তুলে নিল। অবশেষে আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দিলেন।"[32]

***আমাদের উচিত এখন নিজেদের অন্তঃদৃষ্টি প্রসারিত করে উপরোল্লিখিত দুটি ঘটনা থেকে চিন্তাভাবনার উপাদানগুলো জড়ো করি, যাতে দুটো ঘটনাতে নিহিত যে পরিপূর্ণ ও মহান অর্থ বিদ্যমান তা আমরা আহরণ করতে পারি।

*যখন নবীজিকে (সা) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নজদে পাঠাতে অনুরোধ করা হল, তিনি প্রথমেই তাঁদের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেনঃ "আমার ভয় হয়, নজদবাসী তাঁদের ক্ষতি করে বসবে।" বনু আমীরের সরদার তাঁদের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও আশ্রয়ের নিশ্চয়তা দেয়ার পরই তিনি তাঁদের প্রেরণ করেন।

আমরা দেখেছি, বি'রে মা'উনায় নিহতের সংখ্যা বড় ছিল, উহুদ যুদ্ধের শহীদের সমসংখ্যক ছিল। তাঁদের প্রত্যেকের ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি, কোন লড়াকু বাহিনী ছিলেন না।

*রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের শোকে কাতর হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর বাছাইকৃত সাহাবী এবং কোরআন পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত। নবীজির (সা) সাহাবীরাও তাঁদের হারানোয় ব্যথিত হন।

*এরপরও নবীজি (সা) আল্লাহর সাহায্য ও দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেন নি। তিনি এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবং সীমালংঘনকারী ও বিশ্বাসঘাতক গোত্রগুলোকে শাস্তি দেয়ার জন্য কোন বাহিনী পাঠান নি। তাদের বাসস্থানও মদীনা থেকে দু কিলোমিটারের বেশি ছিল না। অথচ মাত্র ৪ বছর পরই তিনি ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠান তাঁর মাত্র একজন প্রতিনিধি হত্যাকারীদের উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য, তাও আবার যাদের অবস্থান মদীনা থেকে প্রায় ১০০০ কিলোমিটারের মত।

নবীজি (সা) প্রথম ক্ষেত্রে কেন সৈন্য পাঠান নি, যদিও এক্ষেত্রে হারানোর তিক্ততা ও নিহতের সংখ্যা বেশি ছিল, ছিল বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৃশংস সীমালংঘন?

গভীর অন্তঃদৃষ্টির অধিকারীদের জন্য জবাবটি স্পষ্ট। নবীজি (সা) মুসলিমদের দুর্বলতা ও স্বল্পতার সময় বাহিনী পাঠিয়ে মুসলিমদের মুসীবত ও ক্ষতির পরিমাণ বাড়াতে চান নি। বি'রে মা'উনায় নিহতের সংখ্যা উহুদে নিহতের সংখ্যার প্রায় সমান ছিল। নবীজি (সা) আরব মরুভূমিতে ওৎ পেতে থাকা বিভিন্ন শত্রুভাবাপন্ন গোত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর বাহিনীকে ছেড়ে দেন নি যখন মদীনায় তাঁর রাষ্ট্রের শক্তির ভিত্তি তখনো বিকাশমান পর্যায়ে।

*সেসময় অপরিপক্ক অবস্থায় সংঘর্ষে জড়ালে বিকাশমান ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর এর বিধ্বংসী প্রভাব পড়ত। এ থেকে স্পষ্ট হয়, কিভাবে এ হত্যাকান্ডের ফলে প্রজ্জ্বলিত অনুভতি ও উত্তেজিত আবেগ সবরে জামীল অবলম্বন করেছে এবং এই আবেগ অনুভূতিকে অন্তঃদৃষ্টি ও পরিণতির যৌক্তিক বিচারের দিকে ধাবিত করেছে। যিনি বলেছেনঃ "আমার ভয় হয়, নজদবাসী তাঁদের ক্ষতি করে বসবে", সেই তাঁর ওপরই নাযিল হয়ঃ "তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো" [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৭৫], "মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো" [সূরা মায়িদাঃ ৪৪], "কতবার ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে" [সূরা বাক্বারাঃ ২৪৯]। সেই তিনিই কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তেও বলে উঠেছেনঃ "তোমরা হতাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আমাদের আমাদের সাথে রয়েছেন" [সূরা তাওবাঃ ৪০]। তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে সবচেয়ে জ্ঞাত, তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন, তাঁর ওপর রয়েছে তাঁর সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল। কিন্তু উপরোল্লিখিত ঘটনায় আমরা উম্মাহর বিষয়াদি ব্যবস্থাপনা এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনার ওপর নববী প্রশিক্ষণ দেখতে পাই। সতর্কতা থেকে যে আশঙ্কা আর কাপুরুষতা ও দুর্বলতা উদ্ভূত যে ভয় তার মধ্যে অনেক ফারাক বিদ্যমান।

*হিজরী ৮ম সালে হুদাইবিয়ার চুক্তির ফলে মুসলিমরা আরব গোত্রগুলোর হুমকি থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। এছাড়াও খাইবারে ইয়াহুদীদের চক্রান্ত রুখে দেয় মুসলিমরা। এছাড়াও ইসলাম ছড়াচ্ছিল। মুসলিমদের সংখ্যাও বাড়ছিল। মুসলিমরা তখন সংঘর্ষে জড়ানোর মত শক্তিশালী অবস্থায় ছিল। তাই রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি বহন করতে গিয়ে একজন যখন দূরদেশে নিহত হন, তিনি এ ব্যাপারে কৃপণোতা ও কাপুরুষতা দেখান নি। তিনি শামে ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা সেখানে এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যেটা ছিল পরবর্তীতে ইসলামী বাহিনী কর্তৃক রোমান অঞ্চল বিজয়ের ভূমিকাস্বরূপ।

*এখানে আমাদের জন্য নববী শিক্ষা হল, জিহাদ কোন আবেগী প্রতিক্রিয়া নয়, না তো অপরিকল্পিত কোন অভিযান। বরং তা ইসলামের এমন এক শি'আর যেটাতে পরিস্থিতির পূর্ণ মূল্যায়ন করা হয়, এর শর্তসমূহ পূরণ করা হয় এবং এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত করা হয়।

১৩। আনসারীদের আতিথেয়তা

লোকটি বিধ্বস্ত অবস্থায় এসেছে। তার চেহারায় ক্ষুধাজনিত দুর্বলতা ও ক্লান্তির ছাপ। সে মুমিনদের পিতৃতুল্য রাব্বুল আলামীন প্রেরিত রাসূলের (সা) সামনে গেল। আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা) সম্পর্কে বলেনঃ "এই নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক অন্তরঙ্গ" [সূরা আহযাবঃ ৬]। তিনি মুমিনদের জন্য পিতৃস্বরূপ। সে বিধ্বস্ত ব্যক্তি যখন রাসূলের (সা) কাছে পৌঁছাল, তখন তাঁকে নিজের মুখে তার অবস্থার কথা জানাল এবং বললঃ "আমি বিধ্বস্ত।"

রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সাথে সাথে তাঁর এক স্ত্রীর কাছে খবর পাঠালেন এটা জিজ্ঞাসা করতে যে, এই বিধ্বস্ত অতিথিকে খাওয়ানোর মত তাঁর কাছে কিছু আছে কিনা? জবাবে তাঁর স্ত্রী বললেনঃ "যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন সেই সত্ত্বার শপথ, আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।" এরপর তিনি তাঁর আরেক স্ত্রীর কাছে একই খবর পাঠালেন। তাঁর থেকেও একই জবাব এল। নবীজি (সা) একে একে সব স্ত্রীর কাছে খবর পাঠালেন। তাঁদের সবার একটা জবাবই ছিলঃ "যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন সেই সত্ত্বার শপথ, আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।"

এরপর নবীজি (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেনঃ "কে আজ রাতে এই ব্যক্তির মেহমানদারী করবে? আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত করবে।" আবু তালহা আনসারী (সা) বললেনঃ "আমি করব, হে রাসূলুল্লাহ।" এরপর তিনি তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ "রাসূলুল্লাহর অতিথিকে সম্মানিত কর। তাঁর থেকে কিছু মজুদ করে রেখো না।" তাঁর স্ত্রী বললেনঃ "আল্লাহর শপথ! আমার কাছে আমাদের দু বাচ্চার রাতের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই।" আবু তালহা বললেনঃ "আমাদের বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদের খাবারের আশা দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। এরপর তোমার খাদ্য প্রস্তুত করো এবং বাতি জ্বালিয়ে দিও। এরপর যখন আমাদের অতিথি আসবে তখন তোমার কাছে যা খাবার আছে তার সামনে পেশ করো। এরপর অতিথি যখন খেতে চাইবে তিনি খেয়ে নিবেন। এরপর বাতি নিভিয়ে দিও।" আবু তালহার স্ত্রী বাচ্চাদের ঘুম পাড়ালেন, এরপর খাদ্য প্রস্তুত করলেন ও বাতি জ্বালালেন। অতিথি যখন এল, তখন তাঁদের কাছে অল্প যা খাবার ছিল তাই তার

সামনে পেশ করলেন। এরপর আবু তালহার স্ত্রী বাতি ঠিক করার ভান ধরে বাতির কাছে গেলেন এবং তা নিভিয়ে ফেললেন। এরপর আবু তালহা ও তাঁর স্ত্রী দুজনই তাঁদের অতিথির সাথে বসলেন এবং মুখে খাবার খাওয়ার আওয়াজ করতে লাগলেন। অতিথি ভাবল, তাঁরা দুজনও হয়তো খাবার খাচ্ছে। অতিথি দীর্ঘ ক্ষুধার পর সব খাবার কিভাবে সাবাড় করে ফেলল টেরই পেল না। অন্যদিকে আবু তালহা, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা দীর্ঘ রাত না খেয়ে কাটিয়ে দিলেন।

এরপর যখন ভোর হল, আবু তালহা স্বভাববশতঃ নবীজির (সা) সাথে ফযরের সালাত আদায় করার জন্য ছুটলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে গতকালকে বলা আল্লাহর রহমতের সুসংবাদ তো দিলেনই, সাথে আরেকটি সুসংবাদও দিলেন। তিনি বললেনঃ "আল্লাহ গত রাতে তোমাদের কাজ দেখে হেসেছেন অর্থাৎ বিস্মিত হয়েছেন।"

আর বিস্ময়ের চিহ্ন হিসেবে আল্লাহ এক আয়াত নাযিল করলেন যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবেঃ "তারা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়, যদিও বা তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে" [সূরা হাশরঃ ৯]।[33]

***এ ঘটনায় কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয়াদিঃ

১) রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন মুমিনদের আশ্রয়। তারা তাদের প্রয়োজন ও বিপদের সময় তাঁর কাছে ছুটে যেত। উপরোল্লিখিত এই বিধ্বস্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছেই ছুটে গিয়েছিল এবং সে তার আর্জি পেশ করতেও লম্বা সময় নেয় নি, কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও যায় নি। সে সরাসরি তার প্রয়োজন পেশ করেছেঃ "হে রাসূলুল্লাহ। আমি বিধ্বস্ত", যাতে সে দ্রুত ও পূর্ণ গুরুত্বের সাথে তার প্রয়োজনে সাড়া পায় এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে পৃথক হয় নি।

এটাই ছিল নববী অভিভাবকত্ব, যার ভিত্তি রাজত্ব, বড়ত্ব ও জাঁকজমকতা নয় বরং ছিল অধীনস্থদের দেখাশোনা, যত্ন নেয়া এবং গুরুত্বপ্রদান। এই অভিভাবকত্ব রাসূল (সা) নিজের ঘোষণা করেছিলেন এভাবেঃ "আমি প্রত্যেক মুমিনের প্রতি তার নিজের চাইতেও বেশি আন্তরিক। তাদের কেউ ধনসম্পদ রেখে মারা গেলে সেটা তার পরিবারের, আর কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্তায় মারা গেলে সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্বও আমার।"[34]

২) এখানে দেখা যায়, নবী (সা) প্রথমে নিজে এই পরিশ্রান্ত লোকের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেন। প্রথমে তিনি তাঁর এক স্ত্রীর নিকট খবর পাঠান এই অতিথির খাবার চেয়ে। যখন তাঁর কাছে কিছু পান নি, তখন আরেক স্ত্রীর কাছে খবর পাঠান। একে একে তিনি সব স্ত্রীর কাছে খবর পাঠান। তিনি তখনই সাহাবীদের এই অতিথির প্রয়োজন মেটাতে বললেন যখন তাঁর নিজে তাঁর সবটুকু প্রচেষ্টা চালালেন।

নবীজি (সা) এভাবেই প্রতিটি ব্যাপারে কথা বলার আগে কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। তিনি কোন ভালো কাজের আদেশ দেয়ার আগে নিজে সেটা চূড়ান্তভাবে আঞ্জাম দিতেন। আর সেজন্যই সাহাবাগণও নিঃস্বার্থতার অসাধারণ উদাহারণ পেশ করে এ ব্যাপারে নবীজির (সা) পূর্ণ অনুসরণ করেছেন। উপরোক্ত ঘটনাটিতে অতিথির সাথে আবু তালহার (রা) আচরণ মূলত নবীজির (সা) সুমহান দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ মাত্র। নিশ্চয়ই তাঁর রব এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন যখন তিনি নাযিল করেনঃ "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সবচেয়ে সুন্দর আদর্শ" [সূরা আহযাবঃ ২১]।

এই আয়াতের অর্থ আমাদের আমাদের অন্তরে সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে। প্রত্যেক দা'ঈ, প্রশিক্ষক, শিক্ষকদের একটি জিনিস সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আর তা হচ্ছে, দৃষ্টান্ত হওয়া, কোন নীতি প্রচার করার আগে নিজে করে দেখানো। পাশ্চাত্যের একটি জ্ঞান বচন এরকম যেঃ "আমাকে তোমার নিজের ব্যাপারে বলো না। তোমার কাজ যা বলে তাতে আমার কান বন্ধ থাকে।"

৩) আবু তালহা (রা) তাঁর কাছে অল্প যা কিছুই ছিল তাই দিয়ে তিনি তাঁর অতিথির প্রতি নিঃস্বার্থতা দেখান। অতিথিকে খাওয়ানোর জন্য তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছোট বাচ্চা না খেয়ে তাঁদের রাত কাটিয়ে দেন। এই অতিথিই আগের কিছু রাত না খেয়ে ছিল। এরপর অতিথির অনুভূতির কথা চিন্তা করে আবু তালহা যা করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। অতিথি যদি জানত তার মেজবান ক্ষুধার্ত থেকে তাকে খাওয়ানোর চিন্তা করছে তাহলে সে হয়তো কোন খাবারই মুখে নিত না। আবু তালহা বাতি নিভিয়ে দিলেন এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী শব্দ করে খাবার চাবানো ও খাওয়ার ভান করলেন। অতিথি এই অল্প খাবার পেয়ে খুশি হলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে খেয়ে নিলেন। এ এক আজব দৃশ্য আর এর চেয়ে আজব কি আর কিছু আছে যেটা আমাদের মহিমান্বিত রব নিজেই আশ্চর্যান্বিত হন এবং ফলস্বরূপ ওহী নাযিল করেন? যখন কাউকে বিস্ময় জেঁকে বসে, তখন তার স্মরণ করা উচিত, এটা হচ্ছে নববী মাদ্রাসা ও মুহাম্মাদী তরবিয়তেরই পরিশেষ।

৪) এ ঘটনায় এমন একটি পরিবারের দেখা মেলে যা পরিস্থিতির সামাল দেয়, নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণতা ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করে। স্ত্রী এখানে নিজের মাতৃত্বের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, যাতে বাচ্চাদের খাবার অতিথিকে দিতে পারেন এবং নিজেও না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর তিনি তাঁর স্বামীর সাথে দায়িত্ব অদলবদল করে নেন অতিথির সামনে ভদ্রতা রক্ষার জন্য এবং অল্প খাবার দেখে অতিথি যাতে তাঁরা অভুক্ত আছে বলে মনে না করেন। তাঁর ব্যাপার ছিল এই যে, আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহর (সা) অতিথিকে সম্মান করার জন্য তিনি তাঁর স্বামীর সাহায্যকারী হন।

সম্প্রীতি ও সংহতি সহকারে এ ধরনের সৎকর্ম সম্পাদনায় স্বামী-স্ত্রীর অংশগ্রহণ কখনোই সম্ভব হয় না যদি স্ত্রী এখানে সন্তুষ্টিচিত্তে অংশ না নেয় এবং দ্বীনের জন্য কষ্টসহ্য না করে। এজন্যই আবু তালহা দম্পতির আতিথেয়তায় সাড়া দেয়াটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং তা কার্যকর করতে গিয়ে কোন বিরোধের আগুন জ্বলে উঠেনি, যদিও আনসারী নারীগণ স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব ও দাম্পত্য জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

আর এটাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমাজের পরিপূর্ণ তরবিয়ত, নারীদের সন্তুষ্টিচিত্তে নিজেদের দায়িত্ব বহন এবং পুরুষদের সাথে যৌথভাবে রিসালাতের শিক্ষার সাথে মিথষ্ক্রিয়া করার জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তার দিকে।

৫) এ ঘটনায় নবীজির (সা) মোজেযা ফুটে উঠেছে। নবীজি (সা) আবু তালহাকে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর মেহমানদারিতায় আল্লাহর বিস্ময়ের ব্যাপারে অবহিত করেন, অথচ এই মেহমানদারিতা হয়েছিল রাতের অন্ধকারে। এ ব্যাপারে তো সেই অতিথিও পুরোপুরি জানত না। এটা ছিল সাহাবাদের জীবনে নবুওয়াতের নিদর্শনঃ “আর যারা বিশ্বাস করেছে তাদের ঈমান যেন বর্ধিত হয়, আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে ও যারা বিশ্বাসী তারা যেন সন্দেহ না করে” [সূরা মুদ্দাসসিরঃ ৩১]।

৬) এ ঘটনা থেকে নবীজির (সা) পরিবারসমূহের স্বল্পেতুষ্টি ও স্বল্প জীবিকায় জীবন পার করে দেয়ার ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। যখন তাঁর স্ত্রীদের নিকট অতিথির জন্য খাদ্য চেয়ে খবর পাঠানো হল, তাঁদের কাছে পানি ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। এ থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিজের

জীবন ও অর্থসম্পদ উৎসর্গ করার ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগামী। তিনি তাঁর ঘরগুলোকে বিলাসী দ্রব্যাদির ভান্ডার বানান নি, আর না তিনি উদ্বৃত্ত সম্পদ ও দুনিয়াবী সম্পদের প্রাচুর্য গড়েছেন। মাসের পর মাস চলে যেত, কিন্তু তাঁর ঘরগুলোতে রান্নার আগুন জ্বলত না। তিনি ছিলেন সর্বাধিক সম্মানিত মানুষ ও মরুভূমিতে বৃষ্টির মেঘ বহন নিয়ে আসা বাতাসের চাইতেও অধিক দানশীল। সাহাবীরা তাঁকে দেখতেন শত শত উট এবং অর্থসম্পদ বন্টন করতে, কিন্তু একদিনও তাঁকে তাঁদের না দিয়ে একাকী সম্পদ বা দুনিয়াবী প্রাচুর্য কুক্ষিগত করতে কিংবা নিজেকে ও নিজের নিকটাত্মীয়দের অগ্রাধিকার দিতে দেখেন নি।

৭) রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁর পরিবারসমূহের কাছে এই পরিশ্রান্ত অতিথিকে খাওয়ানোর জন্য কিছু আছে কিনা তা জানতে খবর পাঠিয়ে একটি খেঁজুরও পেলেন না, তা এই ক্ষুধার্ত পরিশ্রান্ত লোকের জন্য একটা বিশাল স্বান্তনা ছিল। সে যখন রাসূলুল্লাহরই (সা) এই অবস্থা দেখল সে নিজের অবস্থার ওপর খুশি ও সন্তুষ্টচিত্ত হল এবং দুশ্চিন্তা বাদ দিল। এটাই ছিল নবীজির (সা) অগ্রগামীতা ও দৃষ্টান্ত। এটাই ছিল তাঁর অবস্থা। তাঁর ও তাঁর পরিবারের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

১৪ । হে মু'আয

বাইয়াতে আক্বাবার দিন তাঁর হাতের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতের স্পর্শ লেগেছিল। তিনি ছিলেন তখন দাড়িবিহীন তরুণ। এরপর তিনি ঈমানদীপ্ত অন্তর ও জ্যোতির্ময় আকল নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য নেন। তিনি বুদ্ধিমত্তা ও পবিত্রতা, বদান্যতা ও মহত্ব, বিশুদ্ধতা ও সম্মানের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর, উত্তম চরিত্রবান, অত্যন্ত সংযত এবং ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী।

তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) সঙ্গ দেন, কোরআন হেফজ করেন এবং ফিক্বহে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি উম্মতের মধ্যে হালাল ও হারামের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ভালোবাসা ও যত্ন পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর নৈকট্য ও বিশেষ সম্পর্ক ফুটে ওঠে এমন এক ঘটনায় দেখা যায়, তিনি একবার রাসূলুল্লাহর (সা) পিছে এক গাধার ওপর সমাসীন ছিলেন, যেটার নাম ছিল উফায়ের। এর লাগামটি খেঁজুর গাছের আঁটির তৈরী। তাঁর ও রাসূলুল্লাহর (সা) মাঝখানে সওয়ারের গদির শেষ অংশ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এমনভাবে ডাক দিলেন যেন তিনি অনেক দূরে, অথচ তিনি ছিলেন তাঁর কাছেই। রাসূল (সা) ডাকলেনঃ "হে মু'আয বিন জাবাল!" মু'আয জবাব দিলেনঃ "আমি আপনার নিকটে ও আপনার খেদমতে হাজির, ইয়া রাসূলুল্লাহ!" রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার ডাক দিলেনঃ "হে মু'আয বিন জাবাল!" মু'আযও জবাব দিলেনঃ "আমি আপনার নিকটে ও আপনার খেদমতে হাজির, ইয়া রাসূলুল্লাহ!" এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবারও চুপ হয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর আবার ডাক দিলেনঃ "হে মু'আয বিন জাবাল!" মু'আয আবারও জবাব দিলেনঃ "আমি আপনার নিকটে ও আপনার খেদমতে হাজির, ইয়া রাসূলুল্লাহ!" এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "তুমি কি জান, বান্দার ওপর আল্লাহর হক কি?" মু'আয জবাব দিলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভালো জানেন।" নবীজি (সা) বললেনঃ "বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে সে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনকিছুক শরীক করবে না।" এরপর আরো কিছুসময় পথ চলার পর নবীজি (সা) বললেনঃ "হে মু'আয বিন জাবাল!" মু'আয জবাব

দিলেনঃ “আমি আপনার নিকটে ও আপনার খেদমতে হাজির, ইয়া রাসূলুল্লাহ!” নবীজি (সা) তাঁকে বললেনঃ “তুমি কি জান, বান্দা যদি এমনটা করে তাহলে আল্লাহর উপর তার হক কি?” মু’আয জবাব দিলেনঃ “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভালো জানেন।” নবীজি (সা) বললেনঃ “বান্দা যদি এমনটা করে তবে আল্লাহর উপর তার হক হল, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না, তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে অন্তর থেকে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল – এ কথা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।” মু’আয বললেনঃ “আমি কি অন্যদের এই সুসংবাদটি পৌঁছে দেবো না, হে রাসূলুল্লাহ?” নবীজি (সা) বললেনঃ “না! আমার আশঙ্কা হয়, তারা কেবল এটার ওপর ভরসা করে বসে থাকবে।”

মু’আয রাসূল (সা) প্রদত্ত এই সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হলেন এবং রাসূলের (সা) কথা অনুযায়ী কাজ করলেন। তিনি এ সুসংবাদে খুশি হলেন, কিন্তু কাউকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন না। রাসূলুল্লাহও (সা) তাঁর রফীকে আ’লার নিকট চলে গেলেন। মু’আযও পরবর্তীতে শামে চলে যান। তিনি রিবাত ও জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত কামনা করেন, কিন্তু তাঁর শাহাদাত এলো মৃত্যুশয্যায়। তিনি মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হলেন। তিনি বলতেনঃ “আমার শরীরে যে লাল লাল দানা উঠেছে এতে আমি কতই না খুশি!” তাঁর রোগ আরো বৃদ্ধি পেল। তিনি জানতেন, এটা মৃত্যুর লক্ষণ এবং জীবনের সন্ধিক্ষণ। তিনি বললেনঃ “আমার থেকে চাদর সরিয়ে দাও। আমি তোমাদের একটি হাদীস শোনাবো যা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আমি শুনেছি। আমি এতদিন তোমাদের এই ভয়ে হাদীসটি বলি নি, কারণ আমার আশঙ্কা ছিল তোমরা কেবল এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে।” এরপর তিনি তাদের সেই সুসংবাদটি শোনালেন, যেটা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেছিলেন, যখন তিনি গাধার পিঠে নবীজির (সা) পিছে বসা ছিলেন। এ কথা তাঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ শোনেনি। মু’আয এটা অপছন্দ করেছিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছেন এমন জ্ঞান গোপন করবেন। তিনি জ্ঞান গোপন করার জন্য গুনাহর ভয় করতেন। এজন্যই মৃত্যুশয্যায় তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। যারা মু’আয থেকে এই হাদীস শুনেছে তারা ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ জন এবং তাঁরা মু’আযের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন।[35]

***এ ঘটনায় কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলঃ

১) এ ঘটনা থেকে শিক্ষাদান, চিন্তাকে উদ্দীপ্তকরণ, ছাত্রকে শিক্ষাদানে সম্পৃক্তকরণ এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে তাকে উৎসাহ দেয়াতে নবীজির (সা) দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) এমন একটা সময়ে মু'আযকে (রা) এই তথ্য পৌঁছে দেন যখন তিনি আবেগ ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে নবীজির (সা) নিকটে ছিলেন। দৈহিক উপস্থিতির দিক দিয়ে নৈকট্য, বিশেষ করে একই গাধার পিঠে নবীজির (সা) পিছে বসার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। এটাই তো রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার সময়। আবার রাসূলুল্লাহ (সা) যে মু'আযকে (রা) তাঁর ও তাঁর পিতার নাম ধরে সম্বোধন করলে এটাও বিস্ময়কর, যেন তিনি তাঁকে অনেক দূর জায়গা থেকে ডাকছিলেন, যদিও মু'আয ছিলেন তাঁর সবচেয়ে নিকটে। এরপর যখন মু'আয (রা) জবাব দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নীরবতা দিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। এক আল্লাহই ভালো জানেন, রাসূলুল্লাহ মু'আযকে উদ্দেশ্য করে তিনবার ডাক দেয়ার মাঝে যে নীরবতা অবলম্বন করেন সেসময় মু'আযের মাথায় কতশত চিন্তাই না এসেছে। মূলত রাসূল (সা) এই ডাক দিয়েছিলেন মু'আযের (রা) চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য। আর যে নীরব অপেক্ষা সেটাও ছিল চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করার জন্যই। যখন চিন্তা রাসূলুল্লাহ (সা) শীঘ্রই যা বলবেন তা গ্রহণ করার জন্য সর্বোচ্চ তৎপর অবস্থায় উপনীত হল, তখনই রাসূলের (সা) তরফ থেকে তথ্য এলো প্রশ্নাকারেঃ "তুমি কি জান, বান্দার ওপর আল্লাহর হক কি ?" মু'আযও আগ্রহী ছাত্রের মত জবাব দিলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন।" এরপর যখন রাসূলের (সা) জবাব এল, মু'আয জাগ্রত, উদ্দীপ্ত ও আকাঙ্খিত মন নিয়ে তা গ্রহণ করলেন।

বাহনে পিছে বসানো, ডাকা, এরপর চুপ থাকা, এরপর প্রশ্ন করা – এসবই চিন্তাকে তীক্ষ্ণ এবং হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে। আর এজন্যই অবাক করা ব্যাপার নয় যে, মু'আয (রা) এই হাদীসটি লুফে নিয়েছেন, পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে শুনেছেন এবং স্মরণ রেখেছেন। অনেকটা যেন, মু'আয তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং রাসূলের (সা) ডাক তখনো তাঁর দু কানে বাজছে। এতে কি অবাক হওয়ার কিছু আছে যে, রোগবেদনা কিংবা মৃত্যুচিন্তা তাঁকে এ হাদীস ভোলাতে পারে নি এবং তিনি এ ঘটনা মনে রেখে এর খুঁটিনাটি এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যেন তাঁর সাথে কথা বলা হচ্ছে আর সেটা তিনি বর্ণনা করছেন ? মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের ওপর আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

২) মু'আয তখন ছিলেন অল্প বয়স্ক, তাঁর বয়স বিশের বেশি হবে না। এরপরও রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বেছে নিলেন এমন একটি কথা বলার জন্য যা কেবল তিনিই জানবেন। নবীজি (সা) তাঁকে এটা আর কাউকে বলার

অনুমতি দেন নি এই আশঙ্কায় যে, অন্যরা মু'আযের মত এটা গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হবে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সেই জ্ঞানই দেয়া উচিত যা তার চেতনা, বুঝ এবং প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৩) নবী (সা) যে মু'আযকে এই বিশাল সুসংবাদটি দিলেন, সেই মু'আয ইবাদতে তাঁর কঠোর দৃঢ়তার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন সেখানে ডুবে যেতেন এবং ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত তাঁকে ইমাম অবস্থায় সালাত লম্বা করতে নিষেধ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ওফাতপ্রাপ্ত হন, মু'আয শামে চলে যান আল্লাহর পথে শাহাদাত প্রাপ্তির জন্য। উমার (রা) আবু বকরকে (রা) মু'আযকে আটকাতে বললেন কারণ তাঁকে মানুষের প্রয়োজন ছিল। আবু বকর (রা) বললেনঃ "যে শাহাদাত চায়, তাঁকে আমি আটকাবো না।" এরপর মৃত্যু নিকটবর্তী হলেন, মু'আয বলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন আমি এ দুনিয়ায় নদীনালায় ঘুরে বেড়ানো ও বাগান করার জন্য থাকা পছন্দ করি নি, বরং রোযায় পিপাসার্ত থাকার জন্য, রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য, জ্ঞানের আসরে আলেমদের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য আমি জীবন যাপন করেছি।" এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মু'আয (রা) এই হাদীস থেকে যা বুঝেছিলেন তা তাঁকে আরো বেশি বেশি ইবাদত, আল্লাহ ও তাঁর আনুগত্যের স্বাদ উপভোগ, রাতে দীর্ঘসময় নামাযে দাঁড়িয়ে আনন্দলাভ, ভালোকাজে প্রতিযোগিতা করায় উদ্দীপ্ত করেছিল। তিনি ছিলেন গভীর বুঝ, বুদ্ধিমত্তা, অন্তরের পবিত্রতা ও মর্যাদার জন্য পরিচিত। গভীর বুঝ ও বুদ্ধিমত্তার জন্যই তিনি নবীজির (সা) এই সুসংবাদকে ভুল বুঝে এর ওপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেয়া থেকে বেঁচে থাকেন। বরং এ সুসংবাদ তাঁর ভালোকাজের প্রচেষ্টার সচেতনতাকে বৃদ্ধি করে এবং সৎ আমল আরো বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।[363738]

৪) এ ঘটনায় নবীজির (সা) হাদীসের ব্যাপারে মু'আযের (রা) ফিক্বহ (গভীর জ্ঞান) পরিলক্ষিত হয়। যদিও নবীজি (সা) তাঁকে যে কথা বলেছেন তা অন্য কাউকে অবহিত করতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন এবং যখন তিনি এই কথা অন্যকে বলার অনুমতি প্রার্থনা করেন, রাসূল (সা) সে অনুমতি তাঁকে দেন নি, কিন্তু এরপরও আমরা দেখি মৃত্যুশয্যায় মু'আয আশঙ্কা করলেন, তিনি যদি এই হাদীস বলে না যান তাহলে গুনাহগার হবেন এবং হাদীসটি অন্যদের নিকট বর্ণনা করলেন। যদিও হাদীসটির বাহ্যিক শব্দগঠন থেকে অন্যকে এ হাদীসটি অবহিত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেখা যায়, কিন্তু মু'আযের (রা) অসাধারণ ফিক্বহের বহিঃপ্রকাশ এই যে, তিনি এই নিষেধাজ্ঞার সাথে সংযুক্ত কারণটির দিকে নজর দেন, আর সে কারণটি ছিলঃ মানুষ কেবল এর

ওপর ভরসা করে বসে থাকবে। তিনি এই হাদীসটি তাঁর ছাত্রদের নিকট বর্ণনা করে যান, যারা তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মু'আয বিন জাবালের (রা) ফিক্বহ অনুসরণ করতেন এবং তাঁর থেকে ইলম বর্ণনা করতেন। তিনি এজন্যই তাঁর ছাত্রদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেন, যাতে এই হাদীসটি আলেমদের মধ্যে প্রচলিত থাকে। তিনি এই হাদীস সব মানুষের সামনে বলে যান নি, আবার সবার কাছ থেকে লুকানও নি। তিনি বাছাইকৃত লোকদেরকে হাদীসটির ব্যাপারে অবগত করেন, যেমন কিনা নবীজি (সা) তাঁর বাছাইকৃত সাহাবীকে সুসংবাদটির ব্যাপারে অবগত করেন।

এটা খুবই অদ্ভুত হবে যে, বাহ্যিকতায় সীমাবদ্ধ যাদের বুঝ তারা যদি মনে করে, এই হাদীস বর্ণনা করলে গুনাহ হবে কারণ নবীজি (সা) এটা নিষেধ করে গিয়েছেন। কিন্তু মু'আযের (রা) ফিক্বহ ছিল এই যে, তিনি এই হাদীস লুকানোর ব্যাপারে গুনাহর ভয় করছিলেন। তিনি এই হাদীস বর্ণনার নিষেধাজ্ঞার পেছনের কারণ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন, এই নিষেধাজ্ঞা মানুষ এই হাদীসের ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে – এর সাথে সম্পৃক্ত। এ হাদীস তার কাছেই বর্ণনা করা হবে যে হাদীসের সুসংবাদ নেয়ার যোগ্য, কিন্তু তার কাছে বর্ণনা করা হবে না যে হাদীসের ওপর ভরসা করে বসে থাকবে।

৫) মু'আযের (রা) যখন শেষ অবস্থা তাঁর অবস্থা কি হৃদয়কে গ্রাস করার মত নয়? তিনি জীবনের রয়ে যাওয়া শেষ কিছু নিঃশ্বাস ছাড়ছেন ও মৃত্যুযন্ত্রণার সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন, তখনো তিনি নবী (সা) থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব ছাড়েন নি আর সে দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াত ও তালিমের দায়িত্ব। তিনি সুস্থ অবস্থায়ও ব্যাপক দাওয়াতী কাজ করেছেন আর মৃত্যুশয্যায়ও দাওয়াত ও তালিমের কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি যদি রোগযন্ত্রণায় দাওয়াত ও তালিমের কাজ থেকে নিজের জন্য নিস্তার চাইতেন, তবে তা তাঁর জন্য যথার্থ ওজর ছিল। মৃত্যুযন্ত্রণাই তো সবচেয়ে বড় ওজর।

৬) নবীজির (সা) গাধায় চড়ে বাজারে চলছেন, গাধার লাগাম খেজুরের আঁটি দিয়ে তৈরী এবং তাঁর বাহনে এক আনসারী যুবককে তিনি তাঁর পিছে স্থান দিয়েছেন। এটা হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব ও বিনম্রতার এক দৃষ্টান্ত। এ অবস্থা আর স্বৈরাচারী ও অহংকারী শাসকদের অবস্থার মধ্যে কতই না ফারাক!

এই হচ্ছেন নবীজি (সা), যিনি রাজাধিরাজ নবী হওয়ার বদলে বান্দা নবী হওয়াকে বেছে নিয়েছিলেন।

১৫। সুন্দর সুন্নাহ

দিন বাড়ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সাথে তাঁর মোবারক মজলিসে উপবিষ্ট। এমন সময় তাঁর নিকট বেদুইনদের একটি দল এসে উপস্থিত হল। তারা অনেক দূর থেকে বিশাল পথ অতিক্রম করে এসেছে, যাতে তারা সেই রাসূলের (সা) কাছে পৌঁছাতে পারে, যাঁর ওপর তারা ঈমান এনেছে ও তাঁকে অনুসরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারা নগ্ন পা ও উদোমগায়ে। তাদের কাছে পরার মত কোন কাপড় ছিল না। তারা একটা চাদরকে ছিঁড়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে গায়ে কোনভাবে জড়িয়ে নিয়েছিল। সেটা কয়েকটি ক্ষীনকায় দেহকে ঢাকতে সমর্থ হয়েছিল। সেই দেহগুলোকের যেন ক্লান্তি ও পরিশ্রান্তি আরো পীড়ন দিচ্ছিল। দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় সেগুলো যেন ক্ষয়ে যাচ্ছিল।

নবীজি (সা) এই উদোম ও পরিশ্রান্ত দেহগুলোর দিকে তাকালেন। তাদের প্রতি বেদনা, মায়া ও দয়ার ছাঁপ তাঁর দয়ার্দ্র চেহারায় ফুটে উঠল এবং তা সংকুচিত হল। তাদের দারিদ্র্য ও পরিশ্রান্তি দেখে তিনি দ্রুত তাঁর ঘরের দিকে ছুটলেন। যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করলেন তিনি সেহানে থাকলেন। এরপর বের হয়ে তিনি বিলালকে (রা) আযানের নির্দেশ দিলেন। এরপর লোকদের সাথে তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর তিনি মিম্বারে উঠে লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন। তিনি প্রথম আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করলেন, এরপর বললেনঃ “আম্মা বা’দ। আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেনঃ ‘হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্ঝা করে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন’ [সূরা নিসাঃ ১]। ‘হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্ঝা করে থাক এবং আত্নীয়

জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।' [সূরা হাশরঃ ১৮]। অতএব লোকদের উচিত তাদের দিনার ও দিরহাম থেকে দান করা উচিত। এক সা' গম ও এক সা' খেঁজুর দান করা উচিত।" রাসূল (সা) এমনকি এটাও বলেছেনঃ "প্রয়োজনে খেঁজুরের টুকরো হলেও দান করা উচিত।" তিনি মানুষকে দান করার প্রতি উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের থেকে তাঁদের পরিশ্রান্ত ও দরিদ্র ভাইদের জন্য সাদাকার অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা সাদাকা করতে দেরী করতে লাগলেন। অপেক্ষার ধীর ও ভারী মুহূর্তগুলো পার হয়ে যাচ্ছিল। আর রাসূলুল্লাহও (সা) দরদের সাথে প্রত্যাশার অধীর সময়গুলো কাটাচ্ছিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারাতেও এর ছাঁপ পড়েছিল।

কিছুক্ষণ পর এক আনসারী সাহাবী এক গোছা রূপার মুদ্রা নিয়ে এলেন, যা তাঁর আঙ্গুলগুলো একেবারে ভরে ফেলেছিল। এমনকি তার হাতের তালুও সেগুলো ধরতে হিমশিম খাচ্ছিল। তিনি বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! এগুলো আল্লাহর রাহে।" এই সূচনা দেখে অপেক্ষার ভার ও প্রত্যাশার অধীরতা শেষ হল। মানুষ দানকারী আনসারীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে লাগল। আবু বকর কিছু দান করলেন, এরপর উমার (রা) কিছু দান করলেন। মুহাজিররা দান করলেন। অন্যান্য লোকেরাও তাঁদের অনুসরণ অরল। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে খাবার ও পোশাকের দুটো স্তুপ জমে গেল। এটা দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তাতে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। এমনিতে রাসূলুল্লাহর (সা) মুখমন্ডল দেখে মনে হত, খাঁটি সাদার মধ্যে যেন লাল রঙ ঢেলে দেয়া হয়েছে। তাঁর দুই গাল ও মুখমন্ডল যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠত তখন তা দেখে মনে হত এমন এক রূপার পাত্র মনে হত যা স্বর্ণ দ্বারা খচিত করা হয়েছে। এই দরিদ্র ও পরিশ্রান্ত আগন্তুক দলের জন্য তাঁর সাহাবীদের দান দেখে তিনি আনন্দিত ও খুশি হলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সামনে অবস্থিত খাদ্য ও পোশাএর স্তুপের দিকে তাকালেন। কিন্তু তখনো তাঁর চোখে ও অন্তরে ভাসছে সেই দৃশ্য ভাসছে যখন প্রথম সেই আনসারী ব্যক্তিটি এক গোছা রূপার মুদ্রা নিয়ে এসেছিল। এর পরেই অপেক্ষা ও প্রত্যাশার নীরব প্রহর শেষ হয় এবং সবাইকে কল্যাণের পথে ছুটে আসার জন্য উদ্দীপ্ত হয়। প্রথম দানকারী ব্যক্তিটির দৃশ্য তখনো হাজির এবং তাঁর এই উদ্যোগ প্রশংসা ও স্তুতির যোগ্য। আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের দিকে ফিরে উদ্যোক্তা ও উদ্যোগের প্রশংসা করে বললেনঃ "ইসলামে যে কোন ভালো রীতির প্রচলন করে, তার জন্য নিজের পুরস্কার ছাড়াও রয়েছে তার পরে তার রীতি অনুসরণকারীদের পুরস্কার। কিন্তু এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কার থেকে কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। যে ইসলামে কোন খারাপ

রীতির প্রচলন করল, তার ওপর নিজের গুনাহসহ তার রীতির অনুসরণকারীদের গুনাহও বর্তাবে। কিন্তু এতে অনুসরণকারীদের গুনাহ থেকে কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না।”[39]

***এ ঘটনায় কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ

১) নবী (সা) মানুষের প্রয়োজন মেটাতে কিভাবে সমবেদনার সাথে সম্পৃক্ত হতেন তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। এটা ছিল মানুষের কষ্ট তাঁর ওপর গভীর মানসিক প্রভাব ফেলত, এমনকি তা তাঁর চেহারায় এমনভাবে ফুটে উঠত যে সাহাবাগণ তাঁর চেহারার রঙ দেখতে পেতেন। প্রথমে তিনি তাঁর নিকট আসা দরিদ্র ও পরিশ্রান্ত দলটিকে দেখলে বেদনা অনুভব করলেন। এরপর সাহাবাগণকে যখন সাদাকা করতে দেরী করতে দেখলেন, তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। সাদাকা শেষে তাঁর চেহারায় খুশির ঝলক দেখা গেল, এমনকি তাঁর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর চেহারা খুশি ও আনন্দে ঝলকাতে লাগল। এটা শুধু এজন্যই যে, এই গরীবদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়েছে।

এই অভাবীদের প্রতি বেদনায় নবীজির (সা) চেহারার রঙ পালটে যাওয়া এবং সাদাকার পর তাদের জন্য খুশিতে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠা থেকে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) মধ্যে মানুষের দুঃখ-বেদনায় কতটা আবেগানুভূতি কাজ করত। এসব ছিল নবীজির (সা) অন্তর থেকে নিঃসৃত এবং তা তাঁর মনে উত্থালপাতাল সৃষ্টি করত। তাঁর চেহারায় সেটার ছাপ দেখা যেত এবং সাহাবাগণ তাঁর মুখ দেখেই তাঁর মনের অবস্থা পড়তে পারতেন।

নবীজি (আ) এমন লোকদের জন্য এমনভাবে অনুভব করতেন যারা তাঁর কাছে মাত্রই এসেছে। এটা ছিল তাঁর সাথে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। এটা ছিল মূলত রহমত যা দ্বারা তাঁর অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। আল্লাহ তাঁর নবীকে মুমিনদের প্রতি চরম অত্যধিক স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র এবং পুরো সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত হিসেবে অভিহিত করেছেন। অতএব প্রত্যেক দয়াশীল ও কোমল হৃদয়ের মুমিনদের উচিত নবীজির (সা) দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তা দ্বারা নিজেদের গুণাবলীদের সৌন্দর্যমন্ডিত করা।

২) নবীজি (সা) মানসিকভাবে এতটা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর এই প্রখর অনুভূতির সাথে সাথে অভাবীদের অভাব পূরণে সাড়া দেয়া নিজের মাধ্যমে শুরু করেন। তিনি তাঁর বাড়িতে ছুটে যান ও প্রবেশ করেন। এখানে

এটা ছাড়া অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই যে, তিনি বাড়িতে এমন কিছু খুঁজছিলেন যা দ্বারা এই অভাবীদের অভাব পূরণের কাজটা শুরু করা যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ ঘরে কিইবা খুঁজে পেতেন যেখানে টানা দু মাস চলে যেত কিন্তু তাঁর ঘরে রান্নার আগুন জ্বলত না! তিনি কিছুটা হলেও মূল্য বহন করে এমন কিইবা খুঁজে পেতেন যেখানে তাঁর জীবনসামগ্রী ছিল খুবই নগণ্য এবং তাঁর থেকে দুনিয়ার সামগ্রী ও আনন্দকে সংকুচিত করা হয়েছিল। সেজন্য তিনি খালি হাতে ঘর থেকে বের হলেন কারণ তিনি দেয়ার মত কিছুই খুঁজে পান নি। কিন্তু তিনি নিজেকে দিয়ে শুরু করেছিলেন। তিনি সবসময়ই কথার আগে কাজ দিয়ে এবং অন্যদের আগে নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন। তিনি যে কাজের নির্দেশ দিতেন, সে কাজ আগে নিজে করতেন।

এরপর নবীজি (সা) বক্তৃতা দিলেন এবং মানুষকে সাদাকার জন্য উৎসাহিত করলেন। তিনিই কাপড়ে ভরা সম্পদ মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন। তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এমন মানুষকেও গনীমতের সম্পদ দিয়েছেন, যার দারিদ্রের ভয় ছিল না। তিনি বলেছেনঃ "আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও থাকে তাহলে তার কিছু অংশও আমার কাছে তিন রাতের বেশি সময় থাকুক তা আমার পছন্দ নয়। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দেই।" এরপর দুনিয়াকে বিদায় দেয়ার সময় বলেনঃ "আমরা নবীরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা।" নবীজি (সা) ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী। কিন্তু তাঁর কর্ম ছিল অধিকতর স্পষ্ট এবং তাঁর অবস্থা যে বার্তা দিত তা ছিল সর্বাধিক বার্তাবাহী।[404142]

৩) যে আনসারী সাহাবী প্রথম এক গোছা রূপার মুদ্রা নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে পেশ করেন তাঁর কীর্তি থেকে ইতিবাচক উদ্যোগের প্রভাব ও গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাঁর দেখাদেখি বাকি লোকেরাও দান করতে ছুটে যায়। হয়তো সেই আনসারী সাহাবীর পর যে দান করেছে তার দানের পরিমাণ আনসারী সাহাবীর দানের পরিমাণ থেকে বেশি, কিন্তু সেই আনসারী সাহাবী সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ও একটি ভালোকাজে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং এর পথ উন্মুক্ত করেছেন। এজন্যই নবী (সা) তাঁর সামনে দানকৃত সম্পদের স্তুপ দেখে সেই মন্তব্য করেছেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, যা সেই আনসারী সাহাবীর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং এর মহিমা ঘোষণা করেছেন।

৪) এ রেওয়ায়েতে প্রথম দানকারী সাহাবী আনসারী এটা মাত্র বলা হয়েছে, তাঁর কোন নাম উল্লেখ করা হয় নি। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না, যদিও তিনি আবু বকর, উমার এবং অগ্রগামী মুহাজিরদের মজলিসে হাজির ছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইতিবাচক উদ্যোগ নিতে কারো সংকোচবোধ করা উচিত নয়। অগ্রগামী ও সৎকর্মশীলদের উপস্থিতি এই আনসারী সাহাবীকে প্রথম পদক্ষেপ নিতে বাধা তো দেয়ই নি, তিনি বরং কল্যাণকাজে ছুটে গিয়েছেন এবং দ্রুততা ও অগ্রগামিতার সাথে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন। যারা তাঁর পরে দান করেছে তাঁদের সবার সমপরিমাণ সওয়াব তিনি পাবেন, যদিও পরবর্তীগণ তাঁর চেয়ে উত্তম এবং তাদের দানের পরিমাণও অধিক।

৫) সাহাবীদের সাদাকা করতে দেরী করাটা কৃপণতাবশতঃ ছিল না। তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন যাঁদের অন্তরকে আল্লাহ কৃপণতা থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং বলেছেন যে, তাঁরা দারিদ্র সত্ত্বেও নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেন। হয়তো সেই ধীরতার কারণ ছিল তাঁরা সাদাকা করতে যেতে আলসেমী করছিলেন এবং কতটুকু দেবেন সেটা নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি একগোছা রৌপ্য মুদ্রা দান করল, সেটা দ্রুত এবং অধিক পরিমাণে দান করার ক্ষেত্রে একটি উৎসাহ হয়ে দাঁড়ায়। আর এজন্যই তাঁর এই সুন্দর সুন্নতটি এমন একটি উদ্যোগ ছিল যা ধীরতাকে দ্রুততায় বদলে দেয় এবং মোট দানের পরিমাণ উদারভাবে অনেকগুণ করে তোলে।

৬) “ইসলামে যে কোন ভালো রীতির প্রচলন করে, তার জন্য নিজের পুরস্কার ছাড়াও রয়েছে তার পরে তার রীতি অনুসরণকারীদের পুরস্কার। কিন্তু এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কার থেকে কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না।” এ প্রেক্ষিতে নবীজির (সা) এই মহান বাণী থেকে উত্তম উদ্যোগের সুমহান প্রভাব ও মোবারক ফলাফল স্পষ্ট হয়ে উঠে। যদি মহান ব্যক্তি, প্রভাবশালী ও সংস্কারকদের জীবনীর ওপর গভীর দৃষ্টি ফেলা হয়, তাহলে দেখা যাবে তাদের জীবন ছিল একটা পর একটা ইতিবাচক উদ্যোগের পরম্পরা। আর এজন্যই তারা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাদের প্রভাব স্থায়ী হয়েছে। আমরা যদি ইমাম আবদুল আযীয বিন বাযের (রহ) জীবনী দেখি, তাহলে তাঁকে উদ্যোগী আত্মার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখতে পাব। তিনি ভালোকাজের কোন সুযোগকেই হাতছাড়া করতেন না। জ্ঞানের গভীরতা তাঁর একমাত্র গুণ ছিল না, বরং অনেক গুণের একটি ছিল। তাঁর ইতিবাচক কর্মোদ্যোগ তাঁর মৃত্যুর পরও অনেক প্রকল্পকে জিইঁয়ে রেখেছে এবং অনেক সড়ক এখনো একারণে পথিকদের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্টিফেন কভি তাঁর বই ‘7 Habits for Highly Effective People’-এ যেসব অভ্যাস সফলতা এনে দেয় সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ “কর্মোদ্যোগ হচ্ছে সব অভ্যাসের মূল। তাই এটা বলা সম্ভব যে, কর্মোদ্যোগ সব অভ্যাসে মা ও বাবা।”

১৬। ছুমামা

নবী (সা) মদীনার পূর্বভাগকে রক্ষা করার জন্য একবার একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করলেন। সেই অভিযানে বনু হানিফ গোত্রের এক সরদারকে পাকড়াও করা হল, যার নাম ছিল ছুমামা বিন উছাল। তাকে যখন মদীনায় নিয়ে আসা হয়, তাকে কোন কারাগার বা ব্যারাকে বন্দী করা হয় নি। তাঁকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুমিনদের ইবাদতী জীবনের চিত্র তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

একদিন নবী (সা) তাঁর নিকটে এসে বললেনঃ "তোমার কাছে কি আছে, ছুমামা?" এটা ছিল একজন নবীর (সা) কথা, যার সাথে বকাঝকা, অপমান বা হুমকিধামকির অনেক ফারাক ছিল। নবীজি (সা) আশা করছিলেন, ছুমামা তাঁর থেকে সরাসরি কিছু শুনবে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাকে তার কাছে কি আছে সেটা জিজ্ঞাসা করলেন, ছুমাম প্রথাগত শৈলীতে জবাব দিলঃ "আমার কাছে কল্যাণ আছে, হে মুহাম্মাদ!" এরপর সে তাই বলল যা তার থেকে প্রত্যাশিত ছিল। সে নবীজিকে (সা) উদ্দেশ্য করে বললঃ "তুমি যদি আমাকে হত্যা কর, তাহলে তা ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসবে। আর যদি তুমি আমার ওপর অনুগ্রহ কর, তাহলে আমাকে কৃতজ্ঞ হিসেবে পাবে। আর তুমি যদি সম্পদ চাও, তাহলে আমার কাছে চাও তোমার যা ইচ্ছা।" নবী (সা) তার সামনে থেকে চলে এলেন এবং তার বলা কোন পথই অবলম্বন করলেন না, যাতে তার ইন্দ্রিয় ও চেতনাকে নবী (সা) ও তাঁর সাহাবাদের পর্যবেক্ষণে উদ্দীপ্ত করতে পারেন। হয়তো সে তার পরিণতির ওপর গভীর দৃষ্টি দেবে।

খুঁটির সাথে বাঁধা ছুমামার সাথে এমন কোন আচরণ করা হয় নি যাতে তার সম্মানে কোন আঘাত আসে। বরং তার খাওয়াদাওয়া আসত রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর থেকে, যেন তিনি ছুমামাকে তাঁর খাদ্য ও পানীয়ে শরীক করছিলেন।

একদিন ধরে খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় ছুমামা রাসূলুল্লাহর (সা) আচরণে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ দেখছিল। দেখছিল, রাসূল (সা) মুসলিমদের নেতা হয়েও কিভাবে তাদের একজন হয়েই তাদের সাথে বসবাস করছেন।

তিনি তাঁর চরিত্র ও সত্ত্বার নিবেদনের মাধ্যমে তাদের সবাইকে ধারণ করতেন। ছুমামা মুসলিমদের রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে প্রচন্ড খোদাভক্তির সাথে সালাত আদায় করার দৃশ্য অবলোকন করেছে। এরকম কোন দৃশ্য সে আগে কখনো দেখেনি। ছুমামা রাসূলুল্লাহকে (সা) সালাতে কোরআনের আয়াত ধীরেসুস্থে তেলাওয়াত করতে শুনেছে। চোখের সামনে এসব দৃশ্য ছিল তাঁর অন্তরের প্রতি সূক্ষ্ম এক বার্তা। পরদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আবার তার কাছে এসে বললেনঃ "তোমার কাছে কি আছে, হে ছুমামা ?" ছুমামা উত্তর দিলঃ "আমি তো তোমাকে বলেছিই। যদি তুমি আমার ওপর অনুগ্রহ কর, তাহলে আমাকে কৃতজ্ঞ হিসেবে পাবে।" ছুমামা এর বেশি কিছু বলে নি।

রাসূলুল্লাহর (সা) মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা অথবা সম্পদের লোভের কোন লক্ষণ না দেখায় ছুমামার অন্তর কিছুটা আশ্বস্ত হল। আর সেজন্যই রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যাপারে তার যে ধারণা হল সে অনুযায়ীই সে তার উত্তর সংক্ষিপ্ত রাখল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ছেড়ে গেলেন যাতে সে নববী মাদ্রাসায় আরো একদিন কাটাতে পারে এবং সেখান থেকে আরো কিছু দেখতে ও শুনতে পায়।

তৃতীয় দিন রাসূলুল্লাহ আবারো ছুমামার কাছে এসে বললেনঃ "তোমার কাছে কি আছে, হে ছুমামা ?" ছুমামা বললঃ "আমার কাছে কি কাছে তাতো আপনাকে বলেছিই।" ছুমামা এরচেয়ে বেশি কিছু বলে নি। বরঞ্চ তার এ সংক্ষিপ্ত জবাব ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) সুমহান চরিত্রের ওপর নিজ পরিণতি ছেড়ে দেয়ার শামিল। এরপর রাসূলুল্লাহ বললেনঃ "ছুমামাকে ছেড়ে দাও !" আর এভাবেই ছুমামা বন্ধনমুক্ত হল। তিনদিন রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদে কাটিয়ে সেখানে পরিপূর্ণভাবে নবুওতী দৃশ্য অবলোকন ও কোরআনের আয়াত শোনার পর ছুমামাকে কোন শর্ত ছাড়াই নববী ক্ষমার আওতায় মুক্ত করে দেয়া হল। আর এজন্যই ছুমামা যে অন্তর নিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেছিল, এর চেয়ে ভিন্ন এক অন্তর নিয়ে সে মসজিদ থেকে বের হল। ছুমামা মসজিদ থেকে বের হয়ে কাছেই এক খেজুর বাগানের দিকে ছুটে গেল। সেখানে সে গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করল এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল...হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর শপথ, এ যমীনে আপনার চেহারা ছিল আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত চেহারা। আর আজ আপনার চেহারাই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় চেহারা হয়ে গেল। আল্লাহ শপথ, আপনার দ্বীন আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত দ্বীন ছিল আর আজ আপনার দ্বীন আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় দ্বীন হয়ে গেল। আল্লাহ শপথ, আপনার শহর আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত শহর ছিল আর আজ আপনার শহর আমার

নিকট সবচেয়ে প্রিয় শহর হয়ে গেল। যদি আপনার ঘোড়া আমাকে দেন, আমি উমরা করতে চাই ? আপনার কি মত ?”

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে কল্যাণের সুসংবাদ দেন এবং তাঁকে উমরায় যাওয়ার অনুমতি দেন। ছুমামা এ উদ্দেশে মক্কায় গেলেন এবং তাওয়াফ ও সা’ঈ করলেন। সেখানে তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন, যা মক্কাবাসী পছন্দ করল না। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলঃ “তুমি কি সাবা’ঈ হয়ে গিয়েছ ?” তিনি উত্তর দিলেনঃ “না। আমি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর শপথ ! রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমাদের নিকট ইয়ামামা থেকে আর গমের চালান আসবে না।” এরপর ছুমামা ইয়ামামায় তাঁর গোত্রের কাছে ফিরে গেলেন এবং গোত্রপতি হিসেবে তাদের মক্কায় কিছু নিয়ে যেতে বারণ করে দিলেন।

ছুমামার (রা) এই সিদ্ধান্ত কুরাইশদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। তারা নবীজির (সা) কাছে সংবাদ পাঠাল এবং তাঁকে আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে (নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে বলেন) তাদের গম সরবরাহের ব্যাপারে সাহায্য করতে বলল। রাসূলুল্লাহ (সা) ছুমামার (রা) কাছে চিঠি লিখে তিনি যেন তাঁর গোত্রকে মক্কায় ব্যবসায়ী পণ্য বহন করার অনুমতি দেন সে ব্যাপারে আদেশ করলেন। আর এভাবেই রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে ইয়ামামা থেকে মক্কায় গম ও অন্যান্য পণ্যের সববরাহ আবার শুরু হল।[43]

***এ ঘটনা থেকে আলোকিত শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছেঃ

১) এ ঘটনা থেকে ছুমামার ব্যক্তিত্ব ও অহংকার ফুটে ওঠে। নবী কারীমের (সা) সামনে খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় ছুমামা যখন বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য পরিণতির মুখোমুখি, যেগুলোর মধ্যে মৃত্যু প্রথমে না থাকলেও অন্যতম একটি তো ছিলই, সে অবস্থাতেও রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করার সময় ছুমামা ছিলেন ধীরস্থির। তিনি নিজের প্রস্তাবগুলো স্পষ্টভাবে শক্তিমত্তার সাথে রাসূলের (সা) সামনে তুলে ধরেন। তার কথায় রাসূলের (সা) চাটুকারিতা ও তাঁর সামনে নতজানু হওয়া তো দূরের কথা, অনুরোধের সুরও ফুটে উঠেনি। নবীজি (সা) ছুমামার ব্যক্তিত্বের এই শক্তিমত্তাকে অক্ষুণ্ন রাখেন এবং এটিকে অবমাননা ও অপমানের মাধ্যমে আঁচ পৌঁছাননি।

জাহেলিয়াতের যুগে ব্যক্তিত্বের এই শক্তিই ইসলামের যুগে এসে ধনভান্ডারে পরিণত হয়। এর উদাহারণ হচ্ছেন ছুমামা, যিনি ইসলামের আগেও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও গর্বের সাথে তাঁর এই প্রবল ব্যক্তিত্ব জারী রাখেন। তিনি কুরাইশদের মাঝে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। যখন তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তিনি তাদের মোকাবেলায় শক্তিমত্তার পরিচয় দেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে ঘোষণা দেন। এরপর তিনি নিজ সিদ্ধান্তেও বলিষ্ঠতা প্রদর্শন করেন এবং মক্কাবাসীদের কাছে যাতে ইয়ামামার গম না যায় সে ব্যবস্থা নেন। শেষপর্যন্ত তিনি মক্কাবাসীদের বাধ্য করেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে মক্কায় গম সরবরাহ পুনঃচালু করার অনুমতি প্রার্থনা করতে। ছুমামা মূলত এটাই চেয়েছিলেন।

নবীজি (সা) মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখতেন। আর এজন্যই ইসলাম গ্রহণের পর তাদের এই ব্যক্তিত্ব ইসলামের জন্য সম্পদে পরিণত হত।

২) ছুমামা প্রচন্ড পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টির সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন যদিও নবীজি (সা) সরাসরি তাঁকে ইসলামের দিকে ডাকেন নি অথবা ইসলামগ্রহণকে তাঁর মুক্তিপণ হিসেবেও দাবী করেন নি। ইসলামের ব্যাপারে ছুমামার পরিতৃপ্তি এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথের মুসলিমদের তাঁদের সবচেয়ে বড় সাক্ষাতস্থান মসজিদে তাঁদের দৈনিক কার্যাবলী দেখা এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতে যে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতেন তা শোনার মাধ্যমে। ছুমামা এসময় যা দেখেছেন ও শুনেছেন তা ছিল তাঁর জন্য রিসালাত ও রাসূলুল্লাহর (সা) সত্যবাদিতার ব্যাপারে ব্যবহারিক প্রমাণ। এর ফলে তিনি এ ধরনের দৃঢ় বলিষ্ঠতার সাথে ঈমান আনতে পেরেছেন এবং এ দৃঢ়তার ওপর অটল থাকেন। এজন্যই যেদিন তাঁর গোত্র বনু হানীফার অনেকেই মুসাইলামার সাথে মুরতাদ্দ হয়ে যায়, সেদিন ছুমামা ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকেন। তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের যারা রিদ্দা থেকে দৃঢ়ভাবে দূরে থাকেন এবং মানুষকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে যে জিহাদ করা হয় তাতে অংশগ্রহণকারীদের একজন।

৩) ছুমামা কুরাইশদের বাধ্য করেন রাসূলুল্লাহর (সা) সুপারিশ প্রার্থনা করতে, যাতে ইয়ামামা থেকে খাদ্য সরবরাহ মক্কায় পৌঁছে। কুরাইশরা নবী কারীমকে (সা) সেই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা রক্ষা করার শিক্ষা তিনি দেন। নবীজির (সা) পক্ষে সম্ভব ছিল কুরাইশদের উত্তরে বলাঃ “তোমরা যে

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কথা বলছ তা তো প্রথম তোমরাই ভঙ্গ করেছ।” নবীজির (সা) পক্ষে সম্ভব ছিল শি’আবে আবু তালিবে বনু হাশিমকে অবরোধ করার সময় তাদের প্রয়োজনীয় সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার ঘটনা কুরাইশদের স্মরণ করিয়ে দেয়া। তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য না রেখে তাঁকে এবং মুসলিমদের যখন মক্কা থেকে বের করে দেয়া হয় সেসময়কার ঘটনা কুরাইশদের স্মরণ করিয়ে দেয়া। কিন্তু নবীজি (সা) এসবের কিছুই করেন নি। তিনি বরঞ্চ ছুমামার কাছে ইয়ামামা থেকে মক্কায় সরবরাহে তিনি যেন বাধা না দেন সে ব্যাপারে বার্তা পাঠান।

নবীজির (সা) আচরণ ছিল প্রতিশোধস্পৃহা থেকে অনেক দূরে। তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে তাদের মূল্যবোধ অনুযায়ী নয়, বরং নিজের মূল্যবোধ অনুযায়ী আচরণ করতেন। তিনি এক সুউচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লালন করতেন আর তা হচ্ছে মানুষকে সেই দ্বীনের ওপর একত্রিত করা, যা সহকারে আল্লাহ তাঁকে মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন। এজন্যই নবীজির (সা) এই পদক্ষেপ মক্কাবাসীর সবার মনে না হলেও, অনেকের অন্তরেই প্রভাব ফেলে, যা পরবর্তীতে নবীজি (সা) আনীত দ্বীন গ্রহণ করতে নিজেদের অন্তরকে প্রস্তুত করতে তাদের সাহায্য করে।

১৭। সালামা

আল্লাহ সালামা বিন আকওয়াকে (রা) প্রসারিত দেহ দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রচন্ড শক্তিশালী। দেখা যেতো, তিনি হয়তো একটি বাহিনীকে আক্রমণ করে বসেছেন এবং একাই তাদের পরাজিত করে ফেলেছেন। দৌড়ে তাঁর সাথে কেউ পেরে উঠত না। তাঁর ছিল অফুরন্ত শক্তি, সুঠাম দেহ এবং প্রচন্ড গতি।

হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন তিনি বিস্ময়কর ভূমিকা রাখেন। সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে দূতরা ছুটোছুটি করছিল চুক্তির শর্তাবলী প্রস্তুত করার জন্য, যা রাসূল (সা) মক্কাবাসীদের সাথে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মধ্যাহ্নের সময় সালামা একটি গাছের ছায়াতলে যান রোদ থেকে আশ্রয় নেয়ার জন্য। তিনি গাছের কাঁটাগুলো পরিস্কার করলেন এবং গাছ থেকে ঝড়ে পড়া অংশ সংগ্রহ করে তা দিয়ে নিজের জন্য বিছানা তৈরী করলেন গাছের নিচে শোয়ার জন্য। মক্কা থেকে চারজন মুশরিক এসে তাদের অস্ত্র সেই গাছে ঝুলালো। তারা বসে কথা বলতে লাগলো এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যাপারে কুৎসা করতে লাগল। সালামার জন্য রাসূলের (সা) ব্যাপারে কুৎসা শোনার চাইতে তাঁর নিজের বাবা মার উদ্দেশ্যে দেয়া গালিগালাজ শোনা অধিকতর সহজ ছিল। সালামা রাসূলের (সা) ব্যাপারে কুৎসা শুনে চূড়ান্তরকমের কষ্ট পেলেন। তিনি সেই গাছ ছেড়ে অন্য এক গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন যাতে সেই মুশরিকরা রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যাপারে যে কুৎসা করছিল তা তার কানে না আসতে পারে।

এরপর সালামা (রা) হঠাৎ সুউচ্চ স্বরে এক আহবানকারীকে বলতে শুনলেনঃ 'হে মুহাজিরগণ! ইবনে যুনাইমকে হত্যা করা হয়েছে।' তিনি ভাবলেন মুশরিকরা চুক্তির প্রচেষ্টা ভেস্তে দিয়েছে। তাই তিনি তাঁর তলোয়ার তুলে নিয়ে সেই চারজন মুশরিকের ওপর হামলে পড়ে তাদের বেঁধে ফেললেন। তারা তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। তিনি তাদের অস্ত্রগুলো নিজ হাতে নিলেন। এরপর তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ "সেই সত্ত্বার শপথ যিনি মুহাম্মাদের মুখমন্ডলকে সম্মানিত করেছেন, তোমাদের কেউ মাথা তুললে আমি তলোয়ার তার মাথা উড়িয়ে দেব।" এরপর তিনি তাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এলেন। এরপর তাঁর চাচা আমির ৯০ জন মুশরিককে তাড়িয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে এলেন, যারা মুসলিমদের সামরিকভাবে উস্কানোর

চেষ্টা করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দিকে তাকালেন এরপর বললেনঃ “তাদের ছেড়ে দাও যাতে তাদের একাধিকবার বিশ্বাস ভঙ্গের দায় প্রমাণিত হয়।” অর্থাৎ সব বিশ্বাস ভঙ্গের দায় যেন কুরাইশদের ওপরই বর্তায়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের মাফ করে দেন ও ছেড়ে দেন।[44]

***এই ঘটনা থেকে নিম্নবর্ণিত শিক্ষাসমূহ পাওয়া যায়ঃ

১) রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর সাহাবীদের চেয়ে বেশি কেউ ভালোবাসত না, যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা তাঁর চেহারা অবলোকন করে আলোকিত হতেন, তাঁর কথা শুনে তাঁদের কর্ণকুহর প্রশান্তি লাভ করত। তাঁর জীবনের বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতিতে ও অবস্থায় তাঁরা তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন। তাঁদের রক্ত-মাংস ও হৃদয়ের পুরোটা জুড়ে ছিল তাঁর প্রতি ভালোবাসা। সালামা (রা) যে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সেই একই গাছের নিচে বসে থাকা একদল মুশরিক রাসূলুল্লাহর (সা) কুৎসা করছিল এবং তা তিনি শুনতে পান। তা শুনতে পেয়ে সালামার (রা) অন্তর কতটাই না ব্যথা পেয়েছিল, রাগে ও তিক্ততায় তাঁর রক্ত কতটাই না টগবগ করে ফুটছিল! কিন্তু তিনি তাঁর ক্রোধ চেপে রাখলেন এবং তাঁর আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। তিনি আবেগের বশে কিছু করে বসলেন না, যদিও সেসময় তিনি ছিলেন তাঁর তারুণ্যের পূর্ণতায়। তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর মাত্র। তিনি সেই গাছ মুশরিকদের জন্য ছেড়ে দিয়ে তাদের থেকে দূরে সরে গেলেন, যেটার তলা তিনি নিজের বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। এটা এজন্য যে, তাঁর পক্ষে মুশরিকদের কষ্টদায়ক কথা শোনা আর সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি দুর্বলতা অথবা অক্ষমতার কারণে যে তাঁর অন্তরের ক্রোধ ও তিক্ততা প্রশমিত করতে পারছিলেন না – ব্যাপারটি এমন নয়। তিনি অন্তরের দিক দিয়ে যেমন সাহসী ছিলেন, তেমনি শারীরিক দিক দিয়েও ছিলেন শক্তিশালী। তিনি ছিলেন দ্রুতগামী। কিন্তু তিনি তাঁর আবেগের ওপর পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার সাথে সংযম কায়েম করে এমন কোন কাজ থেকে বিরত থাকেন যা কোন বিবেচনাহীন পরিণতি নিয়ে আসতে পারত। তিনি ধৈর্য্য ও তীক্ষ্ণ অন্তঃদৃষ্টির সাথে নিজের অন্তরের বেদনাকে সহ্য করেন; এমনকি তিনি যখন একজন আহবানকারীকে এমন কিছু বলতে শোনেন যা কুরাইশদের বিশ্বাসঘাতকতার দিকে ইঙ্গিত করে, তিনি ঐ মুশরিকদের দলটিকে হত্যার উদ্যোগ নেন নি, যদিও সেটার উপযুক্ত সুযোগ তাঁর সামনে ছিল। তারা নিজেদের নিরস্ত্র করে তাদের অস্ত্র গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং কোন প্রস্তুতি ও সাবধানতা ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সালামা (রা) তাদের আটক করে নবীজির (সা) কাছে নিয়েই ক্ষান্ত হলেন, যাতে তাঁর এই আচরণ মুসলিমদের জন্য রেফারেন্সে পরিণত হয়।

সালামা (রা) তাঁর এই পদক্ষেপের মাধ্যমে নিজের চোখে পড়ার মত শক্তি এবং প্রচন্ড উস্কানি সত্ত্বেও আবেগানুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং বিবেচনাহীন প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বাছবিচারহীন আচরণ থেকে বিরত থাকার একটি চূড়ান্ত শিক্ষা উম্মতের সামনে পেশ করেন।

২) একইভাবে যেসব মুশরিক নবীজিকে (সা) গালিগালাজ ও তাঁর কুৎসা করছিল এবং যে ৯০ জন মুশরিক মুসলিমদের যুদ্ধে জড়াতে উস্কানি দিচ্ছিল তাদের সাথে নবীজির (সা) সুমহান আচরণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নবীজি (সা) তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন যাতে সব বিশ্বাসঘাতকতার দায় তারা নিজেরাই বহন করে। এটা ছিল নববী বদান্যতা যার কারণে সেসব মুশরিকদের তিনি কোন নিন্দা ও ভর্ৎসনা করেন নি। এ ছিল সুমহান চারিত্রিক আচরণ ও অসাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন।

নবীজির (সা) সামনে আরো বড় ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল আর সেটা ছিল তাঁর ও মক্কাবাসীর মধ্যে চুক্তি নিষ্পন্ন করা। এজন্যই তিনি মুশরিকদের ইতরশ্রেণীর লোকদের পক্ষ থেকে এসব পুনঃপুনঃ উস্কানীকে তাঁর প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাতে এবং নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে সরে যাওয়ার কারণ হতে দেন নি। তিনি এসব উস্কানী দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন এবং এ ঘটনায় এই উস্কানীকে তিনি পাত্তা দেন নি এবং তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে তিনি অটল থাকেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে শেষপর্যন্ত। হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং চুক্তিপত্রও লেখা হয়। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট বিজয় অর্জিত হয়। নবীজি (সা) যখন মদীনায় ফেরত এলেন আল্লাহ আয়াত নাযিল হলঃ “নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি” [সূরা ফাতহঃ ১]।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা এবং কর্মপরিকল্পনার অভাব উম্মাহকে প্রতিক্রিয়াশীলতার ঘুরপাকে নিমজ্জিত করেছে।

বাছবিচারবিহীন ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া জাতির গতিপথকে ব্যহত, বড় বড় সুযোগকে অকার্যকর এবং বৃহৎ উদ্দেশ্যকে বাঞ্চাল করে দিতে পারে।

আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সেই মানবের ওপর যাঁর ওপর তিনি তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাঁকে প্রজ্ঞা প্রদান করেছেন। “যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাকে অফুরন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে” [সূরা

বাক্বারাঃ ২৬৯]।

১৮ | যবের রুটি

'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন দেখেছি এবং তাঁর ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর শুনেছি। রাসূলুল্লাহর (সা) যে অবস্থা আমি দেখেছি তাতে আমি দুঃখিত হয়েছি। তোমার কাছে কি কিছু আছে ?'

আবু তালহা (রা) এই কথাটি তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইমকে (রা) বলেছিলেন। আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল (সা) তখন আসহাবে সুফফাদের সূরা নিসা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ক্ষুধার কারণে তাঁর কণ্ঠে দুর্বলতা এবং চেহারায় বিবর্ণতা ফুটে ওঠে। আবু তালহা (রা) এ দৃশ্য দেখে আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইমের (রা) কাছে ছুটে গেলেন এ আশায় যে, হয়তো তাঁর কাছে এমন কিছু পাওয়া যাবে যা রাসূলুল্লাহকে (সা) খেতে দেয়া যাবে। এরপর যখন আবু তালহা উম্মে সুলাইমকে (রা) উপরোক্ত কথাটি বললেন, তিনি তাঁর হাত দিয়ে অল্প কিছুর ইশারা দিয়ে বললেন, "আমার কাছে একটা জিনিস আছে। আমাদের কিছু পরিমাণ যবের ময়দা আছে। যদি রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে একা আসেন, আমরা তা দিয়ে তাঁর ক্ষুধা নিবারণ করতে পারব। আর যদি তাঁর সাথে আরেকজন আসে, তাহলে তাদের ভাগে এর থেকে কম পড়ে যাবে।" এ শুনে আবু তালহা (রা) বললেনঃ "তাহলে তা প্রস্তুত কর। আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) দাওয়াত দিলে তিনি হয়তো আমাদের সাথে খেতে আসবেন।"

উম্মে সুলাইম (রা) সেই পরিমাণ যবের ময়দা দিয়েই কাজ শুরু করে দিলেন। এর পরিমাণ ছিল একজন খেতে পারে এমন। তিনি সেটাকে ভেজালেন, এরপর নিজ ছেলে আনাসকে খেজুর বাগানে পাঠালেন লাকড়ি নিয়ে আসার জন্য যা দিয়ে রুটি ছেঁকা হবে। আনাস লাকড়ি নিয়ে এল। উম্মে সুলাইম যে আটা দলেছিলেন তা দিয়ে রুটি প্রস্তুত করা শুরু করলেন। আবু তালহা (রা) তাঁর সৎপুত্র আনাসকে বললেনঃ "হে বৎস, রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে তাঁর কাছাকাছি দাঁড়াও। তাঁর জন্য অপেক্ষা কর যতক্ষণ না তিনি তাঁর সাহাবীদের থেকে আলাদা হচ্ছেন। এরপর তাঁকে অনুসরণ কর। এরপর তিনি যখন তাঁর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াবেন, তাঁকে বলবে, আমার বাবা আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে দাওয়াত দিয়ে আমাকে বিব্রত করো না।"

আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে তাঁকে মজলিসে বসা অবস্থায় পেলেন। তাঁর চারপাশে প্রায় ৮০ জন সাহাবী অবস্থান করছিলেন। আনাস দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাক্লেন কখন রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াবেন এবং আনাস গিয়ে তাঁকে দাওয়াত দেবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আনাসকে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেনঃ "হে বৎস, তোমাকে কি তোমার পিতা পাঠিয়েছে?" আনাস বললেনঃ "হ্যাঁ।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "খাওয়ানোর জন্য?" আনাস বললেনঃ "হ্যাঁ।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেনঃ "আল্লাহর নামে দাঁড়াও। আবু তালহার দাওয়াতে সাড়া দাও।"

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) শক্ত করে আনাসের হাত ধরলেন এবং সবাই মিলে আবু তালহার (রা) ঘরের দিকে রওনা দিলেন। আনাসের অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। তাঁর হাত রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে। দাওয়াত খেতে চলা পুরো দলটির পদক্ষেপে যেন আনাসের চারদিকের পৃথিবী যেন কেঁপে উঠছে। আনাস এখন আবু তালহাকে (রা) কি জবাব দেবে? অথচ আনাসকে আবু তালহা (রা) সব বুঝিয়ে বলেছিলেন এবং তাঁকে সতর্কও করে দিয়েছিলেন। আবু তালহার (রা) বলে দেয়া কৌশল কিভাবেই বা কাজে লাগত যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই এসে আনাসকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন? আর আনাসেরও রাসূলের (সা) প্রশ্নের জবাব ও সত্যায়ন ছাড়া আর অন্য কিইবা করার ছিল? এত অল্প খাদ্য দিয়ে কিভাবে এতজনের খাবারের ব্যবস্থা হবে?

আবু তালহার (রা) বাড়ির কাছাকাছি আসার পরই রাসূলুল্লাহ (সা) আনাসের হাত ছাড়লেন। আনাস বাড়ির দিকে ছুটে চলল এবং আবু তালহার (রা) কাছে গিয়ে বললেনঃ "হে পিতা! আমি তো রাসূলুল্লাহকে (সা) তাই বলেছি যা আপনি আমাকে বলতে বলেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাহাবীদেরকেও দাওয়াত দিয়েছেন। এখন তিনি তাঁদের নিয়ে আসছেন।" আবু তালহা (রা) আনাসকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বললেনঃ "তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহর কাছে অপদস্থ করলে। তুমি কি জানতে না, আমাদের কাছে কি পরিমাণ খাদ্য ছিল?" আনাস বললেনঃ "অবশ্যই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহকে কিছুই বলার সুযোগ পাই নি।" তিনিই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "খাওয়ানোর জন্য?" আর আমি তাঁকে মিথ্যা বলা অপছন্দ করলাম।" আবু তালহা (রা) প্রচন্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আবু তালহা তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইমকে গিয়ে বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ লোকদের নিয়ে আসছেন। আমাদের কাছে অত পরিমাণ খাদ্যও নেই যা দিয়ে আমরা তাঁদের সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি।" উম্মে সুলাইম জবাব বললেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

আবু তালহা (রা) গিয়ে ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়ালেন রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বাগত জানানো জন্য। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আবু তালহার (রা) ঘরের দরজার সামনে গিয়ে পৌঁছালেন তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেনঃ “তোমরা বসো।” তাঁর সঙ্গীরা ঘরের সামনেই বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবু তালহা (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন। আবু তালহা (রা) তাঁকে বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমি আনাসকে পাঠিয়েছিলাম কেবলমাত্র আপনাকে দাওয়াত দেয়ার জন্য। উম্মে সুলাইম কিছু রুটি বানিয়েছিল। আমাদের কাছে যা আছে তা তো আপনার সাথের এত মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে না।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “শুরু করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার কাছে যা আছে আল্লাহ তাতেই বরকত দেবেন।”

এরপর আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “হে উম্মে সুলাইম, তোমার কাছে যা আছে তাই নিয়ে এসো।” উম্মে সুলাইম তাঁর কাছে একটি পাত্র নিয়ে এলেন যাতে রুটি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেনঃ “তোমার কাছে কি মাখন আছে?” আবুল তালহা বললেনঃ “আমার কাছে চামড়ার পাত্রে কিছু মাখন আছে।” নবীজি (সা) বললেনঃ “সেটি নিয়ে এসো।” আবু তালহা (রা) চিকন একটি চামড়ার পাত্র নিয়ে এলেন এবং বললেনঃ “এখানে কিছু আছে” অথবা বললেনঃ “এখানে তেমন কিছুই নেই।” রাসূলুল্লাহ (সা) পাত্রের বন্ধন খুলে বললেনঃ “হে আল্লাহ! এর মধ্যে বরকত বাড়িয়ে দাও।” এরপর উম্মে সুলাইমকে (রা) বললেনঃ “এটিকে ধরে উল্টাও পাল্টাও” উম্মে সুলাইম তাই করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবু তালহা (রা) পাত্রটিকে ধরে নিংড়ালেন, শেষে পাত্রটি থেকে কিছু মাখন বের হল। এরপর নবীজি (সা) নিজের আঙ্গুল দিয়ে মাখন ও রুটিতে ঘষে দিলেন। এরপর নবীজি (সা) বিসমিল্লাহ বললেন। এরপর রুটি ফুলতে লাগল। নবীজি (সা) আগের মতই করতে থাকলেন, রুটি আরো ফুলতে লাগল। শেষমেশ রুটি পুরো পাত্রের স্থান দখল করে নিল।

এরপর নবীজি (সা) আনাসকে বললেন, “আমার সঙ্গীদের মধ্য থেকে দশজনকে নিয়ে এসো।” আনাস তাই করলেন। নবী (সা) রুটির মধ্যখানে হাত রেখে বললেনঃ “আল্লাহর নামে খাও!” সাহাবীরা পেট ভরে রুটিটার প্রায় পুরো অংশ খেয়ে নিলেন। এরপর দশজন দশজন করে সাহাবারা প্রবেশ করতে থাকলেন। তাঁরা সবাই খেলেন এবং কেউ কাউকে খাবারের সময় লক্ষ্যও করলেন না। তাঁরা সবাই পেট ভরে খেলেন। এরপর নবীজি (সা) আবু তালহা, উম্মে তালহা এবং আনাসকে ডাকলেন। তাঁরা এসে তাঁর সাথে বসলেন। নবীজি (সা) তাঁদের বললেন, “খাও।” তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে পেট ভরা পর্যন্ত খেলেন। এরপর নবীজি (সা) হাত

উঠিয়ে রুটির মাঝখানে যেখানে হাত রেখেছিলেন সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ “হে উম্মে সুলাইম, তোমার দেয়া খাবারের এই অংশটা কোথায়?” উম্মে সুলাইম বললেনঃ “আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক, হে রাসূলুল্লাহ। আমি যদি আপনার সঙ্গীদের এখান থেকে খেতে না দেখতাম তাহলে বলতাম, এখান থেকে কিছুই কমে নি।”

এরপর উম্মে সুলাইম (রা) বাকি খাবারগুলো জড়ো করে তাঁর প্রতিবেশীদের দিয়ে দিলেন।[45]

***এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) এই সুমহান সম্মানিত নবী ক্ষুধায় কষ্ট করলেন, এমনকি তাঁর চেহারায় ক্ষুধার ছাপ এবং কণ্ঠে ক্ষুধাজনিত দুর্বলতা প্রকাশ পেল। ইনিই সেই নবী যাঁর ওপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেনঃ “কল্যানময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন-বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ” [সূরা ফুরক্বানঃ ১০]।

এটা আল্লাহর হেকমতেরই অংশ যে, তাঁর বান্দা ও হাবিব মুহাম্মাদের (সা) কাছ থেকে দুনিয়াকে সংকুচিত করা হয়েছিল। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্ল চাইলেই নবীজির (সা) জীবন প্রাচুর্য দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর খলিল ও হাবিবের জন্য এই জীবনে অভাব, শ্রম ও দারিদ্র রেখে দিয়েছেন। এর পেছনের সুদূরপ্রসারী প্রজ্ঞাগুলো হচ্ছেঃ

ক) যাতে নবী কারীম (সা) তাঁর এই সুমহান রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করতে পারতেন দুনিয়ায় কোন প্রাপ্তি ছাড়াই। এতে কেউ কেউ বলার সুযোগ পেত যে, তাঁর এই দাওয়াত ছিল মূলত দুনিয়ার এই এই লাভ হাসিলের জন্য বা এই সম্পদ হাসিলের জন্য অথবা এই বিলাসিতা ভোগ করার উদ্দেশ্যে। নবীজি (সা) নিজেই দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহর বাণী পৌঁছেছেন এবং জিহাদ করেছেন। তিনিই তাঁর উম্মতকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, দুনিয়ার সম্পদভাণ্ডার তাদের সামনে উন্মুক্ত হবে, অথচ তিনি নিজেই দুনিয়ায় কোনরকম জীবন নির্বাহ করেছেন। কিন্তু এরপরও তিনি কাউকে তার দুনিয়ার ভাগ থেকে বঞ্চিত করেন নি, আর না অন্যদের বাদ দিয়ে নিজে উদ্বৃত্ত সম্পদ ভোগ করেছেন।

খ) নবী কারীমের (সা) বিলাসিতাহীন জীবনের পিছে আল্লাহর এই হেকমতও ছিল যে, সম্পদ যেন নবীজি (সা) এবং মানুষের মধ্যে দেয়াল না হয়ে দাঁড়ায় অথবা সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে তিনি যেন মানুষ থেকে গাফেল না হয়ে যান। তিনি তাদের সাথে তাদের একজন হয়েই বসতেন; তারা যেভাবে জীবনধারণ করত, তিনিও সেভাবেই জীবনধারণ করতেন; তারা যা কষ্টভোগ করেছে, তিনিও একই কষ্টভোগ করেছেন। লোকেরা যখন তাঁর কাছে আসত, তারা মূলত একজন নবীর কাছেই আসত যিনি তাদের মতই ক্ষুধার্ত থাকতেন, দুনিয়ার জীবনে তাদের যে প্রাপ্তি ছিল, তাঁর প্রাপ্তিও তদ্রুপ ছিল। নবী কারীমের (সা) এই অভাব ও সারল্য ছিল মানুষের সাথে বিশেষ করে অনেকের যাদের অবস্থা ছিল নবীজির (সা) মতই তাদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক কায়েমের একটি ভিত্তি।

গ) নবীজির (সা) জীবনী যাতে দুনিয়ার অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য স্বান্তনার কারণ হয়। এই অভাবগ্রস্তদের সংখ্যা পৃথিবীতে অনেক। যারাই এই জীবনে অভাব ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যাবে তারা স্মরণ করতে পারবে যে, আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত সৃষ্টিও একইরকম কষ্ট ও অভাবের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন।

২) নবীজির (সা) হেদায়েত অথবা আদাবের মধ্যে এটা ছিল না যে, তিনি কাউকে কোন খাবারের দাওয়াতের জন্য নিয়ে যাবেন যেটাতে তাকে দাওয়াত দেয়া হয় নি। তিনি যদি কাউকে নিয়েই যেতে চাইতেন, তাহলে তিনি আগে দাওয়াত দানকারীর অনুমতি নিতে জিজ্ঞাসা করতেনঃ "একেও কি নিয়ে আসব?" যদি নবীজিকে (সা) কেউ অনুসরণ করত, তাহলে তিনি দাওয়াত দানকারীর অনুমতি নিতে বলতেনঃ "সে আমাকে অনুসরণ করেছে। তুমি যদিও চাও তাকে দাওয়াতে অংশ নেয়ার অনুমতি দিতে পার; আর যদি না চাও তবে সে ফিরে যাবে।"[4647]

এই ঘটনায় নবীজি (সা) আসহাবে সুফফাদের নিয়ে আবু তালহার (রা) নিকট উপস্থিত হলেন। তাদের সংখ্যা ৮০ জনেরও বেশি ছিল। আবু তালহা (রা) চেয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের জানা অথবা তাদের সঙ্গ ব্যতিরেকেই তাঁর ঘরে উপস্থিত হোক। এর কারণ, আবু তালহার কাছে খুব অল্প খাবার ছিল। তবে নবী (সা) এমনটি করেছেন কারণ তিনি জানতেন, তাঁর জন্য তাঁর রবের পক্ষ থেকে যে বরকত নাযিল হবে তা আবু তালহার প্রস্তুতকৃত খাদ্যের চাইতে পরিমাণে অনেক বেশি ও অধিকতর পরিতৃপ্তকারী হবে। আর সবাই আল্লাহর একটি নিদর্শনের সাক্ষী হতে পারবে।

৩) এটা লক্ষ্যণীয় যে, সম্মানিত নবী (সা) আসহাবে সুফফাদের সাথে বসে তাঁদের কোরআন শিখাচ্ছিলেন। অথচ তিনি সেসময় ছিলেন পরিশ্রান্ত আর এই পরিশ্রান্তির ছাপ তাঁর চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যে কেউ দেখলে ও শুনলেই বুঝতে পারত।

এই ক্ষুধা ও পরিশ্রান্তির তাঁর জন্য ওজর হতে পারত, কিন্তু মানুষকে হেদায়েত করা ও আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার আকাঙ্খায় তাঁর মহান হৃদয় এতটাই উপচে পড়ছিল যে, তিনি তাঁর এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ধৈর্য্যধারণ করেন এবং সকল কষ্টের অনুভূতি থেকে নিজেকে মুক্ত করেন।

সাহাবীদের শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহপ্রদত্ত ওহী পড়ে শোনানোর ইবাদত ছিল নবীজির (সা) জন্য মানসিক পরিপোষণ যা মানুষ তাঁকে দিতে পারত নাঃ “ঘুমের মধ্যে আমার রব আমাকে খাওয়ান ও পান করান।”[48]

৪) এ ঘটনা থেকে নবী (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যকার গভীর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধন প্রকাশ পায়। নবী (সা) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন আর তাঁকে ঘিরে রেখেছিল ৮০ জনেরও বেশি গরীব সাহাবী যাঁদের তিনি কোরআন শিখাচ্ছিলেন।

যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বসে ছিলেন তাঁরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন, নিকটাত্মীয়দের বিচ্ছেদ, কৃচ্ছ জীবনযাপন, সকল আরাম-আয়েশ ত্যাগ করার কষ্ট সহ্য করে; কেননা রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখে তাঁদের চোখ জুড়াতো। আর নবীজিও (সা) তাঁর সর্বসত্ত্বা দিয়ে তাঁদের বরণ করে নেন, তাঁদের জন্য ধৈর্য্যধারণ করেন এবং নিজের অবস্থা ও সম্পদ দিয়ে তাঁদের সাহায্য করেন।

যখন তাঁকে অল্প খাবারের দাওয়াত দেয়া হল, তাঁর সুমহান চরিত্রের সাথে এটা যায় নি যে, তিনি এই সাহাবীদের ছাড়াই সেই দাওয়াতে যাবেন অথবা তাঁদের তাঁর আশপাশ থেকে চলে যাওয়ার অপেক্ষা করবেন এবং এরপর একা একা পেটপুরে খাবারে স্বাদ উপভোগ করবেন। বরঞ্চ তিনি তাঁদের নিয়েই দাওয়াতে গেলেন, তাঁদের জন্য আল্লাহর বরকতের প্রার্থনা করলেন, যেভাবে তাঁর ভাই ঈসা (আ) তাঁর হাওয়ারীদের জন্য খাবারভর্তি টেবিল নাযিল হওয়ার দোয়া করেছিলেন।

৫) নবী (সা) যখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি আনাস বিন মালিকের (রা) হাত নিজের বরকতময় হাতে ধরে রেখেছিলেন আর তাঁর চারপাশে ছিলেন ৮০ জনের মত সাহাবী। আনাসের বয়স তখন দশের মত আর

নবীজির (সা) বয়স পঞ্চাশের ঘরে। নবী (সা) এবং বালক আনাস বিন মালিকের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভিন্ন প্রজন্মের মধ্যকার সম্পর্কের সবচেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত। বয়সের পার্থক্য কখনো সাহাবাদের প্রজন্ম ও রাসূলুল্লাহর (সা) মধ্যে দূরত্বের কারণ হয় নি।

এই মহৎ প্রশিক্ষণমূলক তাৎপর্য এবং আগের ও পরের প্রজন্মের মধ্যকার এই দৃঢ় সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো মজবুত করে। এর ফলে সামাজিক পরিবর্তনের পথ সুগম হয়, ভঙ্গুর ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী হয় না।

৬) আনাস তাঁর পিতা আবু তালহার থেকে কঠোর নির্দেশনা ও চূড়ান্ত সাবধানতা অবলম্বনের আদেশ পেয়েই নবীজির (সা) কাছে এসেছিলেন। আনাস জানতেন তাঁর বাবা-মায়ের কাছে অল্প কিছু খাবার রয়েছে। তাঁর বাবা যতটুকু পারা যায় সাবধান করে দিয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু এরপরও নবী (সা) আনাসকে যা যা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, আনাস সেগুলোর সত্য জবাব দিলেন। মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়াও আনাসের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশ্নের মিথ্যা জবাব দেয়ার চেয়ে সহজতর ছিল। আনাস যদি সত্য জবাব দিতেন, তাহলে তাঁকে প্রচন্ড কাঠিন্য এবং চূড়ান্ত দুশ্চিন্তায় পড়তে হত। কিন্তু সেটা তার জন্য সহজতর ছিল মিথ্যার ভুলে নিজেকে জড়িয়ে নিজের সত্যবাদিতাকে ধ্বংস করার চাইতে, যে সত্যবাদিতার শিক্ষায় তিনি বড় হয়েছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাঁরা তো নববী মাদ্রাসারই ছাত্র। আর এসব সত্যবাদীতার গুণ তাঁরা নবী (সা) থেকেই পেয়েছেন, যিনি তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তাঁদের রবের এই আয়াত দিয়েঃ “হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।” [সূরা তাওবাঃ ১১৯]।

৭) সাহাবাদের এই বড় দলের সামনে যে মোজেযা ঘটেছে, যা দেখে তাঁদের চোখ জুড়িয়েছে এবং তাঁদের সবাই যে মোজেযার সাক্ষী ছিলেন, সেই মোজেযা সত্য অস্বীকারকারীদের সামনে হয় নি। তাঁদের প্রত্যেকেই আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদকে (সা) রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মেনে ঈমান এনেছিলেন। এই মোজেযা ছিল তাঁদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত যা তিনি তাদের সামনে ঘটান, যাতে তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মোজেযাসমূহ মূলত ঈমানদারদের অন্তরেই সংঘটিত হত, পবিত্র এক ক্ষেত্রে (অন্তর) এসব মোজেযা প্রভাব ফেলত, ফলে তা কেঁপে উঠত এবং তাতে ঈমান বৃদ্ধি পেত। ফলে

তা থেকে সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপাদিত হত। এই ঘটনায় যে মোজেযা দেখা যায় তা সাহাবাদের ঈমানের জন্য যেমন সহায়ক ছিল, তেমনি ছিল তাঁদের ক্ষুধার নিবারণকারী।

৮) আবু তালহা (রা) যখন এই বিশাল সংখ্যক সাহাবীর আগমনের খবরে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং তাঁদের খাওয়ানোর মত খাবার তাঁর কাছে ছিল না, তখন তিনি পরামর্শ করার জন্য নিজ স্ত্রী উম্মে সুলাইমের (রা) কাছে গেলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিকারিণী। তিনি সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতেও অবস্থান করছিলেন না, যেমনটা করছিলেন রাসূলকে (সা) দাওয়াত দেয়া তাঁর স্বামী আবু তালহা (রা)। তাঁকেই রাসূল (সা) ও সাহাবীদের স্বাগত জানাতে ও খাওয়াতে হত। সেজন্য উম্মে সুলাইম সে অবস্থায় সমস্যা পর্যবেক্ষণে অধিকতর ঠান্ডা মাথার পরিচয় দেন এবং স্বামীকে চূড়ান্ত ও প্রশান্তিমূলক জবাব দেনঃ “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।” অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) ভালো করেই জানেন আমাদের কাছে কি আছে। আবু তালহার ঘর রাসূলের (সা) অন্যান্য ঘরের মতই ছিল, কারণ রাসূল (সা) খুব ঘন ঘন আবু তালহার পরিবারের কাছে যেতেন।

উম্মে সুলাইম তাঁর জবাবের মাধ্যমে সমস্যার ইতি ঘটালেন, সমস্যার আনুষঙ্গিকতাও থামিয়ে দিলেন। তিনি সমস্যাটিকে সুমহান সত্ত্বার ওপর অর্পণ করলেন। বড় বড় সত্ত্বারাই তো বড় বড় সমস্যার সমাধান করবেন!

৯) রাসূলুল্লাহ (সা) আনাসকে যে ডাক দিলেন, “হে আমার সন্তান! তোমাকে কি তোমার পিতা পাঠিয়েছেন?” এখানে যে পিতৃত্ব ফুটে উঠেছে সে পিতৃত্ব রাসূল (সা) তাঁর সব সাহাবীদের জন্যই দেখাতেন। রাসূলের (সা) এই ডাক যেন আনাসের কানে বাজছিল এবং তা তাঁর পুরো সত্ত্বাকে ভালোবাসা, দয়া ও রাসূলের (সা) নিকট এই বিশেষ নৈকট্যের আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল। আবার আবু তালহা (রা) আনাসকে ডেকে বলেছিলেন, “হে আমার সন্তান! রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে বল, আমার পিতা আপনাকে দাওয়াত করেছেন।” এখানে আবু তালহা নিজের জন্য যে পিতৃত্ব নির্ধারণ করে নিয়েছিলে, সেটা ছিল মূলত আনাসকে প্রতিপালন ও অনুগ্রহ উৎসরিত পিতৃত্ব। আনাস তাঁর আপন ছেলে নয়, সৎ ছেলে ছিল। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, কিভাবে নবীজি (সা) তাঁর সাহাবাদের সাথে পিতাস্বরূপ আচরণ করতেন। তাঁর এই পিতৃত্বের গুণ উপচে পড়ে তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল। নববী সমাজ ছিল বন্ধন, আবেগ, ভালোবাসা ও রহমতে পরিপূর্ণ একটি পরিবার।

১৯ । পতাকা

খাইবারের উপত্যকাগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায়, এগুলোতে খুব সহজেই বড় বড় খেজুরের বন জন্মাতে পারত। একইসাথে পাহাড়ের চূড়াসমূহও ইহুদীদের দুর্গগুলোকে অভেদ্য করে তুলেছিল। ইহুদীদের সাথে এই দুর্গগুলোর পেছন থেকেই যুদ্ধ করতে হত। রাসূলুল্লাহ (সা) এসব দুর্গগুলোর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে অভেদ্যটিকে অবরোধ করেছিলেন, যেটার নাম ছিল কামুস দুর্গ। অবরোধ দীর্ঘ হল। প্রায় দশদিনের একটু বেশি সময় ধরে চলছিল এই অবরোধ। দুর্গটি জয় করার একটির পর একটি চেষ্টা চলছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নেতৃত্বের পতাকা আবু বকরের (রা) হাতে তুলে দিলেন, তিনি যুদ্ধ করলেন এবং সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও দুর্গ জয় করতে না পেরে ফিরে এলেন। এরপর পতাকা উমার বিন খাত্তাবের (রা) হাতে দেয়া হল। তিনিও সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে দুর্গ জয় করতে পারলেন না। এরপর তিনি এক রাতে বললেনঃ “আমি আগামীকাল পতাকা এমন একজনের হাতে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসে। সে পিছু হটার লোক নয়। আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় না দেয়া পর্যন্ত সে ফেরত আসবে না।”

সে রাত লোকজন কাটালো এই জল্পনা কল্পনা করে যে, এই পতাকা কাকে দেয়া হবে, যিনি কিনা এসব গুণের অধিকারী এবং যার হাতে বিজয় দেয়া হবে, তাদের মধ্যে কে এই লোক? প্রত্যেকেই এই সম্মানের অধিকারী হতে চাইল। রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যেসব সাহাবীর বিশেষ মর্যাদা ছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন রাসূলের (সা) ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সেই লোকটি হতে। এমনকি উমারও (রা) বললেন, “সেদিনের মত আমি কখনোই নেতৃত্ব কামনা করিনি।” তবে এমন একজন ছিলেন যিনি এই সম্মান কামনা করেন নি, কিন্তু লোকেরা তাঁর জন্য এই সম্মান কামনা করেছিল। তিনি এই নেতৃত্বের আশা করেন নি, তবে লোকেরা তাঁর নেতৃত্বের আশা করছিল। এটা তাঁর চারিত্রিক গুণে কোন ঘাটতির জন্য নয়। তিনি সব ধরনের চারিত্রিক গুণই নিজের মধ্যে জড়ো করেছিলেন। তাঁর শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে বসে থাকার জন্য নয়। তিনি কল্যাণের পথে ছিলেন দ্রুতগামী ও অগ্রগামী। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা সেসময় পতাকা বহন ও যুদ্ধ পরিচালনার উপযুক্ত ছিল না। তাঁর

সেসময়কার দিনগুলো প্রচন্ড নেত্রদাহে কাটছিল। তাঁর চোখে অন্ধকার নেমে এসেছিল, তিনি কিছুই দেখছিলেন না।

পরদিন সকালে সকলেই রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গেল। সবাই আশা করছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকেই পতাকা দেবেন এবং তিনি সম্মানের অধিকারী হবেন। রাসূলুল্লাহ বললেনঃ "আলী বিন আবী তালিব কোথায়?" সাহাবারা জবাব দিলেনঃ "তিনি চোখের সমস্যায় ভুগছেন।" সবাই ভাবলেন, পতাকা হয়তো এমন কাউকেই দেয়া হবে যার কোন সমস্যা নেই। রাসূলুল্লাহ যখন বললেনঃ "তাঁকে ডেকে পাঠাও", আলীকে (রা) নিয়ে আসা হল, তিনি তখন কিছুই দেখছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) আলীর (রা) মাথাকে তাঁর পবিত্র কোলে রাখলেন। এরপর তাঁর পবিত্র লালার কিছু অংশ হাতে নিলেন এবং তা দিয়ে আলীর (রা) চোখ দুটো ঘষে দিলেন। আলী (রা) সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন যেন তাঁর চোখে কোন সমস্যাই ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দিকে পতাকা এগিয়ে দিয়ে বললেনঃ "সামনে আগুয়ান হও এবং পিছনে ফিরে তাকিয়ো না যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করেন।"

আলী (রা)) পতাকা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন এবং লোকেরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করল। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি তাঁর জায়গায় দাঁড়ালেন এবং পিছন দিকে না ফিরে সর্বোচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আমি কিসের ভিত্তিতে মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করব? আমি কি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়?" নবীজি (সা) বললেনঃ "ধীরে অগ্রসর হও, যতক্ষণ না তাদের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হও। এরপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করবে। এরপর তাদের তাদের ওপর আল্লাহর কি কি অধিকার আছে তা শোনাবে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি তোমার একজনকেও হেদায়েত দান করেন, তাহলে সেটা তোমার জন্য লাল উটের থেকেও উত্তম।"

এরপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রিয় ব্যক্তি পতাকা নিয়ে ছুটে চললেন এবং ইহুদীদের দুর্গের নিচে পৌঁছে তা গেঁথে দিলেন। এরপর তিনি তাঁদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন এবং তাদের ওপর আল্লাহর অধিকার সুস্পষ্ট করলেন। কিন্তু ইহুদীরা লড়াইয়ের পথ বেছে নিল। আলীও (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন আর তিনি ছিলেন প্রচন্ড শক্তির অধিকারী। লড়াইয়ের ময়দান থেকে তিনি কখনো পিছু হটতেন না। আল্লাহ সেদিন তাঁকে বিজয় দান করলেন আর সেদিন তাঁর চোখও ভালো হয়ে গিয়েছিল।[49]

***এই ঘটনায় লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) মুসলিমরা যখন ইয়াহুদীদের মোকাবেলা করছিল তাদের কাছে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল একদম স্পষ্ট ও আলোর মত পরিস্কার। মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছিল। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং কঠোর শত্রুতার সাত বছরের তিক্ত স্মৃতি ফিরে আসছিল। এর মধ্যে ছিল বনু কাইনুকার উস্কানী থেকে শুরু করে বনু নাযীরের চক্রান্ত ও বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা। এ ছিল ইহুদীদের একের পর এক শত্রুতা ও যুদ্ধের তিক্ত পরম্পরা। এরপরও প্রতিশোধস্পৃহা মেটানো মুসলিমদের এই যুদ্ধ ও মোকাবেলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না।

মুসলিমরা খাইবার পর্যবেক্ষণ করছিল। তাদের চোখের সামনে খাদ্যের এক বিশাল ভান্ডার বিস্তৃত ছিল, যা খাইবারের উপত্যকাসমূহের খেজুরের বনগুলো ধারণ করছিল এবং এই বনের দৃষ্টিসীমা যেন শেষ হতে চায় না। তাদের চোখের সামনে ছিল খাইবারের দুর্গসমূহ যা স্তূপের পর স্তূপ স্বর্ণ ও রৌপ্য লুকিয়ে রেখেছিল। ইয়াহুদীরা এসব সংগ্রহ ও পুঁজিকরণে দক্ষ ছিল। কিন্তু সাহাবীদের যুদ্ধের লক্ষ্যে এসব কিছুই উপস্থিত ছিল না যদিও তাঁরা দারিদ্র ও চাহিদার কষাঘাতে জর্জরিত ছিলেন।

মুসলিমদের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ ও সম্পদের লোভের অনেক উর্ধ্বে। আর সেটা ছিল মানুষের হেদায়েত লাভ, তাদেরকে তাদের রবের ইবাদত করানো, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই রবের হক আদায় করানো। এটা আল্লাহরই ফয়সালা ছিল যে, আলী (রা) কিছুদূর যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আলাপ করে নেন। তিনি চিৎকার করে রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করেন এবং নবীজিও (সা) উচ্চস্বরে তাঁর প্রশ্নের জবাব দেন যাতে উপস্থিত প্রত্যেকেই শুনতে পায় এবং অন্তরে গেঁথে নেয়ঃ “আল্লাহ যদি তোমার হাতে একজনকেও হেদায়তে দেয় তাহলে তা তোমার জন্য একটি লাল উটের চেয়েও উত্তম।” সেসময় লাল উট অর্জন ও তার চাষ করার চেয়ে অধিকতর সম্মানজনক, মূল্যবান ও বিস্ময়কর সম্পদ আরবদের কাছে আর ছিল না। কিন্তু এর চেয়েও উত্তম ছিল কোন মানুষের হেদায়েত, যে তার অন্তর দিয়ে আল্লাহর দিকে মুখ ফেরাবে।

২) পতাকাধারী যাঁর হাতে আল্লাহ খাইবারে বিজয় দান করবেন, নবীজি (সা) তাঁর উল্লেখ করেন, কিন্তু তিনি তাঁর সাথে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাকে উল্লেখ করেন নি। অথচ তিনি ছিলেন নবীজির (সা) চাচাতো ভাই ও

আত্মীয়। তিনি নিজের কাছে তাঁর মর্যাদা দিয়েও তাঁর উল্লেখ করেন নি অথচ তিনি ছিলেন নবীজির (সা) মেয়ের স্বামী। তিনি বরং তাঁর মানসিক ও নেতৃত্বমূলক যোগ্যতার উল্লেখ করেছেনঃ

ক) সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। এ ভালোবাসা ছিল বাস্তব ও পরিপূর্ণ। নইলে তো প্রত্যেক মুসলিমই তো আলীর (সা) সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সাধারণ ভালোবাসায় শরীক।

খ) আলী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পরিপূর্ণ অনুসরণ বাস্তবে করে দেখিয়েছেন আর এজন্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আলীকে (রা) ভালোবাসতেন। "বলঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর। তবে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।" [সূরা আলে ইমরানঃ ১৩]।

গ) আলী (সা) ছিলেন সাহসী যিনি মোকাবেলা থেকে পিছু হটেন না। সাহসের আবাস আলীর (রা) অন্তর ছাড়া আর কোথায়ই বা হতে পারে! এই মহান যোগ্যতা ও সম্মানজনক গুণাবলীর কারণেই আলীর (রা) দরকার ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। এসব গুণাবলী ও যোগ্যতা তাঁকেই সামনে ঠেলে দিচ্ছিল, কিন্তু তিনি নেতৃত্বের আকাঙ্খী ছিলেন না। বিজয়ীর তকমা তাঁরই প্রাপ্য হল, কিন্তু তিনি বা তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা এটি চিন্তাও করতে পারে নি।

নবী (সা) "আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করবেন" – এই কীর্তি বর্ণনা করার সাথে সাথে এর সাথে সেই জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাগুলোও তুলে ধরেছেন। জাতি এবং সমাজের সফলতার জন্য প্রয়োজন দায়িত্ব প্রকৃত যোগ্য, দক্ষ এবং উপযুক্ত লোকদের হাতে তুলে দেয়া। একইভাবে পক্ষপাতিত্বের জের ধরে অযোগ্য লোকদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেয়া ব্যর্থতার জন্য দায়ী। "যখন অযোগ্য লোকদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয়া হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করো।"[50]

৩) নবীজির (সা) সাহাবীদের মধ্যে কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতার মেজাজ। নেতৃত্ব ও দায়িত্ব তাঁদের জন্য লোভনীয় কিছু ছিল না। নবী (সা) যখন এসব গুণের কথা উল্লেখ করলেন, তাঁরা এই গুণের অধিকারী হতে চেয়েছিলেন মাত্র এবং পুরো রাত নিজেদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা করে কাটিয়ে দিলেন। সকালে তাঁরা সবাই রাসুলুল্লাহর (সা) কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেই চাচ্ছিলেন পতাকাটি তাঁর হাতে তুলে দেয়া হোক। তাঁদের সবার অবস্থা উমারের (রা) কথায় ফুটে উঠেছেঃ "আমি সেদিন ছাড়া কখনোই নেতৃত্বের লোভ

করিনি।” তাঁরা মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার লোভই করছিলেন। “তাঁরা কল্যাণের দিকে ছুটে যায় এবং তাতে অগ্রগামী” [সূরা মু’মিনূনঃ ৬১]।

৪) আমীরুল মু’মিনীন আলীর (রা) জন্য সৌভাগ্য। তাঁর দুই পা ময়দানে ছুটে চলছে আর সুমহান অধিপতি তাঁকে ভালোবাসছেনঃ “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁকে ভালোবাসেন।”

২০। দুই হিজরতে অংশগ্রহণকারী

প্রায় ১৫ বছর পার হয়ে গিয়েছে জাফর বিন আবু তালিব, তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস এবং তাঁদের সাথে প্রথম হিজরতে অংশগ্রহণকারীগণ (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হন) দূরপ্রবাস হাবশায় বসবাস করছিলেন। তাঁদের এই হিজরত ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। অবশেষে নবীজি (সা) আমরু বিন উমাইয়্যা আয-যামরীকে (রা) নাজ্জাশীর কাছে পাঠালেন সেখানে হিজরতকারী সাহাবীদের রাসূলের (সা) কাছে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। ফলে হাবশায় হিজরতকারীগণ সাগর পাড়ি দিয়ে সপ্তম হিজরী সালে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে মদীনায় ফিরে এলেন। তাঁদের দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুসলিমগণ প্রচন্ড খুশি হলেন। প্রত্যাবর্তনকারীগণও সমাদরের সাথে মদীনায় পৌঁছালেন এবং নিজেদের চোখ জুড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁদের মুহাজির ও আনসার ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে অত্যন্ত খুশি হলেন।

একদিন আসমা বিনতে উমাইস (রা) উম্মুল মু'মিনীন হাফসার (রা) কাছে গেলেন। আসমা ছিলেন একদম প্রথম দিকে হাবশায় হিজরতকারীদের একজন। তিনি যখন হাফসার (রা) নিকট অবস্থান করছিলেন, তখন উমার (রা) তাঁর কন্যা হাফসার (রা) কাছে এলেন এবং আসমাকে (রা) তাঁর নিকট বসা অবস্থায় পেলেন। উমার বললেন, "ইনি কে?" আসমা উত্তর দিলেনঃ "আমি আসমা।" উমার বললেনঃ "এ কি সাগর পাড়ি দেয়া? এ কি হাবশী?" অর্থাৎ সে কি সাগর পাড়ি দিয়ে হাবশা থেকে এসেছে? আসমা উত্তর দিলেনঃ "হ্যা।" উমার বললেনঃ "আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হিজরত করে তোমাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছি। তাই রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি আমাদের হক বেশি।" আসমা এ কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেন, "কখনোই না। আল্লাহর শপথ! আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন। তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের খাইয়েছেন এবং আপনাদের মধ্যকার অজ্ঞদের শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা দূরদেশ হাবশাতে ছিলাম যেখানে আমাদের ঘৃণা করা হত। আমাদের কষ্ট দেয়া হত এবং আমরা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলাম। সেগুলো তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খাতিরেই ছিল। আল্লাহর শপথ! আমি কিছুর স্বাদ গ্রহণ করব না, কিছু পানও করব না, যতক্ষণ না আপনি আমাকে যা

বলেছেন তা রাসূলুল্লাহকে (সা) বলছি এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব। আল্লাহর শপথ! আমি মিথ্যা বলব না, ঘুরিয়েও কিছু বলব না, কোন কিছু যোগও করব না।"

এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আসলেন, আসমা বললেনঃ "হে আল্লাহর নবী, উমার বলেছেনঃ আমরা হিজরতের দিক দিয়ে তোমাদের চেয়ে এগিয়ে আছি। রাসূলুল্লাহর ওপর তোমাদের চেয়ে আমাদের হক্ব বেশি।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "তুমি তাঁকে কি বললে ?" আসমা বললেনঃ "আমি বলেছিঃ "কখনোই না। আল্লাহর শপথ! আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন। তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের খাইয়েছেন এবং আপনাদের মধ্যকার অজ্ঞদের শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা দূরদেশ হাবশাতে ছিলাম যেখানে আমাদের ঘৃণা করা হত। আমাদের কষ্ট দেয়া হত এবং আমরা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলাম। সেগুলো তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খাতিরেই ছিল।""" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "তোমাদের চেয়ে উমারের আমার ওপর অধিকতর অধিকার নেই। উমার ও তাঁর সাথীদের জন্য একটি হিজরত। আর তোমরা যারা জাহাজ আরোহণকারী তাদের জন্য রয়েছে দুটো হিজরত।" অর্থাৎ হাবশায় হিজরত ও মদীনায় হিজরত।

রাসূলুল্লাহর (সা) এই সুসংবাদ প্রদানে আসমা (রা) ও তাঁর সঙ্গে যাঁদের দুই হিজরত করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাদের খুশি আর কে দেখে! তাঁরাই বরং এগিয়ে আছে, তাঁদের চেয়ে অন্যরা এগিয়ে নেই। আসমা খুশিতে রাসূলের (সা) দেয়া এই সুসংবাদ প্রচার করতে ও ছড়াতে লাগলেন। ফলে আসমার (রা) সাথে হাবশা থেকে হিজরত করে আসা সাহাবীরাও এ সুসংবাদের কথা জেনে গেল। তাঁরা দলের পর দল আসমার (রা) কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে কি বলেছেন সে ব্যাপারে জানতে চাইল। আসমা (রা) তাঁদের রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত যে সুসংবাদ শোনালেন এর চেয়ে খুশির ও শ্রেষ্ঠ ব্যাপার তাঁদের কাছে আর কিছু ছিল না। আসমা বললেনঃ "আমি আবু মূসাকে দেখলাম হাদীসটি আমার থেকে জিজ্ঞাসা করে নিলেন।"[51]

***আমরা সবরুন জামীলের সোনালী ইতিহাসের একটি পাতায় দেখি যেখানে জাফর (রা) এবং তাঁর স্ত্রী আসমা (রা) এই দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মু'মিনদের এই দল লম্বা সময় এমন একটি দূর দেশে কাটিয়েছে, যার জনগণের দ্বীন ও ভাষা তাঁদের দ্বীন ও ভাষার চেয়ে আলাদা ছিল। তাঁরা মদীনায় আসেন নি, যতক্ষণ না পর্যন্ত নবী (সা) তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর দিকে ছুটে গিয়েছেন, দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নয়, বরং আত্মত্যাগ ও অবদানের নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য। জাফর (রা), যিনি সাত

বছর পর মুসলিমদের কাছে ফিরেছিলেন, তিনি কয়েক মাস পরেই আল্লাহর পথের মুজাহিদ হিসেবে মু'তার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শহীদ হন। আর তাঁর স্ত্রী আসমাকে (রা) পরবাসে থাকার বেদনার পর আপনজন হারানোর বেদনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এ ধরনের জীবন ছিল আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত।

*যে ধরনের মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণ জীবনযাপন করতেন তা সতিই অবাক করার মত। তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) আনুগত্য এবং কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকতেন। এই অবস্থা উমারের (রা) কথাতেই ফুটে ওঠেঃ "আমরা হিজরতের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছি।" এবং তাঁর এই কথাতেওঃ "আমি কখনোই ভালো কাজের প্রতিযোগিতায় আবু বকরকে হারাতে পারিনি।" মুহাজিরদের মধ্যে যাঁরা গরীব ছিলেন তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অভিযোগ করেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! বিত্তবানরা তো সওয়াবের দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। তারা আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের মত সাওম পালন করে, কিন্তু সম্পদ থাকার কারণে দান-সাদাকাও করতে পারে।" জাহাজ আহরণকারীদের (হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী) মধ্যে যে খুশি দেখা গিয়েছিল এবং যেটার ব্যাপারে আসমা (রা) জানতেন, সে প্রসঙ্গে আসমা বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) যে সুসংবাদ দিয়েছেন পৃথিবীতে সবকিছুর মধ্যে এর চেয়ে বড় খুশির ও শ্রেষ্ঠ জিনিস হাবশা প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য আর কিছু ছিল না।" এর অনেক প্রমাণ বিদ্যমান।[5253]

* প্রতিযোগিতার ময়দান ও ক্ষেত্র সৎকাজের ক্ষেত্রে অনেক প্রশস্ত ছিলঃ "এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত" [সূরা মুতাফফিফুনঃ ২৬]।

* আসমার এ অবস্থান অবাক করার মত। এটা স্পষ্ট যে, আসমা পরিপূর্ণ সচেতনতার সাথে তাঁর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিলেন। তাঁর পক্ষে উমারকে (রা) এ জবাব দেয়া সম্ভব ছিল যে, "আমার স্বামী যেদিন হাবশা গিয়েছিল আমি তাঁর সাথে গিয়েছি এবং এবং যেদিন তিনি হাবশা থেকে ফিরেছেন সেদিন আমি তাঁর সাথে ফিরেছি।" এমনটা বলাই তাঁর জন্য যথেষ্ট হতে পারত যদি তিনি একজন অনুসারীর ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু আসমা (রা) দৃঢ়তার সাথে সন্তুষ্টচিত্তে উমারের (রা) মোকাবেলা করেন। নিজের প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসের জন্যই তিনি কসম করে বলেন যে, তাঁর এবং উমারের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে তা তিনি রাসূলুল্লাহর (সা)

কাছে তুলে ধরবেন এবং তিনি সেটা করেছেনও। এসব কিছু থেকে প্রমাণিত হয় যে, আসমা (রা) তাঁর স্বামী জাফরের (রা) সাথে যে ভূমিকা পালন করেছেন এর গুরুত্বের প্রতি তাঁর ছিল চূড়ান্ত রকমের বিশ্বাস।

এ ব্যাপার থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয় আর তা হচ্ছে নারীরা নববী দাওয়াতী প্রকল্পে পরিতৃপ্তি এবং দায়িত্বসচেতনভাবেই সত্যিকার ভাবেই শরীক ছিল। এজন্য এ কাজে তাঁদের ভূমিকা ছিল প্রচুর, পবিত্র এবং বরকতময়। এমনটা কখনোই হত না, যদি নারী প্রান্তিক, অবরুদ্ধ এবং অনুসারীদের অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকত।

* উমারের (রা) ব্যাপারে আসমার কথা শুনে নবীজি (সা) সেটার জবাব দিতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করেন নি। তিনি আসমাকে (রা) জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি তাকে কি বললে ?" এরপর যখন তিনি বললেনঃ "আমি তাঁকে এই এই বলেছি।" রাসূলুল্লাহ (সা) আসমার (রা) জবাবকে অনুমোদন করলেন। এটা ছিল সাহাবীদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য নববী তারবিয়াতেরই একটি অংশ এবং নারীদের মতামতকে যে বিবেচনায় নেয়া যাবে সেটার বহিঃপ্রকাশ। এজন্যই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি উমারকে কি বললে ?"

* এ ঘটনায় পুরুষ ও নারীর মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারটিও ফুটে ওঠে। এ সম্পর্ক ছিল পরিপূর্ণ সংযম বজায় রেখে এবং কথাবার্তায় সীমাতিক্রম না করেই। কিন্তু এর মানে এই ছিল না যে, নারীদের প্রান্তিক অবস্থানে ফেলে রাখা হবে অথবা তার সাথে প্রয়োজনীয় লেনদেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। আর এজন্যই হাবশা থেকে জাহাজ করে প্রত্যাবর্তনকারীরা আসমার (রা) কাছে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) কথার ব্যাপারে জানতে চাইলেন। আর আসমাও (রা) তাঁদের রাসূলের (সা) কথা বর্ণনা করে শোনালেন। আবু মূসা আশ'আরী (রা) যখন রাসূলের (সা) কথাটি শুনলেন, তিনি খুশিতে আসমার (রা) কাছ থেকে হাদীসটি সংরক্ষণ করে নিলেন। নারীর শালীনতা এবং সতর মানে সক্রিয় জনজীবন থেকে অনুপস্থিতিকে জরুরী করে না।

২১) হে উসামা

তিনি সে যুদ্ধে মুজাহিদ হিসেবে বের হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তেজস্বী সত্ত্বা এবং জ্বালাময়ী উদ্দীপনার অধিকারী। তিনি ছিলেন তাঁর তারুণ্যের প্রারম্ভে এবং ওজস্বী, বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। তিনি হয়তো সেনাবাহিনীর সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন এবং প্রথমবারের মত যুদ্ধে অংশ নিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হতেন, তাঁর সাহস শত্রুদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে শত্রুর সবচেয়ে ক্ষতিকারী এবং সবচেয়ে প্রখর।

মুশরিক বাহিনীর মধ্যে একজন ছিল যখন বাহিনী আগুয়ান হত, সে হত তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর, আর যখন বাহিনী পিছু হটত, সে বাহিনীর ঢাল হয়ে দাঁড়াত। সে যখনই মুসলিমদের কাউকে টার্গেট করত, তাকে হত্যা করে ছাড়ত। উসামা (রা) এবং এক আনসারী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁরা যখন তাকে তাঁদের অস্ত্র দ্বারা ঘিরে ধরল এবং তাকে পরাস্ত করল, সে মুক্তি পাওয়ার জন্য চিৎকার করে বলে উঠলঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। এটা শুনে আনসারী সাহাবী তাঁর তলোয়ার সরিয়ে নিলেন। কিন্তু উসামা (রা) ভাবলেন, এ চিৎকার ছিল তলোয়ারের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য চিৎকার। সে এ চিৎকার দ্বারা মৃত্যু থেকে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব যখন মুসলিম ও মুশরিকরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত। তাই উসামা (রা) তাঁর বর্শাবিদ্ধ করে মুশরিকটিকে হত্যা করলেন। সেসময় তিনি আবৃত্তি করছিলেনঃ "সে তো আমাকে প্রতিপক্ষের জোশ ও বর্শার কথা মনে করিয়ে দিল/যুদ্ধের ময়দানে আগ বাড়ার আগেই তো জোশ এসে ভর করে।"

মুশরিক গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় বীরের পতন হল। মুশরিক বাহিনীও পরাস্ত হল। তাদের বাহিনী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দিকে পালাতে লাগল। তাদের পরাজয় নিশ্চিত হল। সংবাদদারা রাসূলুল্লাহকে (সা) বিজয়ের সুসংবাদ দিল, যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী কি মোকাবেলা করেছে সেটার বর্ণনা দিল এবং যুদ্ধে সেই মুশরিক হত্যার কাহিনীও বিবৃত করল, মৃত্যুর আগে সে কিসের আশ্রয় নিয়েছিল সেটাও বলল। রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর এর প্রভাব পড়ল। তিনি উসামা বিন যায়েদকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে বললেনঃ "সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর তুমি তাকে হত্যা করলে?!" উসামা (রা) জবাব দিলেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ, সে তলোয়ার ও নিহত

হওয়ার ভয়ে তা বলেছে।” রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ, সে নিহত হওয়ার ভয়ে বলেছে নাকি না ? !”

উসামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন, কেন সে হত্যার উপযুক্ত ছিল কারণ তার হাতে অনেক মুসলিম নিহত হয়েছিল। তিনি বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! সে মুসলিমদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে অমুক অমুককে হত্যা করেছে।” এরপর উসামা (রা) সেসব নিহত হওয়া মুসলিমদের নাম উল্লেখ করলেন যাঁদের রাসূলুল্লাহ (সা) চিনতেন। তাঁরা তাঁর সাহাবী ছিলেন যাঁদেরকে তিনি মসজিদে দেখতেন, পথিমধ্যে যাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হত। তাঁরা ছিল তাঁরই সৈনিক এবং তাঁরই পতাকাতলে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিল। নবী কারীমের (সা) আবেগকে দোলা দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এর দ্বারা এসব সাহাবীদের হত্যাকারীর অপরাধকে যেমন বড় করে দেখানো যেত, তেমনি সেই হত্যাকারীকে হত্যা করার যৌক্তিকতাও পেশ করা যেত।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এসব যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে উসামাকে (রা) বলেনঃ “তুমি কেয়ামতের দিন কি করবে যখন তার এই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ তোমার সামনে আসবে ?”

উসামা (রা) দেখলেন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ব্যাখ্যা বা ওযরকে তো গ্রহণ করেনই নি এবং তিনি যে রক্ত ঝরিয়েছেন সেটা হারাম হওয়া ও যে গুনাহ তিনি করেছেন সেটার প্রচন্ডতাকে সুপষ্ট করে দিয়েছেন। তখন উসামা (রা) নবীজিকে (সা) উদ্দেশ্য করে সেই সুপরিচিত অনুতাপের ভাষায় বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।”

উসামা (রা) অপেক্ষা করতে থাকলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলবেনঃ “আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ আবারো বললেনঃ “তুমি কেয়ামতের দিন কি করবে যখন তার এই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ তোমার সামনে আসবে ?” উসামাও আবার বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জবাবে তাঁর আগের কথাই কোন কিছু যোগ করা ছাড়াই পুনরাবৃত্ত করলেনঃ “তুমি কেয়ামতের দিন কি করবে যখন তার এই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ তোমার সামনে আসবে ?” উসামা প্রচন্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হতে লাগল, এই মুহূর্তের আগে তিনি যেন

ইসলাম গ্রহণ না করলেই ভালো হত! নতুন করে ইসলাম গ্রহণ তাঁর আগের সব গুনাহ মুছে দিত এবং তিনি তাঁর আগের গুনাহ থেকে নিরাপদ হয়ে যেতেন।

নববী শিক্ষার এই প্রভাব উসামার (রা) অন্তরে খুব গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এর পর থেকে প্রত্যেকটি ফিতনায় জড়ানো থেকে তিনি সবচেয়ে সংযমতা পালন করেন এই ভয়ে যে এই ফিতনায় নিহতদের মধ্যে এমন লোক থাকবে যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সাক্ষ্য দিয়েছে। এমনকি সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) তাঁর সম্মানজনক অবস্থান, অগ্রগামীতা ও বেশি বয়স সত্ত্বেও বলতেনঃ “উসামা কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে না লড়া পর্যন্ত আমি ঐ মুসলিমের বিরুদ্ধে লড়তাম না।” এর কারণ ছিল মানুষের রক্ত ঝরে এমন কাজে বিভ্রান্তি থেকে উসামার (রা) কঠোরভাবে বেঁচে থাকা ও সাবধানতা অবলম্বন করা। আল্লাহর রহমত ও শান্তি নাযিল হোক তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের ওপর যিনি উত্তমরূপে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।[54]

১) এই অভিযানে অংশ নেয়ার সময় উসামার (রা) বয়সটা লক্ষ্যণীয়। এ বয়সের একজন বালক যে একটি সুস্পষ্ট ভিশন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সাথে যুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করেছে এটাই বিস্ময়কর। এটাও বিস্ময়কর যে, তিনি এটার আশঙ্কাও করেন নি যে, জিহাদের ময়দানে ছুটে যাওয়ার আগে মানসিক গঠন ও প্রস্তুতি প্রয়োজন। সেই সাথে গভীর বিশ্বাস ও আত্ম-পর্যবেক্ষণের উচ্চতর পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ও রূহানী প্রস্তুতিও প্রয়োজন, যাতে কেউ ঈমানী বলে বলীয়ান সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করার যোগ্য হতে পারে।

এছাড়া নবী (সা) উসামাকে (রা) যে তিরস্কার করলেন এ থেকে এই তিরস্কারের প্রাপক উসামার (রা) বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্বতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমনটা মনে হওয়া উচিত নয় যে, নবীজির (সা) তিরস্কারের এই ধরন ১৬ বছর বয়সের এক বালককে উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে। উসামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) এই কথাকে যুগ যুগ ধরে মনে রেখেছিলেন। সেই বয়সেই উসামার (রা) যে বিবেচনা শক্তি তা অবাক করার মতই।

এসবই নববী তারবিয়াতের ছাপ যা অন্তরকে শক্তিশালী ও উত্তমভাবে গড়ে তোলে।

২) রাসূলুল্লাহর (সা) এই হাদীসে যা সাব্যস্ত করেছেন তার গুরুত্বও লক্ষ্যণীয় আর এই সাব্যস্তকৃত বিষয় হচ্ছে নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরানো নিষেধ হওয়া এবং তা থেকে বিরত থাকা, এই হত্যাকে যতই অনুপ্রেরণাদায়ক এবং ন্যায্য মনে হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এই বিষয়টিকে সাহাবাদের মনে স্পষ্টভাবে গেঁথে

দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এই কথা তাঁদের জন্য এমন এক দুর্ভেদ্য নিবৃত্তকারী ছিল যে, সাহাবীদের পক্ষে এর লংঘন বা একে হালকা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এই হাদীসেই, আনসারী সাহাবীটি মুশরিক লোকটিকে হত্যা থেকে নিজেকে নিরস্ত করেন, যদিও উসামার (রা) মত তিনিও লোকটিকে মুসলিম বাহিনীর ভালো ভালো সদস্য হত্যা করতে দেখেছিলেন। তিনিও এসব দেখে উসামার (রা) মতই উত্তেজিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখনই মুশরিকটির শাহাদাতের চিৎকার শুনলেন, তিনি তার থেকে নিজের তলোয়ার নিবৃত্ত করে নিলেন এবং তাকে পরাস্ত করার পর নিজেকে নিরস্ত করলেন।

একইভাবে মাসুম রক্তের অলংঘনীয়তার বিষয়টি এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, নবীজির (সা) কাছে বিজয়ের সুসংবাদের সাথে সাথে এই হত্যার খবরটিও বিশেষভাবে পৌঁছায়। উসামা (রা) যখন লোকটিকে হত্যা করেন, তখন তিনি নিজেও তাঁর অন্তরে কিছু একটা অনুভব করেন। এ সব কিছু থেকেই ফুটে উঠে যে, নবী (সা) এমনভাবে এই বিষয়বস্তু পরিষ্কারভাবে কোনরকম অস্পষ্টতা ছাড়াই তুলে ধরেন যে, সাহাবীদের অন্তরে তা গেঁথে যায়।

৩) উসামা বিন যায়েদ (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর নাতি। দত্তক গ্রহণ রহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত উসামাকে (রা) উসামা বিন যায়েদ বিন মুহাম্মাদ ডাকা হত। দত্তক গ্রহণ হারাম হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি আগের সে আগের আবেগানুভুতি এবং পিতৃত্বমূলক ভালোবাসা বজায় রাখেন। উসামা (রা) বাচ্চা থাকতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে তাঁর মুখ ধুইয়ে দিতেন আর বলতেনঃ “উসামা যদি মেয়ে হত তাহলে আমি তাকে অলঙ্কৃত ও পোশাকে সজ্জিত করতাম এবং তাকে বিয়ে দিয়ে দিতাম।” উসামা (রা) হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার কারণে তাঁর মুখমন্ডল আঘাতপ্রাপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মুখমন্ডল থেকে রক্ত মুছে দেন এবং রক্ত চুষে বের করে দেন। উসামা বড় হন, সেই সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁর প্রতি ভালোবাসাও বৃদ্ধি পায়। উসামার (রা) ব্যাপারে এটা বলা হত যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ভালোবাসার পাত্র এবং তাঁর ভালোবাসার পাত্রের পুত্র।[55]

নবীজি (সা) যে উসামাকে এভাবে তিরস্কার করলেন তার কঠোরতা আমরা বুঝতে পারব না যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উসামার (সা) অবস্থান ও মর্যাদার সাথে সেটাকে সম্পর্কিত না করব। এই অবস্থান ও মর্যাদা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। অতঃপর উসামা (রা) এই নিন্দা মেনে নেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এ প্রশ্ন ও নিন্দা “তুমি

কেয়ামতের দিন কি করবে যখন তার এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ তোমার সামনে আসবে?" – এর পর উসামা (রা) ক্ষমা প্রার্থনার বাইরে আর কিছুই বলেন নি। উসামা (রা) যা রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শুনতে চেয়েছিলেম কিন্তু তা শোনা ছাড়াই সেই মজলিস শেষ হয়। অথচ এ ধরনের ভুলের জন্য কেউ যদি রাসূলুল্লাহর (সা) ক্ষমা প্রার্থনার সৌভাগ্য লাভ করত, তাহলে উসামাই (রা) প্রথম সে ব্যক্তি হতেন। আর সেজন্যই এই নববী তিরস্কার উসামার (রা) অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলে। এমনকি তিনি ভাবতে থাকেন, তিনি যদি সেদিনের আগে যদি ইসলাম গ্রহণ না করতেন তাহলেই ভালো হত যাতে ইসলাম তাঁর আগের সব পাপ বিলুপ্ত করে দিত। রাসূলুল্লাহর (সা) এই কথার প্রভাব উসামার (রা) মধ্যে বাকি জীবনভর থেকে যায় এবং তিনি এজন্য সুপরিচিত ও বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

৪) উসামার (রা) অবস্থান বিশ্লেষণ করলে তাঁর এই কাজের অনেক ওযর ও ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। উসামা সে ব্যক্তিকে যখন হত্যা করেন তখন সে মুশরিকদের সারিতে যোদ্ধা হিসেবে লড়ছিল, মুসলিমদের বিনাশ ও হত্যায় নিজের তলোয়ার ব্যবহার করছিল। উসামা (রা) দেখেছেন, কিভাবে ঐ লোকের তলোয়ারের আঘাতে রাসূলুল্লাহর (সা) ভালো ভালো সাহাবাগণ রক্ত ঝরিয়েছেন। উসামা (রা) দেখেছেন, কিভাবে লোকটি তার মুশরিক গোষ্ঠীকে বাঁচাতে প্রচেষ্টা ব্যয় করছিল। যখন তারা আক্রমণ করত, তখন সে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, আর যখন তারা পিছু হটত তখন সে ছিল তাদের রক্ষাকারী। যখন উসামা (রা) তার ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন, তখনো তার কাপড়ে লেগে থাকা নিহত সাহাবীদের রক্ত শুকায়নি। যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই মুশরিক প্রতিপক্ষের অস্ত্রের কাছে পরাস্ত হয়েছে, সে শাহাদাহ উচ্চারণ করে নি। সে যখন বাঁচার আশা ছেড়ে দিল, তখনই কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করল। সে এটা এমন অবস্থায় করল যা থেকে প্রমাণিত হয় সে নিহত হওয়া থেকে বাঁচতেই তা উচ্চারণ করেছিল, অন্তর থেকে বিশ্বাস করে নয়।

এরপরেও আমরা দেখি নবীজি (সা) এ ধরনের ব্যাখ্যার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং উসামাকে (রা) কঠোর তিরস্কারের মাধ্যে এটা স্পষ্ট করেছেন যে, কারো অন্তরে কি আছে সে ব্যাপারে একমাত্র গায়েবের মালিকই বিচার করতে পারেন। নবীজি বলেনঃ "তুমি তার অন্তর ফেঁড়ে দেখেছ, সে কি তা অন্তর থেকে বলছিল নাকি না?" এসব থেকে দেখা যায় যে, এই সকল ব্যাখ্যা বাস্তবতার নিকটবর্তী ও এর সাথে সঙ্গতিশীল হওয়া সত্ত্বেও এগুলোকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে এবং আসল কারণের ওপর দৃষ্টীনিবদ্ধ করা হয়েছে আর সেটা হচ্ছেঃ নিরীহ ব্যক্তিদের রক্তের অলংঘনীয়তা। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যার দরজা খুলে দেয়া চূড়ান্ত রকমের ঝুঁকিপূর্ণ।

এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বা ন্যায়সঙ্গতকরণের ফলাফল হিসেবে সন্দেহ, অভিযোগ এবং খাহেশত অনুপ্রবেশের দরজা খুলে যায়। আমরা নিজ চোখে দেখেছি, এই বিষয়ে যারা এ ব্যাখ্যা ও ন্যায়সঙ্গতকরণের দরজা খোলা চেষ্টা করেছে, তাদের অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন হয়েছে যে, সামান্য সন্দেহের কারণে মুসলিমদের রক্তও তাদের কাছে লংঘনীয় হয়ে যায়। যারা এর সূচনা করেছে তারা হয়তো ভাবে নি অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়াবে। কিন্তু চিন্তা ও ঘটনার আনুষঙ্গিকতা নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

কিন্তু নবী (সা) রক্তক্ষরণের ব্যাপারে ব্যাখ্যার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং এর পথও বন্ধ করে দিয়েছেন। নিরীহ মানুষের রক্ত অলংঘনীয় হওয়ার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট, এ থেকে যারাই পথচ্যুত হয়, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

৫) নবীজির (সা) এই চূড়ান্ত কঠোর ভর্ৎসনা যদি এমন লোককে হত্যার ক্ষেত্রে হয় যে তার জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে তলোয়ারের ঝলকানির নিচে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করেছিল, তাহলে তাদের হত্যার ব্যাপারটি কেমন হবে, যারা তাদের পুরো জীবনে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ছাড়া আর কিছু চিনেনি ?

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের আমাদের দ্বীনের প্রশস্ততার মধ্যে হেফাজত করুন। যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন মুসলিম অলংঘনীয় রক্ত ঝরায়, সে তার দ্বীনের প্রশস্ততার মধ্যেই অবস্থান করে।[56]

২২। এই নারী ও এর শিশুসন্তান

নবীজির (সা) সামনে হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আসা হল। সেই যুদ্ধবন্দীদের সামনে এক নারীবন্দী ছিল যে এদিক সেদিক ছুটছিল এবং তার দৃষ্টিও এদিক সেদিক ঘুরছিল। তার বুক থেকে দুধ চুয়ে চুয়ে পড়ছিল। সে তার দুধের বাচ্চাকে খুঁজছিল যাকে সে বন্দীদের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিল। মহিলাটির অন্যদের প্রতি উদাসীনতা, কষ্ট এবং আতঙ্ক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। নবীজি (সা) এবং তাঁর সাহাবীরা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। যখন মহিলাটি তার সন্তানকে খুঁজে পেল তখন সে তাকে নিয়ে নিজের বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে বুকের দুধ পান করাল এবং ভালোবাসায় তাকে ভরিয়ে দিল। বাচ্চা হারানোর পর মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বাচ্চাটি নিয়ে কি কি আশঙ্কাই না সে করছিল। এরপর যখন বাচ্চাটি ফিরে পেল, মহিলা প্রচন্ড আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

দৃশ্যটি প্রচন্ড আবেগময় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে বলেন, "তোমরা কি মনে কর, এই মহিলাটি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে?" এটা চিন্তা উদ্রেককারী একটি প্রশ্ন ছিল। সাহাবীরা দেখছিল যে, মহিলাটি বাচ্চা হারানোর পর তার বুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাহলে কিভাবে সম্ভব যে, মহিলাটি নিজ বাচ্চাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে! এজন্যই সাহাবাগণ উত্তর দিলেনঃ "কখনোই না! আল্লাহর শপথ! হে রাসূলুল্লাহ! মহিলাটি এ কাজ করার সক্ষমতা রাখে না।" সাহাবীদের চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করার পর নবী (সা) এক সুমহান সত্য তুলে ধরলেনঃ "আল্লাহর শপথ! এই মহিলাটি তার বাচ্চার প্রতি যতটা দয়াশীল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়েও অধিক দয়াশীল।"[57]

এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয়ঃ

১) নবী (সা) যেকোন কিছু শেখানোর সময় যে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতেন তা ছিল অসাধারণ। এগুলোতে শিক্ষার বিষয়বস্তু যেমন ফুটে উঠত, তেমনি চিন্তা উদ্রেককারী জিনিসের সমাহার থাকার কারণে শিক্ষার বিষয়বস্তুর স্পষ্টতাও বৃদ্ধি পেত এবং সাহাবাদের অন্তরে এগুলোর গভীর প্রভাব পড়ত। এই মহিলা ও তার অবস্থার দৃশ্য একটি বড় বিষয়বস্তু তুলে ধরার অবলম্বন ছিল। নবীজিও (সা) এই দৃশ্যকে ব্যবহার করে

সাহাবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে উদ্দীপ্ত করার জন্য প্রশ্ন রাখেনঃ “তোমরা কি মনে কর, এই মহিলাটি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে?” এই প্রশ্ন ছিল এর পরে কি আসবে, এই প্রশ্নের পিছনে কি অর্থ লুকিয়ে আছে সেজন্য চিন্তা করতে মস্তিষ্ক ও অন্তরকে উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে। এরপর শিক্ষার বিষয়বস্তুকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য এই মহিলার অবস্থাকে উদাহারণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যাতে অন্তরে এই শিক্ষার প্রভাব গেঁথে যায়ঃ “এই মহিলাটি তার বাচ্চার প্রতি যতটা দয়াশীল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়েও অধিক দয়াশীল।” আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ মানুষদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের ওপর, যিনি তাঁর শিক্ষাদানে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণী, অর্থের সুস্পষ্টতা, অন্তরে বিষয়বস্তু গেঁথে দেয়ায় সফলতা এবং সেটার দ্বারা অন্তরের প্রশিক্ষণ একত্রিত করেছেন।

২) মহিলাটির মাতৃত্ব উৎসরিত এই প্রচন্ড আবেগময় দৃশ্য কোনরকম প্রভাব অথবা বিস্ময়ের ছাপ না ফেলেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এই দৃশ্যটিকে ব্যবহার করে আল্লাহ সম্পর্কিত একটি শিক্ষা পেশ করলেন, যার ফলে সাহাবীদের অন্তর আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে ধারণায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। নবীজি (সা) শিক্ষা পেশ করার জন্য প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি কোন শিক্ষা পেশ করার সময় সবচেয়ে উপযুক্ত পরিস্থিতি বেছে নিতেন এবং তিনি যা বলছেন তা গ্রহণ করার জন্য শ্রোতারা প্রস্তুত আছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতেন। এজন্য মহিলাটির এই ঘটনা উপযুক্ত একটি সুযোগ ছিল, যা রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যবহার করে সাহাবীদের সব দয়ালুর বড় দয়ালুর রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আল্লাহর রহমতের বিষয়ে অনেক লম্বা কথা বলা যেত, কিন্তু মহিলাটির ঘটনার সাথে সম্পর্কিত করে রাসূলুল্লাহর (সা) এই বিষয়ে দেয়া সংক্ষিপ্ত বাণী এই বিষয়ে লম্বা কথার চেয়েও অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে সক্ষম ছিল। অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করা এবং উপযুক্ত পরিবেশ কাজে লাগিয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু পেশ করার ক্ষেত্রে নবীজির (সা) এই নিপুণতা কি আমরা অনুসরণ করতে পারি না?

৩) নবী (সা) এই শিক্ষা কোন পাঠচক্রে বা মসজিদের মিম্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পেশ করেন নি। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর চারপাশে থাকা সাহাবাগণ হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু এরপরও তাদের একজন বন্দীর অবস্থাকে উদাহারণ হিসেবে ব্যবহার করে নবীজি (সা) তাঁর শিক্ষা পেশ করেন। এটা এজন্য যে, নবীজির (সা) শিক্ষাদান কেবলমাত্র খুতবা ও ওয়াজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং জীবনের সকলক্ষেত্রেই তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। তিনি যখন খাবার টেবিলের বসতেন অথবা বাজারে প্রবেশ করতেন

বা রাস্তায় হাঁটাচলা করতেন – এসবই ছিল তাঁর জন্য শিক্ষাদানের সুযোগ। সাহাবাদের সাথে তাঁর মজলিসও ছিল শিক্ষা ও দাওয়াতের ক্ষেত্র। প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত এই সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাও এর ব্যতিক্রম নয়। সাহাবাদের অন্তর নববী জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত, যা রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের বিভিন্ন দিকে ও মোড়ে তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পরের প্রজন্ম ও আমাদের চারপাশের লোকদেরকে যখন আমরা তারবিয়াত দেব, সেটাকে জীবনের সক্রিয়তার সাথে সম্পর্কিত করা উচিত, কেবলমাত্র লম্বা লম্বা নসীহতের মধ্যে এই তারবিয়াতকে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। আমরা তারবিয়াতী নির্দেশনাকে অনেকসময় সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যের সাথে ও প্রভাব ফেলে এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারি কারণ এভাবে কাঠিন্য ও বিরক্তি ছাড়াই উপযুক্ততার সাথে শিক্ষাগুলো ফুটে উঠে, অন্তরে ভালোভাবে প্রবেশ করে এবং এর প্রভাবও ভালো হয়।

৪) নবী কারীম (সা) মহিলাটির এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমতের শ্রেষ্ঠত্ব যেভাবে তুলে ধরেছেন তা অন্তরে আশা ও আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলে। মানুষ পৃথিবীতে এমন কোন দয়া সম্পর্কে জানে না যা সন্তানের জন্য মায়ের দয়ার চাইতে বড়। এই মায়ের দয়াই আরো প্রকান্ড হয়ে দাঁড়ায় যখন সন্তান দুর্বল অবস্থায় এবং মায়ের ওপর প্রচন্ডভাবে নির্ভরশীল থাকে। এ অবস্থা থাকে সন্তান যখন দুধের বাচ্চা হয় এবং শৈশবকালের প্রারম্ভে থাকে। এই দয়া আরো কয়েক গুণ হয় যখন সন্তান বিপদের সম্মুখীন হয় এবং মা সন্তানের ব্যাপারে আশঙ্কায় থাকে। মহিলাটির এই অবস্থাই নবী (সা) এবং তাঁর সাহাবাগণ প্রত্যক্ষ্ করেন।

এরপর নবী কারীম (সা) তুলে ধরেন যে, এই অবস্থায় সন্তানের প্রতি মায়ের যে দয়া বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া এর চেয়েও প্রবল। এই শিক্ষা মু'মিনের অন্তরকে প্রশান্তি ও সন্তুষ্টিতে ভরিয়ে দেয়। যখন সে সৎকাজ করে, সে আল্লাহর প্রবল রহমতের কথা স্মরণ করে এবং আশা করে যে, আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করবেন। আর যদি সে ভুল বা গুনাহ করে ফেলে, তাহলেও সে নিজের রবের রহমতের কথা স্মরণ করে এবং তাঁর ক্ষমার আশা করে। যখন তার ওপর কঠিন অবস্থা নেমে আসে, সে আল্লাহর প্রকান্ড রহমতের কথা স্মরণ করে এবং এই বিশ্বাস রেখে দোয়া করে যাতে আল্লাহ তাকে ধ্বংস না করে দেয়। যখন সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয় তখন সে স্মরণ করে যে রবের দিকে তার যাত্রা সেই রবের দয়া সন্তানের প্রতি মায়ের দয়ার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ফলে আল্লাহর ব্যাপারে সে ভালো ধারণা করে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা তার মধ্যে জেগে ওঠে।

২৩। উম্মে খালিদ

তাঁর নামঃ উম্মা বিনতে খালিদ বিন সাঈদ বিন আ'স। ছোট থাকতে তাঁর পিতা তাঁর উপাধি দিয়েছিলেনঃ উম্মে খালিদ।

তাঁর বয়স ছিল শৈশবকালের প্রারম্ভে, হাসিখুশি এক বালিকা ছিলেন।

তিনি হাবশায় জন্মেছিলেন। যখন তাঁর বুঝ হয়, তিনি তাঁর পিতামাতাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খাতিরে দূর প্রবাসে মুহাজির হিসেবে পেয়েছেন।

তিনি তাঁর প্রারম্ভিক শৈশবকালের স্মৃতি মনে রাখেন, যার প্রভাব বাকি জীবনভর তাঁর মধ্যে রয়ে যায়। তিনি তাঁর এই সুন্দর স্মৃতিগুলো ভুলে যান নি এবং সেগুলো বারবার মনে করতেন। এসব স্মৃতির যে প্রভাব ছিল তা তিনি আঁকড়ে ধরে রাখেন।

তাঁর এরকম একটি স্মৃতি ছিল এরকম যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কাপড় বিলি করছিলেন। শেষে তাঁর হাতে একটি ছোট চাদর থেকে যায়, যেটাকে হলুদ, সবুজ ও লাল রঙ এর কাপড় দিয়ে সেলাই করা হয়েছিল। চাদরটি নজরকাড়া সুন্দর ও চমৎকার ছিল যে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ "এই চাদরটা কাকে দেয়া যায় বলে তোমরা মনে কর ?" কিন্তু সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহর (সা) মতের সম্মানে চুপ থাকেন। কিন্তু তাঁদের মাথায় ঠিকই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এ চাদর দেয়ার জন্য কাকে প্রাধান্য দেবেন, কাকে তিনি এর জন্য বেছে নিবেন ?

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকেই এ প্রশ্নের জবাব এল। তিনি বললেনঃ "আমার কাছে উম্মে খালিদকে নিয়ে এসো।" সংবাদ বহনকারী উম্মে খালিদের পিতার নিকট গিয়ে খবর দিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর পিতা তাঁকে হাতে ধরে নিয়ে এলেন এবং নবীজির (সা) সামনে দাঁড় করালেন। নবী (সা) চাদরটি বিছিয়ে দিলেন এবং তাঁকে নিজ পবিত্র দু হাতে পরিয়ে দিলেন। যখন চাদরটি উম্মে খালিদের ছোট্ট দেহটিকে ঢেকে নিল, তাঁর চোখ নতুন কিছু পাওয়ার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নবীজিও (সা) তাঁর এই

আনন্দে শরীক হলেন এবং এই আনন্দ আরো বাড়াতে চাইলেন। তাই তিনি তাঁর পবিত্র হাতে রঙ্গিন কাপড় উপরে তুলে ধরলেন, এরপর উম্মে খালিদের ঢং ধারণ করে এবং নিজ বাচন ও কণ্ঠকে তাঁর বাচন ও কণ্ঠের মত করে হাবশী ভাষায় বললেনঃ "এটা সুন্দর।" উল্লেখ্য, উম্মে খালিদ হাবশায় জন্ম নেয়ায় তিনি হাবশী ভাষা শিখেছিলেন।

এরপর নবীজি (সা) তাঁর জন্য তিনবার এ দোয়া করলেনঃ "যাতে তোমার এই জামা ব্যবহার করতে করতে ছিঁড়ে যায় এবং তোমাকে এটা অনেকবার সেলাই করতে হয়।" উম্মে খালিদ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিশুক হয়ে উঠলেন এবং তাঁর ছোট্ট হাতে রাসূলুল্লাহকে (সা) ছুঁয়ে দেখতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দুই কাঁধের মাঝখানে নবুওয়াতের সীলমোহর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি সেটা নিয়ে খেলতে লাগলেন এবং তাঁর আঙ্গুল দিয়ে সেটাকে স্পর্শ করতে লাগলেন। এটা দেখে তাঁর পিতা তাঁকে বকলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানে। রাসূলুল্লাহর (সা) মধ্যে পিতৃ অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠল এবং তিনি উম্মে খালিদের পিতাকে বললেনঃ "তাকে ছেড়ে দাও!"

মেয়ে শিশুটি যা ইচ্ছা তাই নিয়ে আনন্দ করুক, খেলুক! এটাই রাসূলুল্লাহ (সা) আর এটাই তাঁর সহৃদয়তা, কোমলতা ও পিতৃত্বসুলভতা।

উম্মে খালিদও বড় হলেন, সেই সাথে তাঁর অন্তরে বড় হল এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং স্মৃতি। তিনি বাকিজীবনভর এই ঘটনার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে ছিলেন। তিনি কাপড়টি সংরক্ষণ করেন। কাপড়টির রঙ বদলে কালো হয়ে গিয়েছিল। আর কাপড়টি তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) বরকত ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের চমৎকার স্মৃতি সংরক্ষণ করেন।[58]

***এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) নিজের ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের ব্যাপারে নবীজির (সা) সময় কতটাই না প্রসারিত ছিল, এমনকি তিনি তাঁদের সন্তানদেরও খুশি করতেন এবং তাদের অন্তর আনন্দে ভরে দিতেন। তাদের আনন্দের বিষয়গুলোতে অংশ নেয়াটা আমাদের চোখে ছোট কিছু হলেও, তাদের চোখে এটা অনেক বড়কিছু।

নবীজি (সা) কখনো অবসর সময় কাটাতেন না, না তো তাঁর কাজের বোঝা কখনো কম থাকত। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন, বহন করেছিলেন সবচেয়ে ভারী আমানত। কিন্তু এরপরও শিশুদের আনন্দে শরীক হওয়ার মত বিষয়েরও মুহাম্মাদী আখলাকের মাপকাঠিতে নিজস্ব গুরুত্ব ছিল। আর এজন্যই তিনি এসব কাজের নিজের সময়, অন্তর ও অনুভূতি ব্যয় করতেন। আর হবেই বা না কেন! তাঁকে তো পাঠানোই হয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মানবজাতির সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য। তিনি তাঁর উম্মতকে দেখিয়েছেন যে, সবচেয়ে কল্যাণময় আমল এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য সাদাকা হচ্ছে "মুসলিমদের অন্তরে আনন্দানুভূতি সৃষ্টি করা।"[59]

২) নবীজির (সা) পক্ষে এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তিনি চাদরটি উম্মে খালিদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি নিজ হাতে চাদরটি উম্মে খালিদকে দিতে চাইলেন, এর খুঁটিনাটিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চাইলেন; যাতে মানুষকে আনন্দিত করা অনুসরণীয় নববী সুন্নাহ ও উত্তম আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাদের জন্য, যারা আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। আর এজন্যই নবীজির (সা) জীবনে একই ধরনের আরো অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যা উপরোক্ত সুন্নত এবং এই ঘটনার শিক্ষাকেই আরো জোরদার করে।

৩) এ ঘটনা থেকে একটি সুন্দর কাজকে কয়েকটি ছোট ছোট অর্থমূলক সুন্দর কাজে ভাগ করার ক্ষেত্রে নবীজির (সা) দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমে তিনি চাদরটি কাকে দেয়া যায় - এ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলেন, যা দ্বারা তিনি কাউকে গুরুত্ব দেয়া ও বাছাই করার বিষয়টি তুলে ধরেন। আর এজন্যই তিনি চাদরের ব্যাপারটিকে সম্মানের নিদর্শনের রূপ দেন।

এরপর তিনি উম্মে খালিদকে এভাবে সৌভাগ্যবান করতে চাইলেন যে, তিনি নিজ হাতে চাদরটি তাঁকে দেবেন। সেজন্য তিনি চাদরটি তাঁকে পাঠালেন না, বরং নিজ হাতে চাদরটি তাঁকে পরিয়ে দিতে চাইলেন।

এরপর তিনি উম্মে খালিদের সাথে সদয়ভাবে মেলামেশা করলেন এবং তাঁর শৈশবীয় আনন্দে শরীক হলেন।

এরপর তিনি তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং সেই দোয়ার পুনরাবৃত্তি করলেন।

এরপর তিনি উম্মে খালিদকে কাছে এতটাই কাছে টেনে নিলেন যে, উম্মে খালেদ তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারছিল এবং তাঁর দেহের যে অংশ তাঁর নজর কাড়ছিল সেই অংশ নিয়ে খেলা শুরু করলেন। এ ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে উম্মে খালেদের পিতা যখন উম্মে খালেদকে বকা দিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পিতাকে বললেনঃ "উম্মে খালেদকে ছেড়ে দাও"।

এই নববী শিক্ষা থেকে স্পষ্ট হয় যে, বদান্যতা ও উদারতার মত সৎকর্মগুলোও সঠিক কৌশল অবলম্বন করে সুন্দরভাবে আদায় করতে হয়।

৪) ছোট শিশুদের সাথে আচার-আচরণের নববী মানহাজ এখান থেকে ফুটে ওঠে

ক) তাদের স্বাগত জানানো, তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়া, তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা এবং তাদের আনন্দিত করা।

খ) তাদের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের সাথে সুর মেলানো। এর ফলে তারা এতটাই নিকটর্বতী হয় যে, তাদের ছোট হাত দিয়ে নবী কারীমের (সা) দেহ নিয়ে খেলাধুলা করে।

গ) তাদের সাথে নম্রতা দেখানো এবং তাদেরকে বকা দেয়া বা এরূপ শুষ্ক আচরণ থেকে দূরে থাকা, যা নবীজির (স) "তাকে ছেড়ে দাও" – উক্তি থেকে স্পষ্ট।

রাসূলুল্লাহ (সা) বাচ্চাদের বিশেষ বিশেষ অনুভূতির দিকে খেয়াল রাখতেন এবং সেগুলোকে উদযাপন করতেন।

৫) ছোট শিশু উম্মে খালিদের সাথে নবীজির (সা) সদয় আচরণের কেমন চূড়ান্ত প্রভাব পড়েছিল তাঁর পিতামাতার ওপর – সেটাও উল্লেখযোগ্য।

ভাবা যায়, উম্মে খালিদের পিতা খালিদ বিন সাঈদের (রা) অন্তরে তখন কি অনুভব হচ্ছিল যখন তিনি তাঁর কন্যাকে কোলে বহন করে নিয়ে আসছিলেন কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?! যখন তিনি নবীজিকে (সা) দেখলেন তাঁর কন্যাকে নিজ হাতে চাদর পরিয়ে দিচ্ছেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় আনন্দে

কতটাই না উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল! যখন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর কন্যার জন্য দোয়া করতে শুনলেন, তখন তাঁর চেহারায় খুশিতে কতটাই না উদ্বেল হয়ে উঠেছিল!

ছোটদের সম্মান করা মূলত তাদের বড়দেরই সম্মান করা, ছোটদের সাথে সদ্ব্যবহার করা মূলত তার পরিবার ও আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

৬) এ ঘটনা থেকে নবী কারীমে (সা) মোজেযার প্রমাণ পাওয়া যায়, যা তাঁর এই দোয়া "যাতে তোমার এই জামা ব্যবহার করতে করতে ছিঁড়ে যায় এবং তোমাকে এটা অনেকবার সেলাই করতে হয়।" –তে ফুটে ওঠে। এটা ছিল মূলত উম্মে খালিদের লম্বা বয়সের জন্য দোয়া। উম্মে খালিদ (রা) অনেক লম্বা জীবন লাভ করেন। মহিলা সাহাবীদের তিনি সবার শেষে মৃত্যু বরণ করেন।

৭) কোন মুসলিম যদি এই ঘটনাকে নিজ মনে এমনভাবে কল্পনা করে যে, সে যেন নিজ চোখে নবীজিকে (সা) এই ঘটনায় বর্ণিত সব কাজ করতে দেখছে কিন্তু এরপরও যদি নবীজির (সা) প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর চেহারা দেখার আকাঙ্খায় তার অন্তর যদি হাহাকার করে না ওঠে, তবে তার অন্তরে ত্রুটি রয়েছে যেটাকে সারিয়ে তোলার প্রয়োজন। এসব উষ্ণ ভাবপূর্ণ ঘটনায় নবীজিকে (সা) যেভাবে পাওয়া যায় এর চেয়েও অধিক নৈকট্যে নবীকে পেলেও উপরোক্ত ব্যক্তির জন্য তা অধিকতর লাভজনক হবে না। অন্তরে যদি জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে এর কমতিসহ সবই গ্রহণ করে নিতে হয়।

২৪ I খেলো

ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রী আয়েশার (রা) সাথে তাঁর হুজরায় ঈদের খুশি ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছিলেন এবং তাঁর আনন্দে শরীক হচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি হট্টগোল ও গানবাজনা শুনতে পেলেন। এরা ছিল মূলত হাবশীগণ যারা মসজিদে নববীর প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেছিল। তাদের সাথে ছিল তাদের বর্শা এবং চামড়ার ঢাল। তারা নিজস্ব ভঙ্গিতে মসজিদে নাচা শুরু করল এবং নিজ ভাষায় গাইতে লাগল। তাদের এই দৃশ্য ছিল খুবই সুন্দর ও আনন্দাদায়ক। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রী আয়েশার (রা) কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "হে হুমায়রা, তুমি কি হাবশীদের কার্যকলাপ দেখতে চাও?" আয়েশা (রা) উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ। আমি তাদের দেখতে চাই।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশার (রা) জন্য হুজরার দরজায় এসে দাঁড়ালেন এবং আয়েশা (রা) তাঁর পেছন দিয়ে এসে তাঁর কাঁধে নিজের থুতনি এবং তাঁর গালে নিজের গাল রাখলেন। নবী কারীম (সা) তাঁকে আড়াল করার জন্য তাঁর ওপর নিজের কাপড় মেলে দিলেন। নবীজি (সা) এবং আয়েশা (রা) দুজনই একসাথে হাবশাদের খেলা দেখতে লাগলেন। নবী (সা) হাবশীদের খেলায় উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য বললেনঃ "সাবাশ! বনু আরদিফাহ (হাবশীদের উপাধি)।" নবীজির (সা) নিজ অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাবশী খেলোয়াড়দের উদ্দীপনা আরো বৃদ্ধি পেল। হাবশীরা তাঁর সামনে নাচছিল আর তিনি তাদেরকে তাদের ভাষাতেই উৎসাহ দিলেন। হাবশীরা তখন নিজ ভাষা কথা বলা শুরু করল যা নবীজি (সা) বুঝতেন না। নবীজি (সা) জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তারা কি বলছে?" তখন তাঁকে বলা হল, তারা বলছেঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দা।" আয়েশা (রা) বলেনঃ "আমি তাদের কথা থেকে কেবল এই অংশটুকুই বুঝেছিঃ 'আবুল ক্বাসিম উত্তম! আবুল ক্বাসিম উত্তম!'"

এমতাবস্থায় উমার (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং এই দৃশ্য দেখলেন যেটার সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন না। নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি এটার সমালোচনা করতে এগিয়ে গেলেন। তিনি মসজিদে কিছু পাথর পেয়ে সেগুলো নিয়ে হাবশীদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদে তাদের এসব কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেনঃ "তাদেরকে ছেড়ে দাও, উমার! তারা তো বনু

আরফিদা।” অর্থাৎ এটাই তাদের কারবার এবং পথ। এরপর নবীজি (সা) তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেনঃ “নিশ্চিন্ত হও, বনু আরফিদা।” অর্থাৎ তোমরা নিশ্চিন্তে তোমাদের খেল চালিয়ে যাও। উমার (রা) তাদের আতঙ্কিত করার পর নবীজি (সা) নিজে গিয়ে তাদের শান্ত করেন। এরপর তাদের উদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে বলেনঃ “বনু আরফিদা, তোমরা তোমাদের খেলা চালিয়ে যাও। ইয়াহুদী ও নাসারাদের জানা উচিত যে, আমাদের দ্বীনে প্রশস্ততা আছে। আমি উদার সরলপথ দিয়ে প্রেরিত হয়েছি।”

হাবশীদের খেলাধুলা, গান এবং বর্শা ও চামড়ার ঢাল দিয়ে যুদ্ধের নৈপুণ্য দেখানো চলতে লাগল। রাসূলুল্লাহও (সা) দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন কখন আয়েশার (রা) এসব দেখে মন ভরবে। অতঃপর যখন নবীজি (সা) মনে করলেন, আয়েশার (রা) মন ভরেছে, তখন তিনি তাঁকে বললেনঃ “তোমার কি মনে ভরেছে?” আয়েশা (রা) ছিলেন অল্প বয়স্ক বালিকা। তিনি এসব দেখতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) এসব দেখে তখন মন ভরে গেলেও, আয়েশার (রা) মন ভরেনি। তাই তিনি বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! তাড়াহুড়ো করবেন না।” অতঃপর রাসূলুল্লাহও (সা) তাঁর জন্য আরো দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর যখন আবার তাঁর মনে হল যে, যথেষ্ট হয়েছে তিনি আয়েশাকে (রা) বললেনঃ “তোমার হয়েছে?” আয়েশা (রা) বললেন, “হে রাসূলুল্লাহ! তাড়াহুড়ো করবেন না।” এমনকি যখন হাবশীদের অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে আয়েশার (রা) মনে ভরে গেল, তিনি তাঁর অন্তরের আরেকটি চাহিদার দিকে মনোযোগ দিলেন, যেটার গুরুত্ব তাঁর কাছে কম ছিল না। আর সেটা হচ্ছে নবীজির (সা) মনে তাঁর জন্য যে স্থান ও মর্যাদা ছিল সেটা জেনে নেয়া। এজন্য নবীজি (সা) যখন তাঁকে বলছিলেন, “তোমার হয়েছে?”, তিনি “তাড়াহুড়ো করবেন না” – এই জবাব দিয়ে সময় নিচ্ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেনঃ “আসলে আমার হাবশীদের খেলা দেখতে যে আর ভালো লাগছিল তেমন নয়। কিন্তু আমি চেয়েছি, নারীরা যাতে স্বামী এবং তাদের স্বামীরা যাতে তাদের জন্য তেমনটা হয় যেমনটি কিনা আমি ও রাসূলুল্লাহ পরস্পরের জন্য ছিলাম।” যখন আয়েশার (রা) খেলা দেখে ও রাসূলের (সা) নিকট নিজের অবস্থান ও মর্যাদা জেনে নিয়ে মন ভরল এবং দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্তি চলে আসল, রাসূলুল্লাহর (সা) “তোমার হয়েছে?” প্রশ্নের জবাবে তখন তিনি বললেনঃ “হ্যাঁ।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “তাহলে চলো।”

রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশার (রা) জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হন নি যতক্ষণ না পর্যন্ত আয়েশা (রা) নিজেই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হলেন। তিনি তাঁর স্থান থেকে সরে যান নি, যতক্ষণ আয়েশা (রা) তাঁর

স্থান থেকে সরে যান নি। এই ঘটনার স্মৃতি ও আনন্দ আয়েশার (রা) মনে রয়ে যায়। তিনি এই ঘটনার ব্যাপারে একবার বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সা) একবার আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি না সরা পর্যন্ত তিনি সরে যান নি।”[60]

***এ ঘটনা থেকে লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) নিজ স্ত্রীর অনুভূতির প্রতি সদয়তার সাথে খেয়াল রাখা, তাঁকে খুশি করা এবং তাঁর অন্তরে ঘনিষ্ঠভাব সৃষ্টি করার ব্যাপারে নবীজির (সা) চমৎকার পদক্ষেপ। নবীজিই (সা) প্রথম তাঁর সামনে হাবশীদের খেলা দেখার প্রস্তাব রাখেন এবং তাঁকে প্রেমময়তা ও স্নেহের সাথে ‘হে হুমায়রা (লাল বর্ণের অধিকারিণী)’ বলে সম্বোধন করেন। আরব পরিবেশে এই সম্বোধন সুন্দর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এরপর নবীজি (সা) তাঁর জন্য ভালোবাসার সাথে এমনভাবে দাঁড়ান যাতে প্রেম ও সহৃদয়তা ফুটে ওঠে; তাঁর গাল আয়েশার (রা) গালের সাথে, আয়েশার (রা) চিবুক তাঁর কাঁধে স্পর্শ করে ছিল। এরপর তিনি আয়েশার (রা) জন্য দাঁড়িয়েই থাকেন এবং আয়েশা (রা) না সরে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর স্থান থেকে সরেন নি। এগুলো হচ্ছে ভালোবাসা, আনন্দ, ঘনিষ্ঠতা এবং সহৃদয়তা ও প্রেমের অনুভূতি বর্ষণের চিহ্ন।

২) ঈদের দিন নিজেদের খেলাধুলার জন্য হাবশীরা মসজিদকে বেছে নিয়েছিল। এটা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদ কেবল ইবাদতের স্থানই নয়, বরঞ্চ তা হচ্ছে জীবনের একটি ক্ষেত্র যেখানে দ্বীনি প্রথা পালিত হয়, তেমনি অনুভূতির প্রকাশও করা হয় যেভাবে সেখানে সালাত কায়েম করা হয়। একইভাবে সেখানে সাদাকা সংগ্রহ করা হয় এবং গনীমত ভাগ করা হয়। একইভাবে তা খুশি ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশের সময় সবার একত্রিত হওয়ার স্থান। আর এভাবেই দৈনন্দিন জীবনের সাথে মসজিদকে সম্পর্কযুক্ত করা হয় আর মসজিদ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে ধারণ করে।

৩) ইসলামের দরজা এতটাই প্রশস্তিত ছিল যে, তা বিভিন্ন সংস্কৃতিকে ধারণ করতে পারত। হাবশীরা তাদের নিজস্ব পন্থায় নিজেদের খুশির বহিঃপ্রকাশ করতে পারত যা আরবদের থেকে ভিন্ন ছিল। বর্শা দিয়ে খেলা এবং হাবশা ভাষায় গাওয়া হাবশা সভ্যতার অংশ ছিল। এরপরও রিসালাতের যুগে মুসলিম সমাজ হাবশী সংস্কৃতিকে ধারণ করতে সক্ষম ছিল। এটি করতে গিয়ে হাবশী সংস্কৃতিকে এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গীকে বিসর্জন দিতে হয় নি।

৪) যদিও হাবশীদের খেলাধুলার সময়টি ছিল সামাজিকতা এবং আনন্দের, কিন্তু নবীজি (সা) এটিকেও তাঁর দাওয়াত ও শিক্ষাদানে কাজে লাগালেন। তিনি এই অনুষ্ঠান চলার সময়ই একটি ব্যাপারকে মৌখিক ও ব্যবহারিকভাবে স্পষ্ট করে তোলেনঃ “ইয়াহুদী ও নাসারাদের জানা উচিত যে, আমাদের দ্বীনে প্রশস্ততা আছে। আমি উদার সরলপথ দিয়ে প্রেরিত হয়েছি।” নবী কারীম (সা) নিজ জীবনের প্রতিটি দিকে দাওয়াত ও রিসালাত পৌঁছানোর মহান দায়িত্ব পালনে সিক্ত ছিলেন।

৫) হাফিয ইবনে হাজার (রহ) বলেনঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদের দিন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডে মশগুল হওয়া বৈধ, যা তাদের অন্তর ও শরীরকে সতেজতা ও আনন্দ প্রদান করবে। ঈদের দিন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করা দ্বীনের শি’আরের অংশ।

৬) নবী (সা) হাবশীদের ঈদ আনন্দ উদযাপনের ঢং-কে অনুমোদন করেন, যা আরবদের থেকে ভিন্ন ছিল। এ থেকে অঞ্চল, সময় ও বয়সভেদে ঈদের আনন্দ প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ধরন ও উদযাপনের বিভিন্ন ঢং এর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৭) এ ঘটনায় নবী (সা) তাঁর রিসালাতে যে প্রশস্ততা এবং সহজতা আছে তা নিশ্চিত করেছেন। তাঁর আনীত দ্বীন নিষিদ্ধ জিনিসের তালিকায় সীমাবদ্ধ নয়, আর না এই দ্বীন নিষেধের পরিখায় নিরুদ্ধ। বরঞ্চ এই দ্বীনে রয়েছে উদারতা ও প্রশস্ততা। এটাই জীবনসম্পর্কিত ব্যাপারগুলোতে মূলনীতি। আর নিষিদ্ধ ব্যাপারগুলো হচ্ছে জীবনে ব্যতিক্রম। “তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন” [সূরা বাক্বারাঃ ২৯]। এই দ্বীনের মাধ্যমেই মানবজাতির কাঁধের ওপর থেকে পূর্ববর্তী দ্বীনগুলো দ্বারা আরোপকৃত বোঝা নামানো হয়েছে। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের জানা উচিত যে, নবীজি (সা) আনীত দ্বীনে প্রশস্ততা বিদ্যমান এবং তিনি উদার সরলপথ দিয়ে প্রেরিত হয়েছে। তিনি তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহকে বৈধ করেন এবং অপবিত্র জিনিসগুলোকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি তাদের ওপর থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল নামান যা তাদের ওপর আগে থেকে বিদ্যমান ছিল।

২৫ । ঈদের দিন

তিনি কমবয়সী এক আরব বালিকা যিনি আমোদপ্রমোদ পছন্দ করেন। আর দিনটিও ছিল ঈদ, যেটা হচ্ছে মেলামেশা ও আনন্দের দিন। তাঁর কাছে তাঁর ছোট ছোট সখীরা দফ নিয়ে এল, যাতে তারা সেদিনটি আনন্দ ও মেলামেশায় কাটিয়ে দিতে পারে। নবীজির (সা) হুজরায় দফ বাজানো হল। বালিকারা আনসারীদের যুদ্ধের কবিতার তালে গেয়ে উঠল। এ সময় নবী (সা) হুজরায় প্রবেশ করলেন। বালিকারা দফ বাজানোও বন্ধ করল না, গানও বন্ধ করল না। বালিকাদের বকাও দেয়া হল না। রাসূলুল্লাহ (সা) হুজরায় প্রবেশ করায় তারা ভীতসন্ত্রস্তও হয় নি।

নবী (সা) তাঁর বিছানা অভিমুখী হলেন এবং তাতে শয়ন করলেন। তিনি তাঁর কাপড় জড়িয়ে রাখলেন এবং তাঁর মুখ ঢেকে রাখলেন। তিনি তাঁর মুখ দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রাখলেন। ওইদিকে বালিকাদের বাধহারা আমোদ এবং আনন্দময় উদযাপন চলতে লাগল। নবীজির (সা) হুজরা তাঁর নিঃশ্বাসের সুবাসে সুবাসিত হয়ে উঠল। আয়েশা (রা) ও তাঁর ছোট বান্ধবীরা তখন সে ঘরে, যেখান থেকে আল্লাহ সকল অপবিত্রতা দূর করেছেন এবং সেটিকে উত্তমরূপে পবিত্র করেছেন। যখন বালিকারা গান গাচ্ছিল তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর কন্যা আয়েশার (রা) ঘরে প্রবেশ করেন। নবীজির (সা) ঘরে দফ বাজানো ও গান গাওয়া দেখে তিনি এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং বালিকাদের বকা দিয়ে বলেনঃ “রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে শয়তানের যন্ত্র ?!”

রাসূলুল্লাহ (সা) দেয়ালের দিকে ফিরে নিজ মুখমন্ডল ঢেকে রেখেছিলেন। তিনি আবু বকরের (রা) কথা শুনে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ “তাদেরকে ছেড়ে দাও, আবু বকর। আজ ঈদের দিন।” দিনটি ঈদুল আযহার দিন ছিল। নবীজির (সা) এই অনুমতি যেন তাদেরকে প্রাণবন্ততা ও উদ্দীপনার আরেকটি ধাক্কা দিল। আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহর সাথে বসে ছিলেন। যখন আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকরকে (রা) দেখলেন তাঁকে এড়িয়ে যেতে, তিনি চোখ দিয়ে বালিকাদ্বয়কে ইশারা করেন, তারা হুজরা থেকে বের হয়ে যায়।[61]

এ ঘটনা থেকে লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) রাসূলুল্লাহ (সা) হুজরায় প্রবেশ করার পরও বালিকাদ্বয়ের গান চলতে থাকে এবং তারা তাদের আনন্দযাপন ও আমোদ বন্ধ করে নি। এ বালিকারা ছিল অল্প বয়স্ক আর রাসূলুল্লাহর (সা) মধ্যে ভাবগাম্ভীর্য ছিল। তিনি যদি হুজরায় গোমড়ামুখ করে ঢুকতেন, তাহলে কি বালিকারা তাদের গান চালিয়ে যেত? এ ঘটনাকে যদি আমরা কল্পনা করি তবে যেন দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ঘরে হাসিমুখে প্রবেশ করছেন। বালিকাদের দিকে যখন তাঁর নজর গেল তিনি তাদের দিকে স্বাগত দৃষ্টিতে তাকালেন এবং তাদের এই চমৎকার আমোদপ্রমোদ দেখে হাসলেন!!

তিনি কি সেই ব্যক্তি নন যাঁর ব্যাপারে আয়েশাকে (রা) যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি এভাবে উত্তর দেনঃ “তিনি ছিলেন অন্যদের মতই একজন মানুষ। তবে তিনি সবসময় হাসিমুখে থাকতেন।” এজন্যই নবীজি (সা) যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন, বালিকাদের প্রফুল্লতা ও আনন্দ আরো বৃদ্ধি পায় এবং ছড়িয়ে পড়ে।

এই হাদীসের চেয়ে ঐসব স্বামী ও বাবাদের প্রতি বড় বার্তা আর কি হতে পারে, যারা নিজেদের ঘরে ভ্রূকুঞ্চিত চেহারায় প্রবেশ করে এবং যাদের মুখ থেকে আদেশ-নিষেধ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না?

২) এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবীজি (সা) বালিকাদের গান উপভোগ করছিলেন না। তাদের গান মূলত অল্পবয়স্ক বালিকাদের জন্য উপযুক্ত ছিল, আর নবীজি (সা) তো তখন ছিলেন পূর্ণবয়স্ক। কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীর ও তাঁর বান্ধবীদের প্রফুল্লতা উপভোগ করছিলেন এবং তাদের আনন্দে আনন্দিত হচ্ছিলেন। আর এজন্যই তিনি শোয়ার সময় তাঁর মুখ ঢেকে রেখেছিলেন এবং দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রেখেছিলেন, যাতে বালিকারা তাঁর চেহারার দেখে দমে না যায়। নবীজির (সা) হুজরায় কোন অন্য কক্ষও ছিল না যেখানে তিনি যেতে পারতেন। আর এজন্যই তিনি বালিকাদ্বয়ের অনুভূতির দিকে খেয়াল রেখে নিজেকে এই সদয় উপায়ে আড়াল রাখলেন অর্থাৎ চেহারা ঢেকে দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রাখলেন, যতক্ষণ না তারা কোনরকম বিব্রতবোধ অথবা ভীতি ছাড়াই নিজে থেকে তাদের গান শেষ করে চলে যায়। বালিকাদের আমোদ-প্রমোদের সময় তিনি তাদের অনুভূতির দিকে যেভাবে খেয়াল রাখলেন এর চেয়ে বেশি সহৃদয়তা ও সৌন্দর্যের সাথে কারো অনুভূতির প্রতি সূক্ষ্ম আচরণ এবং সম্মান দেখানো আর কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

৩) আমোদ-প্রমোদ ও গানের মাধ্যমে আনন্দ ও খুশির অনুভূতি প্রকাশ করতে চাওয়ার যে সৃষ্টিগত স্বভাব সেটাও এই ঘটনা থেকে লক্ষ্যণীয়। আনন্দ হচ্ছে অন্তরের বাধভাঙ্গা ভাবাবেশের অবস্থা। সুস্থির ভাবগাম্ভীর্যতা

এবং কৃত্রিমভাবে এর প্রকাশ ঘটানো যায় না। এর প্রকাশ ঘটাতে হয় জীবন্তভাবে, আনন্দদায়ক কর্মকান্ড এবং আমোদপ্রমোদের মাধ্যমে যা আনন্দ ও সুখানুভূতিকে ছড়িয়ে দেয়। সে জন্যই নবী (সা) বিয়ে, ঈদ, মুসাফিরের আগমনের মত বিভিন্ন আনন্দময় উপলক্ষে সবাইকে যথাযোগ্য পরিমাণে আনন্দ উদযাপনের অনুমতি দিতেন। সাহাবারাও আনন্দ প্রকাশ করতেন। প্রত্যেক দল নিজ নিজ উপায়ে আনন্দ প্রকাশ করত যার মাধ্যমে তারা নিজেদের অনুভূতির উন্মোচন করতেঃ বালিকারা দফ বাজানো ও গানের মাধ্যমে, হাবশীরা বর্শা ও ঢালের নৈপুণ্য প্রদর্শন ও গানের মাধ্যমে এবং অন্যরা এসব আমোদপ্রমোদে অংশগ্রহণ ও উদযাপনের মাধ্যমে।[62]

আনন্দানুভূতির বহিঃপ্রকাশ মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য এবং একে উদযাপন করা নবীর সুন্নত, যা নবী কারীম (সা) নিজেই দেখিয়ে গিয়েছেন, যাঁকে উদার সরলপথ দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল।

৪) নবীজির (সা) হুজরা মসজিদে নববীর সাথে লাগানো ছিল, হুজরা থেকে বের হলেই মসজিদ পড়ত। তাঁর সাহাবীরা যখন মসজিদে কথাবার্তা বলতেন, তিনি তাঁদের আওয়াজ শুনতে পেতেন। আবু বকর (রা) মসজিদে থাকাকালীন তাঁর কন্যা আয়েশার (রা) কথাবার্তা ও হাসির আওয়াজ শুনতে পেতেন। নবীজির (সা) হুজরায় দফ বাজানো ও গানের মাধ্যমে এগুলোর আওয়াজ কিভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদে ছড়িয়ে পড়ল! নবীজির (সা) পবিত্র হুজরায় দফ বাজানো হচ্ছে এবং মসজিদে উপস্থিত সবাই তা শুনতে পাচ্ছে - ঈদের আনন্দ প্রকাশের রীতি সবার সামনে তুলে ধরার জন্য এটা কতই না সুন্দর উপায়!

৫) আয়েশার (রা) বুদ্ধি এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার ঢং সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি বালিকাদের গান গাওয়া থেকে নিষেধ করেন নি। রাসূলুল্লাহও (সা) আবু বকরকে (রা) বলেনঃ “তাদের ছেড়ে দাও।” আয়েশাও (রা) গান শুনতে থাকেন নি। আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বসেছিলেন কথা বলার জন্য। আয়েশা (রা) অপেক্ষা করতে থাকলেন, যখন দুজনই তাঁর ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে গেলেন, তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত বালিকাদ্বয়কে চোখ দিয়ে ইশারা করলেন, ফলে তারা চলে গেল, যেন তারা নিজে থেকেই ব্যাপারটির ইতি টানলেন এবং মন ভরে গান শুনে নিলেন। অল্প বয়স সত্ত্বেও পুরো ব্যাপারটি তিনি যেভাবে সামলে নিলেন এটা থেকে তাঁর নৈপুণ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

২৬। তোমাদের ভাই

আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রচন্ড ভালোবাসতেন। এর সাক্ষ্য রাসূলুল্লাহ নিজেই দিয়েছেন এ বলে যে, "সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।" রাসূলের (সা) ভালোবাসায় তিনি প্রতিটি মুহূর্তে অপেক্ষায় থাকতেন মদীনায় কি কি খাবার প্রবেশ করছে সেটার জন্য। হয়তো কোন বেদুইন মদীনায় বিক্রি করার জন্য এক থলে মাখন অথবা মধু নিয়ে প্রবেশ করছে, তখন তিনি সেটি তার কাছ থেকে নিয়ে নবীজিকে (সা) উপহার দিতেন। এরপর যখন এর মালিক তাঁর কাছে মূল্য চাওয়ার জন্য আসত, তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বলতেনঃ "তাকে এর মূল্য দিয়ে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাঁকে বলতেন, "তুমি কি এটা আমাকে উপহার হিসেবে দাও নি?" তখন তিনি বলতেন, "অবশ্যই হে রাসূলুল্লাহ! কিন্তু আমার কাছে এর মূল্য পরিশোধের মত অর্থ নেই।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হেসে ওঠার বেশি কিছু করতেন না এবং উপহারকৃত দ্রব্যের মালিককে মূল্য পরিশোধ করে দেয়ার জন্য অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন।

এ ধরনের রসিকতা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবী আবদুল্লাহ মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ফুটে উঠত।

একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার যে, এই আবদুল্লাহ মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। তাঁকে অনেকবার নবীজির (সা) মাতাল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। এরপর তাঁকে শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত করা হত। এরকমই একদিন এই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বেত্রাঘাত করা শেষ করার পর একজন সাহাবী বলে উঠলেনঃ "আল্লাহর লানত তার ওপর। কতবারই না তাকে মদপানের দায়ে ধরে আনা হল।" নবী কারীম (সা) এ কথা শুনে জবাব দিলেনঃ "তাকে অভিশাপ দিও না। আল্লাহর শপথ, আমি জানি যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।"[63]

***এই ঘটনা থেকে মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদী চরিত্রের যে চমৎকার দিকগুলো ফুটে উঠেছে সেগুলো নিম্নবর্ণিতঃ

১) চরিত্রের মধ্যে দোষত্রুটি এবং মহত্ব ও পবিত্রতার মিশ্রণ থাকা এই সাহাবী এবং মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মধ্যকার পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কি অবাক করা ব্যাপার নয়? তাদের এই সম্পর্কে তো ভালোবাসা, পারস্পরিক রসিকতা এবং ঘনিষ্ঠতা সবই রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নববী সমাজে কোন বিভাজন ছিল না অথবা সেই সমাজ থেকে কোন দলকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হত না, তাদের ত্রুটি যত বেশিই হোক না কেন। তাদের সৎকমর্শীলতার ব্যাপ্তিতে পার্থক্য ছিল, তাদের মধ্যে কেউ ছিল অগ্রগামী, কেউ ছিল মধ্যপন্থী, আবার কেউ ছিল নিজেদের ওপর জুলুমকারী। এরপরও তাদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ও সংহতি ছিল। কেউই সমাজচ্যুত, লাঞ্ছনা এবং প্রান্তীয়ভাবে বসবাস করত না। সমাজে সবাই ঘনিষ্ঠতা ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করত। এরপরও সমাজে ভুলচ্যুতি ঘটত যেগুলোর প্রভাব এবং আনুষঙ্গিকতা খুবই সীমিত থাকত কারণ সমাজে প্রীতিবন্ধনের পরিবেশ জারী ছিল, যা সমাজে এসব বিচ্যুতিকে বাড়তে দিত না। কেউ যদি ভুল করেই ফেলত, তার মু'মিন ভাই তার হাত ধরে ফেলত যাতে সে আরো বিচ্যুতির দিকে এগিয়ে না যায় এবং তার থেকে বিচ্যুতির কারণ ছিন্ন করে দিত।

২) রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আবদুল্লাহর (রা) অন্তরের ইতিবাচক দিকের দিকে ইশারা করাটা কতই না চমৎকার, যদিও সেসময় আবদুল্লাহকে (রা) শাস্তি দেয়া হচ্ছিল তাও আবার পুনঃপুনঃকৃত একটি ভুলের জন্য। কিন্তু এরপরও নবী (সা) আবদুল্লাহর (রা) ইতিবাচক দিকের দিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা। আর এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে আবদুল্লাহর (রা) একার নয়, বরং সকল মু'মিন একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সঠিক ঈমানের শর্তই তো হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এই বৈশিষ্ট্যটিকেই তুলে ধরলেন এবং একজন ব্যক্তিকে এই গুণের কারণে প্রশংসা করলেন। এটা হচ্ছে স্বতন্ত্র তারবিয়াতের রীতি। এর ওপর ভিত্তি করে অন্তরে কল্যাণের অংশকে প্রসারিত করা হয়, এর সাথে সম্পর্ক গড়ার ওপর জোর দেয়া হয় এবং এর মাধ্যমে উন্নতির পথ বাতলে দেয়া হয়। যদি কারো দ্বারা গুনাহ হয়েই যায়, তবে সে যে এর শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে অবনতির তলানিতে চলে না যায়। আবদুল্লাহর (রা) অন্তরের কথা চিন্তা করা যায়! তাঁর কানে নবীজির (সা) এই কথা পৌঁছায় এবং এটি তাঁকে কতই না আনন্দে উদ্বেলিত এবং উৎসাহে উদ্দীপ্ত করেছে। তিনি যেন এর দ্বারা এসব বিচ্যুতি ও গুনাহর ঊর্ধ্বে উঠে সর্বোচ্চ দিগন্তে আরোহণ করতে সক্ষম হন।

এসব বিচ্যুতি থেকে মুক্তি পাওয়ার পিছে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ। এটি অন্তরে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, এ বিচ্যুতিগুলো মূলত দুর্ঘটনা, অন্তরের মূল অবস্থা নয় আর আমাদের অন্তরের ওপর আধিপত্যকারীও না। অন্তরের মূল অবস্থা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা।

গুনাহকারীদের ইতিবাচক দিকের প্রশংসা এবং তাদের অন্তরে কল্যাণের প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি করা নবীজির (সা) রীতি, যদিও আমরা কখনো কখনো তা ভুলে যাই। আমরা গুনাহকে এমন অভেদ্য দুর্গ ও সংকীর্ণ বন্দীশালা মনে করে যেটার মধ্যে আমরা গুনাহকারীদের আটকে রাখতে চাই। আমরা তাদের কৃত গুনাহ বা ভুল ছাড়া তাদেরকে চিনতে বা স্মরণ করতে চাই না। আমরা ভুলে যাই যে, এর মাধ্যমে আমরা তাদের বিরুদ্ধে শয়তানকেই সাহায্য করি, যদিও আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না।

কিন্তু মদ্যপানের একই অপরাধ বারবার করা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও নবীজি (সা) তার সবচেয়ে সম্মানিত ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যটিকে উল্লেখ করেনঃ “আমি ভালোভাবেই জানি, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।”

৩) আবদুল্লাহর (রা) এই গুনাহ ছিল স্পষ্ট, বরং কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এখানে সম্ভাবনা ও ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই। এই গুনাহ ছিল মদ্যপান, যে ব্যাপারে নবীজি (সা) দশজনকে অভিশাপ দিয়েছেন। যদিও নবী (সা) তখন তাঁর ওপর মদপানের হদ্দ জারী করছিলেন, এরপরও শরয়ী শাস্তির অতিরিক্ত কিছু যেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা হয় – তাঁর সেই অধিকারকে সংরক্ষণ করেছেন তিনি। বরঞ্চ এটিকে নবী (সা) শয়তানকে সাহায্য করা হিসেবে দেখেছেন। এজন্যই তিনি আবদুল্লাহর (রা) ইতিবাচক দিকের দিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁকে ভুলে পথে ছেড়ে দেন নি।[64]

এই ঘটনাকে সামনে রেখে আমরা যখন দেখি যে, আমরা অনেকসময় আমাদের অনেক মুসলিম ভাইদের সাথে দ্বন্দে অনড় থাকি, যারা মদপানের মত এত বড় ও স্পষ্ট গুনাহও করে নি। অনেকসময় তাদের ভুলগুলো ইজতিহাদী পরিসর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আর ইজতিহাদের ভিন্নতায় একাধিক দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এরপরও আমরা না বুঝেই এটিকে টেনে হিঁচড়ে ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই এমন শরয়ী ভুল বানিয়ে দেই। এরপর আমরা বিরোধিতার ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ ও ঝগড়ার এমনটা ন্যায্যতা প্রদান করি এমনটা ভেবে যে, এটা দ্বীনের অংশ এবং দ্বীনের খাতিরে কৃত। অথচ নবী কারীম (সা) এমন লোকের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন যিনি অনেকবার একই গুনাহর পুনরাবৃত্তি করেন, এমনকি কি তাঁর ব্যাপারে বলা হয়ঃ “তাকে

কতবারই না (শাস্তি দেয়ার জন্য) নিয়ে আসা হল।” এরপরও নবীজি (সা) এটাকে ব্যবহার করে অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসেবে আবদুল্লাহকে (রা) গালিগালাজ করার অনুমতি দেন নি আর না তো আল্লাহ এটাকে শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। ফলে বাকি রইল সেই ব্যক্তিত্ব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, রাসূলের (সা) সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন, তাঁর সাথে রসিকতা করেন এবং তাঁকে উপহার দেন।

এ ঘটনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাসমূহ খুবই চমৎকার। যদি আমরা এগুলোকে নবুওয়াতী হেদায়াতের আলোকে দেখি, তাহলে কল্যাণের পরিসর আরো বিস্তৃত হবে এবং অনেকের গুনাহর পথ সীমিত হয়ে যাবে, সমাজের বন্ধন শক্তিশালী হবে এবং অনেক সমাজবিনাশী সমস্যার সমাধান হবে, যেগুলোকে বিভিন্ন ভুল অজুহাত দিয়ে ন্যায্যতাপ্রদান করা হয়।

২৭। ক্রোধান্বিত হয়ো না

নবী কারীম (সা) তাঁর ঘরে ফিরছিলেন এবং নিজ হুজরাগুলোর নিকটবর্তী হলেন। তিনি নিজের চারিত্রিক গুণাবলীর সবটুকু কাজে লাগিয়ে ও সুখশান্তি ত্যাগ করে, তাঁর সম্মান ও কল্যাণময়ীতাকে কাজে লাগিয়ে দাওয়াত ও রিসালাতের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার পর প্রতিদিনের মত দৈহিক ও মানসিকভাবে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরছিলেন। তাঁর তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল বিশ্রাম ও পারিবারিক নৈকট্য যা তার দেহ ও মনকে স্বস্তি দেবে।

নবী (সা) হেঁটে আসছিলেন। তাঁর পরিধানে ছিল নাজরানী একটি জামা যেটার পাড় ছিল অনেক রুক্ষ। তিনি তাঁর গলায় কাপড়ের একটি অংশ পেঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং বাকি অংশকে কাঁধের ওপর দিয়ে ফেলে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর হুজরায় পৌঁছে গেলেন এবং তাতে প্রবেশ করতে যাবেন এমনসময় এক বেদুইন তাঁর দিকে ছুটে এল এবং পেছন থেকে তাঁর জামা ধরে তাঁকে প্রচন্ড টান দিল, যা নবীজিকে (সা) চমকে দিল। এই হঠাৎ প্রচন্ড হেঁচড়ানোর ফল এই হয়েছিল যেঃ

ক) নবীজি (সা) ভারসাম্য হারিয়ে পিছনের দিকে বেদুইনের গলার ওপর পড়ে যান,

খ) তাঁর জামাটি ছিঁড়ে যায়,

গ) জামার প্রান্ত নবীজির (সা) গলায় বসে দাগ ফেলে দেয়। নবীজির (সা) গলা ছিল একদম ফর্সা, চকচকে রৌপ্যের মত। সেজন্য বেদুইনের আচমকা টান দেয়ার ফলে নবীজির (সা) জামার প্রান্ত তাঁর গলায় বসে গিয়ে যে দাগ পড়ে যায় তা আনাস (রা) লক্ষ্য করেন।

তাই এটাই প্রত্যাশিত ছিল যে, বেদুইনটি যা ঘটেছে সেটার জন্য ভয় পেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ভদ্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কিন্তু তেমনটা হয় নি। সে বরং নবীজিকে (সা) জোরে ডাক দিলঃ “হে মুহাম্মাদ!”

এটা খুব রুক্ষভাবে ডাকা ছিল। অথচ আল্লাহ বলেনঃ “তোমরা নিজেদের পরস্পর যেভাবে ডেকে থাকো, রাসূলকে সেভাবে ডেকো না।”

এরপর সে রাসূলুল্লাহকে (সা) বললঃ “আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে আমাকে কিছু দাও।” এই চাওয়াটাও রুক্ষ হল।

এখন কেউ যদি পুরো ঘটনাটি আবার চোখ বন্ধ করে কল্পনা করে। বেদুইনটি একের পর এক এমন কর্মকান্ড করেছে যা নবীজিকে (সা) উত্তেজিত করতে পারত? প্রথমত, প্রচন্ড হেঁচকা টানে নবীজি (সা) পেছন দিকে হেলে পড়েন, এরপর তাঁর জামা ছিঁড়ে যায়, এরপর জামার ঘষায় তাঁর পবিত্র গলায় দাগ পড়ে যায়, এরপর বেদুইনটি তাঁকে রুক্ষভাবে ডাকে এবং রুক্ষভাবে তাঁর কাছে অর্থ চায়।

চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই কাজগুলোর যেকোন একটি অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। পরপর এই উস্কানীমূলক কাজগুলোর প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত সেটা বুঝা কঠিন নয়!

কিন্তু নবী কারীম (সা) এর প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। তিনি সমস্ত বোধগম্যতা ও আদর্শবাদকে অতিক্রান্ত করে এক উচ্চতর দিগন্তে পৌঁছে যান আর সেটা হচ্ছে মুহাম্মাদী শ্রেষ্ঠত্বের দিগন্ত।

নবীজি (সা) বেদুইনের দিকে ঘুরলেন কিন্তু কোন আপত্তি জানালেন না। তিনি হাসলেন কিন্তু ভ্রুকুঞ্চিত করলেন না। তিনি বেদুইনের সাথে ভালো ব্যবহার করলেন, তাকে শাস্তি দিলেন না। আনাস (রা) এই দৃশ্য দেখেছিলেন। তিনি বলেন যেঃ “রাসূলুল্লাহ (সা) বেদুইনটির দিকে ঘুরলেন, হাসলেন, এরপর তাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিলেন।[65]

*** এ ঘটনার রেওয়ায়েত এখানেই শেষ। কিন্তু সমস্ত মন দিয়ে আমাদের গভীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা করার জন্য এ ঘটনায় আবার ফিরে আসতে হবে শিক্ষা নেয়ার জন্য। এ ঘটনা থেকে তিনটি শিক্ষা পাওয়া যায়ঃ

১) এ ধরনের আচমকা ও রুক্ষ উস্কানীমূলক কর্মকান্ডের ফলে অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠা ও প্রতিক্রিয়ার দিকে ঠেলে দেয়াটাই স্বাভাবিক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্রিয়া যেরকম উস্কানীমূলক, দ্রুত ও হঠাৎ আসে তেমনি প্রতিক্রিয়াও ক্রোধপূর্ণ, দ্রুত ও আচমকাই হয়।

কিন্তু নবীজি (সা) এসব উস্কানীর বিরুদ্ধে পদার্থবিজ্ঞানের “প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে” – এ সূত্র অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখান নি, বরং অন্য একটি সূত্র অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখান। সেটা হচ্ছে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের সূত্রঃ “নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত” [সূরা ক্বালামঃ ৪]।

বেশি বিস্ময়কর হচ্ছে, নবীজির (সা) প্রতিক্রিয়াটি দ্রুত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে। অথচ এ প্রতিক্রিয়াটি দেখে মনে হবে তা প্রচন্ডরকম সুচিন্তিতভাবে নেয়াঃ প্রথমে বেদুইনটির দিকে ঘোরা যা তাকে গুরুত্ব দেয়ার দিকে ইঙ্গিত করে, এরপর মুচকি হাসা যা তাকে স্বাগত জানানোর প্রমাণ, অতঃপর তাকে সম্মান জানানো ও তার প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পদ দান করা। এগুলো নবীজির (সা) মনস্তত্ত্বে চারিত্রিক গুণাবলীর গভীরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই ঘটনা থেকে নববী যে শিক্ষা আমরা পাই তা আমাদের অন্তরের ক্রোধের আগুনকে প্রশমিত করতে এবং আমাদের অন্তরে প্রশান্তির বর্ষণে সহায়তা করবে। এ শিক্ষা আমাদের কাজের লাগাম আমাদের আবেগের হাতে তুলে দেয়ার বদলে আমাদের আবেগের লাগাম নিজেদের হাতে নিতে শেখায়।

২) নবীজিই (সা) সেই ব্যক্তি যাঁর কাছে একজন যখন উপদেশের জন্য আসল, তিনি বললেনঃ “ক্রোধান্বিত হয়ো না।” এরপর সে ব্যক্তি আবারো বললঃ “আমাকে আরো উপদেশ দিন।” নবী (সা) আবারো বললেনঃ “ক্রোধান্বিত হয়ো না।” নবীজি আরো বলেনঃ “সেই শক্তিশালী যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।” তিনি এতটা প্ররোচিত হয়েও রাগান্বিত হন নি। ক্রোধে প্ররোচিত হওয়ার সময় তিনি নিজেকে প্রচন্ডভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলেন।[6667]

রাসূলুল্লাহর (সা) মধ্যে দাওয়াহ ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব এবং কথা ও কাজের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল, যাতে তাঁর এই বিস্ময়কর পূর্ণতা দ্বারা তিনি উত্তম আদর্শের পূর্ণাঙ্গ নমুনা হতে পারেন, যেজন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল। কোন দাওয়াতের বাণী যতক্ষণ এর প্রবক্তার ব্যক্তিত্বে জ্বাজল্যমানভাবে প্রতিফলিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে দাওয়াতের প্রভাব নিষ্প্রভ থাকে।[68]

৩) এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়, এই বেদুইন এরকম আত্মবিশ্বাসের সাথে কিভাবে রাসূলুল্লাহর (স) কাছে চাইতে পারল, এমনকি সে এ ব্যাপারে রুক্ষতা ও জোরাজুরি কিভাবে করতে পারল? সে কি শাস্তি ও কঠোর

প্রতিক্রিয়ার ভয় করে নি ?

এর সুস্পষ্ট জবাব হলঃ ঐ বেদুইন মুহাম্মাদের (সা) নিরাপত্তার অধীনে বসবাস করত, যা তাঁকে নিজের মত প্রকাশ ও অধিকার চাওয়ার মত নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল। সে কোন ভীতি অথবা অপমানের আশঙ্কা ছাড়াই নিজের জীবন যাপন করতে পারছিল। আর এজন্যই যারা নিজেদের হক চাইত, তারা তাদের কর্তব্যসমূহও পালন করত ও নিজেদের নবীর রিসালাত পুরো দুনিয়ার কাছে পৌঁছে নিয়ে গিয়েছিল। এ জন্য তারা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসকে স্বস্তায় বিলিয়ে দিতে পারত আর সেটা হচ্ছে তাদের অন্তরের মধ্যে থাকা জীবন, যে অন্তরের ওপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজত্ব করতেন। এ প্রশিক্ষণই তাদের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছে, তাদের আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে এবং তাদেরকে নিজেদের মূল্য, ইনসানিয়াত এবং গুরুত্ব অনুভব করিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই ছিল ন্যায়পরায়ণ, আত্মবিশ্বাসী এবং স্পষ্টবাদী।

অপরদিকে যেখানে ভয় দেখিয়ে জবানকে বন্ধ রাখা হয়, সেখানে অন্তর হয় হিংসা-বিদ্বেষের উর্বরভূমি।

২৮ । ঘরের কাজ

নবীজির (সা) ঘর থেকে আল্লাহ সকল অপবিত্রতা দূর করে তাকে উত্তমরূপে পবিত্র করেছেন। আয়েশাকে (রা) যখন কয়েকজন তাবেয়ী জিজ্ঞাসা করলেনঃ "যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার নিকট থাকতেন, তখন তিনি ঘরে কি করতেন ?", তখন তিনি এর যে জবাব দেন তা থেকে এ ঘরের ভেতরের খবর অনেকটাই জানা যায়।

এ প্রশ্ন ছিল এক জনব্যক্তিত্ব নিয়ে, তিনি কিভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যাপন করতে তা নিয়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরের বাইরে উম্মাহর বিষয়াদি সামলাতে, তাদের বোঝা বহন করতে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করে দরজার খিল লাগিয়ে দিতেন এবং নিজের পরিবার নিয়ে ব্যক্তিগত জীবন কাটাতেন, সেই সময়টা কেমন ছিল ? তিনি কি করতেন তখন ?

আয়েশা (রা) এই প্রশ্ন আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সাথে নিলেন এবং নবীজির (সা) ঘরোয়া জীবন সম্পর্কে জানার একটি পথ করে দিলেন, যাতে আমরা জানতে পারি, নবীজি (সা) তাঁর ঘরে পরিবারের সাথে কিভাবে ব্যক্তিগত জীবন কাটাতেন। আয়েশা (রা) খুব সংক্ষেপে অলঙ্কারপূর্ণভাবে নবীজিকে (সা) এভাবে বর্ণনা করেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ঘরে অবস্থান করতেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে কোমল ও উদার ব্যক্তি। তিনি একজন মানুষই ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখে হাসি লেগেই থাকত। তিনি তোমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারের খেদমতে লেগে থাকতেন। তিনি তাঁর জুতা মেরামত করতেন, তাঁর জামা সেলাই করতেন, ভেড়ার দুধ দোয়াতেন, নিজের কাজ নিজে করতেন। তিনি ঘরের কাজ করতেন, যেমন কিনা তোমরা করে থাক। এরপর যখন সালাতের সময় হত তিনি সালাতের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। আমি কখনো তাঁকে তাঁর স্ত্রীদের অথবা খাদেমদের ওপর হাত তুলতে দেখিনি।"[69]

***এটা হচ্ছে নববী গুণাবলী থেকে সৌরভময় কয়েকটি গুণ, যা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) খুবই চমৎকার, সংক্ষেপে ও আলঙ্করিতার সাথে তুলে ধরেছেন।

এ হাদীস থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়াদি হচ্ছেঃ

১) আমি মনে করি না, আয়েশা (রা) তাঁর "তিনি একজন মানুষই ছিলেন।" – এই কথা দিয়ে নবীজি (সা) যে ফেরেশতা নয়, বরং মানুষ ও রাসূল সেটা সুনিশ্চিত করছেন। তিনি এর দ্বারা আরো বিশেষ কিছু বুঝিয়েছেন আর সেটা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পরিবারের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে অন্যদের মতই একজন মানুষ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি কখনো নেতা অথবা দায়িত্বশীল কিংবা ইমাম হিসেবে নিজ ঘরে প্রবেশ করতেন না, করতেন একজন স্বামী হিসেবে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রশান্তির জীবন যাপন করতে। তিনি তাঁর স্বামীসুলভ আচরণে তাঁর চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিফলন ঘটান। বাইরের মানুষের সামনে নবীজির (সা) যে রূপ ছিল, ঘরের মানুষের সামনে তিনি সেই রূপ নিয়ে থাকতেন না। পরিবারের সাথে তিনি সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পারিবারিক সময় যাপন করতেন। স্ত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন একজন প্রেমময় ও সহৃদয় স্বামী। এই তিনিই (সা) আদমের সমস্ত সন্তান তথা মানবতার সর্দার ও ইমাম। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এমন যে, তাঁর চেহারার দিকে সম্ভ্রম ও সম্মানের সাথে তাকালেও কখনো মন ভরবে না। সেই তিনিই ঘরে পরিবারের সামনে প্রথমত একজন স্বামী হিসেবেই থাকতেন।

এই নববী শিক্ষা আমরা অনেকেই ভুলতে বসি যখন আমরা অনেকেই বাইরে পাওয়া সম্মান ও উপাধি নিয়ে আমাদের ঘরে ফিরি, যেন আমরা নিজেদের ঘরে বিশেষ সম্মান ও বিশিষ্টতা নিয়ে থাকতে পারি, অথচ এসব উপাধি দরজা দিয়ে প্রবেশের সময়ই আমরা বাইরে রেখে আসি, যাতে ঘরে একজন মানুষ প্রবেশ, যে কিনা অন্য মানুষের মতই।

২) "তিনি তাঁর পরিবারের খেদমতে লেগে থাকতেন" – উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার (রা) এই কথা থেকে আমাদের মনে একটা প্রশ্নের উদয় হতে পারে আর তা হচ্ছেঃ আয়েশা (রা) কি ঘরে অনেক কাজ ও তাঁর দুর্ভোগের অভিযোগ করছেন, যেখান্ব স্বয়ং নবীজির (সা) পর্যন্ত তাঁর ঘরে তাঁকে সাহায্য ও খেদমত করতে কাজ করতে হত ?

আয়েশার (রা) হুজরাটি ছিল দেয়ালের নিকট। এর আকারও ছিল ছোট, যেটার দৈর্ঘ্য ১০ গজের বেশি ছিল না। এর প্রস্থ ছিল ৭ মিটার (প্রায় ৫মি., ৫মি. X ৩মি.)।

আর সেখানে কাজের অবস্থা ছিল এই যে, পুরো দুমাস চলে যেত, এরপরেও খাদ্য রান্নার জন্য আগুন জ্বলত না। তাহলে সেখানে করার মত কঠিন কোন কাজ কি থাকত, কাজে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা তো দূরের

কথা, যার মাধ্যমে নবীজি (সা) তাঁর পরিবারের সদস্যদের খেদমতে নিয়োজিত হতেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, নবী কারীম (সা) অনেক কাজ করতেন অথবা কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে যেতেন ব্যাপারটা তেমন নয়। বরং এখানে আরো গভীর অর্থ আছে। নবীজির (সা) এই কাজ হচ্ছে মূলত সংসারের কাছে সাহায্য করা এবং দাম্পত্য জীবনে পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণের দিকটি সামনে আনা এবং সূরা রূমের ২১ নং আয়াতে বর্ণিত سكن এর অনেকগুলো অর্থের একটি অর্থ বাস্তবায়ন করে দেখানোর জন্য। আল্লাহ এই আয়াতে "لتسكنوا اليها" (তোমরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়) বলেছেন, "لتسكنوا معها" (তোমরা তাদের সাথে বাস কর) বলেন নি।

এ সহজ কাজগুলো স্ত্রী অন্তরে গিয়ে পৌঁছে, সেইসাথে ভালোবাসা, প্রেম ও সহৃদয়তা দ্বারা পরিপূর্ণ বিস্তারিত স্মৃতিরও সৃষ্টি করে। এটি স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর নৈকট্যভাব এবং তাদের দুজনের মধ্যে রূহানীয়াত ও আবেগপূর্ণ মেলামেশার সৃষ্টি করে।

কেউ যদি কোন কাজ দ্বারা তার পরিবারের খেদমত করতে চায় বা এ ব্যাপারে নববী কোন গুণ দ্বারা নিজেকে অলঙ্কৃত করতে চায় তার বলা উচিতঃ 'এটা আমাদের সবার ঘর যেমন কিনা এটা আমাদের সবার জীবন।' এ ধরনের ভাবপূর্ণ অভিব্যক্তি দাম্পত্য জীবনে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন সৃষ্টি করে এবং স্ত্রীর চোখে স্বামীর নম্রতা ও সরলতাকে বৃদ্ধি করে।

৩) আমরা নবীজির (সা) ঘরের দিকে তাকিয়ে এটিকে আকারে ছোট এবং এতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনেক কম পেয়েছি। কিন্তু নবীজির (সা) চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব এ ঘরকে ঘনিষ্ঠতা ও আনন্দে ভরপুর একটি বিশাল ধারকে পরিণত করেছে। এ ঘর থেকে হাসির প্রতিধ্বনি ভেসে আসে, মুচকি হাসির দ্বীপ্তি এখানে পাওয়া যায়। এ ঘর আনন্দ ও সুখের বসন্তধারায় উদ্বেলিত, যেমন কিনা আয়েশা (রা) বলেনঃ "তিনি তোমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তবে তাঁর মুখে হাসি লেগেই থাকত।"

নবীজির (সা) ঘরে কৃত্রিম ও বিরক্তিকর রাশভারীতা কিংবা ভ্রুকুঞ্চনের কোন স্থান ছিল না, বরং সেখানে ছিল হাস্যরস, ঘনিষ্ঠতা ও মুচকি হাসির সমাহার। সেইসাথে ছিল পবিত্র জীবনকে উপভোগ করা, যা ঘরকে আনন্দ-খুশিতে ভরপুর করে দিত, যেন তাঁর পরিবার জান্নাতের এক টুকরো কোণায় বসবাত করতেন।

৪) স্ত্রীর সাথে আচরণের এ ধরনের পরিণত কৌশল এবং স্বামীর নিজে থেকেই সংসারের কাজে অংশগ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া, যা ঘনিষ্ঠতা ও কমনীয়তার বহিঃপ্রকাশ, শীঘ্রই স্বামীর এমন বড় অবস্থান তৈরী করবে যে, তাকে ধারণ করার জন্য স্ত্রীর হৃদয় ও অন্তরও যথেষ্ট হবে না। স্বামীর এ ধরনের সুমহান আচরণ তার উপস্থিতিকে আনন্দময় ও বন্ধুভাবাপন্ন করে তুলবে এবং তার অনুপস্থিতিকে একাকীত্ব ও প্রিয়জন বিয়োগের কারণ করে তুলবে। সেই স্বামী শীঘ্রই তার স্ত্রীর চোখে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত হবে।

যারা শীতল ও শুষ্ক দাম্পত্য জীবনের অভিযোগ করেন তাদের এই নববী শিক্ষা থেকে শেখা উচিত যে, এ ধরনের চমৎকার ছোট ছোট কাজগুলো দ্বারা তাদের সাংসারিক জীবনে পুনরায় উষ্ণ রক্তের সঞ্চার হবে। এর ফলে স্ত্রীর অন্তরে আর কোন খালি জায়গা থাকবে না, এর পুরোটাই স্বামী দখল করে নেবে। স্ত্রীকে সাংসারিক জীবনে বাস্তব অর্থে অংশগ্রহণের অনুভব যোগাবে এবং তার প্রতিটি দিনকে মুচকি হাসির রঙে রাঙিয়ে দেবে।

৫) নববী জীবনের এই ভারসাম্য বিস্ময়কর। নবী (সা) মানুষের সাথে হাসিমুখে থাকতেন, আবার ঘরে ফিরলেও হাসি তাঁর মুখে লেগেই থাকত। তিনি ছিলেন মানুষের জন্য প্রেরিত কল্যাণময় বাতাসের মত, আবার ঘরেও তিনি পরিবারের খেদমতে লেগে থাকতেন। তিনি ছিলেন মানুষের জন্য মানুষের মধ্য হতে সর্বোত্তম কল্যাণকারী এবং পরিবারের জন্য ছিলেন সর্বোত্তম।

অনেক মানুষই এই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তারা জনপরিসরে খুবই নম্র ও ভদ্র আচরণ দেখিয়ে বেড়ান, কিন্তু তাদের সমস্ত ভ্রূকুঞ্চন ও আচরণগত শীতলতা তাদের স্ত্রীদের জন্য জমা রেখে দেন। তাদের স্ত্রীরা তাদের গোঁমড়া মুখ, বিরক্তভাব এবং রাগ ছাড়া আর কিছুই দেখার সুযোগ পায় না। অথচ হাসিখুশি ও উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বড় অধিকার তাদেরই। নবী কারীম (সা) মানুষের সাথে উত্তম গুণাবলী দ্বারা প্রশস্ত আচরণ করতেন, আবার তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর উত্তম আচরণ পেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ ছিলেন।

৬) অনেকের 'ক্বাওয়ামা'-র দায়িত্বের বুঝ ঠিকমত নেই এবং 'ক্বাওয়ামা'-কে তারা নিরর্থক অহংকার, আধিপত্য ফলানোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। তাদের ভ্রূকুঞ্চিত ছাড়া অন্য অবস্থায় দেখা যায় না, আর না তাদের মুখ থেকে আদেশ ও নিষেধ ছাড়া অন্য কিছু শোনা যায়। তাদের জন্যই উপরোল্লিখিত এই নববী শিক্ষা সামনেই আছে।

৭) আমরা দোয়া করি, আল্লাহ যেন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার (রা) ওপর খুশি হন। এটা আল্লাহরই হেকমত ও ইচ্ছা ছিল যে, নবীজির (সা) ওফাতের পর প্রায় আরো অর্ধশতাব্দী আয়েশা (রা) বেঁচে থাকবেন এবং এর ফলে তাঁর মাধ্যমেই আমরা নবীজির (সা) ঘরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা জানতে পারি। উম্মতে মুহাম্মাদী আয়েশা (রা) থেকেই তাদের নবীর হেদায়েত জানতে পেরেছে। আল্লাহ আয়েশার (রা) ওপর খুশি হন এবং তাঁকে খুশি করে দিক এবং উম্মতের মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুক।

২৯ । রুমালের দিন

রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদের এক পাশ থেকে এর দেয়ালের নিকটে একটি ছোট ঘর দেখা যেত, যেটার ছাদ ছিল নিচু এবং যেটাতে একজনের বেশি থাকা সম্ভব ছিল না। এই ঘরটি একটি কালো মহিলার বাসস্থান ছিল। এটা ছাড়া তার অন্য কোন থাকার জায়গা ছিল না। সে নবীজির (সা) ঘরে প্রচুর আসা-যাওয়া করত আয়েশার (রা) সাথে কথাবার্তা ও মেলামেশার জন্য। যখন কথাবার্তা শেষ হত, মহিলাটি কবিতার একটি পংক্তি আবৃত্তি করত, যেটি সে তার প্রত্যেক বৈঠকেই করতঃ

"রুমালের দিন হচ্ছে আমার রবের বিস্ময়গুলোর একটি

তিনিই তো আমাকে কাফেরদের শহর থেকে উদ্ধার করেছেন"

আয়েশা (রা) এই পংক্তির বারংবার আবৃত্তিতে অবাক হতেন। রুমালের দিন আবার কি? খোদার সেই বিস্ময়কর কাজটিই বা কি যা এই কালো মহিলার অন্তরে এতটাই ছাঁপ ফেলতে সক্ষম হয়েছে যে প্রত্যেক বৈঠকেই তাকে এটা আবৃত্তি করতেই হত? আয়েশা (রা) তাকে বললেনঃ "তুমি আমার সাথে প্রত্যেক বৈঠকেই কেন এই আবৃত্তি পাঠ কর?" এরপর মহিলাটি তার কাহিনী বলা শুরু করল। এ ছিল বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়।

মহিলাটি ছিল মক্কায় একটি আরব গোত্রে দাসী। তারা তাকে মুক্ত করে দেয়। মহিলাটি মুক্ত হওয়ার পরেও তাদের সাথে থেকে যায়। অনেক দাস-দাসীর অবস্থাই এমন ছিল। মুক্ত হওয়ার পরে তারা স্বাধীন জীবন যাপনের কোন উপায় খুঁজে পেত না।

তাদের সাথে থাকাকালীন সময়ে ঐ গোত্রের এক মেয়ে বিয়ের কনের সাজে বেরিয়ে এলো এবং তার পরনে ছিল চামড়ার তৈরী একটি লাল রুমাল। সে গোসল করার জন্য গোসলখানায় প্রবেশ করল এবং তার রুমালটি গোসলখানার নিকটেই রাখল। একটি চিল পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এবং রুমালটিকে গোশত মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কনে যখন বের হল সে তার রুমাল খুঁজে পেল না। সে চিৎকার করে তার পরিবারের সদস্যদের ডাকল। তারাও খোঁজাখুঁজি করে রুমালটি পেল না। তারা সেই কালো মহিলাটিকে এই রুমাল চুরির

জন্য দায়ী করল। তারা তাকে শাস্তিও দিল। তারা তার দেহ তল্লাশী করতে লাগল এবং এ থেকে তার গোপনাঙ্গও বাদ গেল না। এ সময়টি ছিল কৃষাঙ্গ মহিলাটির জন্য দুশ্চিন্তাময় ও কঠিন সময়। সে নিজের ওপর হওয়া নির্যাতন ও জুলুম অনুভব করতে পারল, কিন্তু এ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায়ও খুঁজে পাচ্ছিল না। তার কোন গোত্র অথবা নিকটাত্মীয় ছিল না, যাদের সাহায্য সে পেতে পারত। তার কোন শক্তি ছিল না, যার দ্বারা সে নিজের ওপর থেকে জুলুম প্রতিহত করতে পারত।

মহিলাটি নিজ সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এমন কোন সাহায্যকারী পেল না যে তাকে সাহায্য করবে, এমন কোন উদ্ধারকারী পেল না যে তাকে উদ্ধার করবে। সে নিজ গোত্রের উপাস্য ও মূর্তিদের ভুলে গেল এবং কেউ চরম বিপদে পড়লে যেভাবে প্রাণপণে আল্লাহকে ডাকে, সেভাবে মহিলাটি আল্লাহ অভিমুখী হল এবং এ ঘটনায় তার দায়মুক্তি প্রকাশ এবং এই দুর্ভোগ থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করল। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করলেন, যেভাবে তিনি সব বিপদে পতিত মানুষের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের বিপদ দূর করেন। মহিলাটির প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত সমাধান চলে আসল এবং আল্লাহ সম্পর্কে যে ধারণা করেছিল, তিনি এর চেয়েও বেশি দয়াময়।

যে চিলটি রুমাল নিয়েছিল, সেটি ঐ রুমাল নিয়েই অগ্রসর হল। মহিলাটির চারপাশে তখনো অভিযোগকারী গোত্রের লোকজনরা দাঁড়িয়ে আর মহিলাটি তখনো তার দুরাবস্থায় বিদ্যমান। চিলটি তাদের মাথার ওপর উড়ছিল এবং তারা ওটার দিকে তাকিয়ে ছিল। চিলটি হঠাৎ তাদের মাঝে কিছু একটা ফেলল। তারা সেটি তুলে নিল। এটি তাদের কন্যার সেই হারানো রুমাল ছিল। মহিলাটি নির্দোষ প্রমাণ হল এবং তার দুর্ভোগের আগুন নির্বাপিত হল। এর সে সত্যবাদীর মতই বললঃ "তোমরা আমাকে এ ব্যাপারেই অভিযুক্ত করেছিলেন, অথচ আমি ছিলাম এ ব্যাপারে নির্দোষ। নাও এখন এটি তোমাদের সামনেই।" এরপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হিজরত করে চলে আসল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। মহিলাটি নবীজির (সা) কাছেই ছিল এবং মসজিদে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। মহিলাটি নবীজির (সা) ঘরে গিয়ে তাঁর পরিবারের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তা বলত। তাঁর মু'মিন-মু'মিনা ভাইবোনদের মধ্যে থেকে তাঁর অন্তর হেদায়েতের প্রশান্তি ও সম্মান খুঁজে পেল। এমনকি রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর তাঁর জন্য আশ্রয়স্থল এবং প্রশান্তির উৎস ছিল।

আমার মনে হয়, মহিলাটি মসজিদে নববীর খেদমত করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। তিনি মসজিদ ঝাড়ু দিতেন এবং সেখান থেকে ময়লা, খড়কুটা ও ধুলাবালি পরিস্কার করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দেখতে পেলেন না এবং তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবারা বললেনঃ "সে তো মারা গিয়েছে, হে রাসূলুল্লাহ।" নবী (সা) বললেনঃ "তোমরা আমাকে কেন জানালে না ?" তাঁরা বললেনঃ "সে রাতে মারা গিয়েছিল। আমরা আপনাকে সেসময় জাগানো সমীচিন মনে করিনি।" নবীজি (সা) বললেনঃ "আমাকে তার কবর দেখাও।" নবীজি (সা) তাঁর কবরের কাছে এসে তাঁর জানাযা পড়ালেন, এরপর বললেনঃ "এই কবরগুলো তাঁর অধিবাসীদের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি তাদের জন্য যে দোয়া করি সেটার মাধ্যমে আল্লাহ এই কবরগুলোকে এর অধিবাসীদের জন্য আলোকিত করেন।"[70]

*** এ ঘটনা থেকে লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) এই দুর্ভোগ মহিলাটির জন্য ফিতরাতের স্বচ্ছ উৎসে ফিরে আসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যে ফিতরাতের ওপর আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি দুরাবস্থার বেদনা যাপন করেছেন এবং জুলুমের তিক্ত স্বাদও পেয়েছেন। তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সীমালংঘন করা হয়। তিনি এমন কাউকেই পান নি, যে তাকে উদ্ধার করবে ও তার ওপর থেকে জুলুম প্রতিহত করবে। তাঁর কাছে এমন কোন শক্তির উৎস ছিল না, যার দ্বারা তিনি শক্তি অর্জন করবেন অথবা কোন নিকটাত্মীয় ছিল না, যার নিকটে যাবেন। তিনি জানতেন, তাঁর গোত্রের লোকেরা যেসব উপাস্য ও মূর্তির উপাসনা করে তারা তাকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়। একমাত্র আল্লাহই পারে তাঁকে সাহায্য করতে। অতএব তিনি আল্লাহর অভিমুখী হয়ে তাঁর কাছেই নিজের দুর্দশার কথা জানালেন এবং নিজের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরলেন। আল্লাহ তাঁর দোয়ার জবাব দিলেন, যেভাবে তিনি সকল দুর্দশাগ্রস্তের দোয়ার জবাব দেন। মূলত মজলুমদের দোয়া কবুল করা হয়। মহিলাটি দেখল, তাঁর নির্দোষিতার প্রমাণ তার গোত্রের মাথার উপরেই চক্কর দিচ্ছে এবং তারাও সেটার দিকে তাকিয়ে আছে। এজন্যই আল্লাহ ছাড়া বিপদ আর কেউ দূর করে না এটা জানার পর মহিলাটি হিজরত করেছিল যাতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত তাঁকে না করতে হয়।

২) এই মহিলাটি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার দয়ার অনুভূতির পুলকে বসবাস করতেন। যখন তিনি নবীজির (সা) কাছে হিজরত করলেন তখন তিনি পথভ্রষ্টতার পর হেদায়েতের এবং অপমানের পর

সম্মানের নেয়ামত লাভ করলেন। অপবাদ, সীমালংঘন ও দুর্বলতার শিকার হওয়ার পর তিনি মুসলিমদের মধ্যে সম্মানের সাথে সুরক্ষিত অধিকারের সাথে বসবাস করার সুযোগ পান। মু'মিনদের মধ্যে তিনি ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের ছোঁয়া পেয়েছেন। এই সজ্জ্বোল অনুভূতির চূড়ায় তিনি পৌঁছান যখন তিনি সর্বাধিক সম্মানিত মুসলিম ঘরে প্রবেশের সুযোগ পান, যে ঘর থেকে আল্লাহ সমস্ত পঙ্কিলতা দূর করে একে চূড়ান্তভাবে পবিত্র করেছেন। সেই ঘর হচ্ছে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর। সেই মহিলা সেখানে কথাবার্তা বলেন ও তাঁর সাথেও কথাবার্তা বলা হয়। সেখানে তিনি মেলামেশা করেন এবং তাঁর সাথেও মেলামেশা করা হয়। তাই অবাক করা ব্যাপার নয় যে, মহিলাটি তাঁর দুই অবস্থার মধ্যে তুলনা করতে উদ্দীপিত হতেন এবং আল্লাহর দয়ার মহত্ত্বের ওপর কবিতা আবৃত্তি করতেনঃ

"রুমালের দিন হচ্ছে আমার রবের বিস্ময়গুলোর একটি

তিনিই তো আমাকে কাফেরদের শহর থেকে উদ্ধার করেছেন"

আল্লাহ তাঁকে অবমাননা এবং বেহায়াপনার শিকার হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নবীজির (সা) সান্নিধ্য, তাঁর মসজিদে থাকা, তাঁর ঘরের প্রতিবেশী হওয়া এবং তাঁর পরিবারের সাথে মেলামেশা করার সম্মানে সম্মানিত করেন।

৩) আমরা এ ঘটনায় দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর ছিল মুসলিমদের, বিশেষ করে তাদের মধ্যকার গরীব, দুর্বল ও অভাবীদের আশ্রয়স্থল ছিল। আল্লাহর রাসুলের (সা) হুজরা ছিল ছোট কিন্তু দুর্বলদের জন্য তা প্রশস্ত হয়ে উঠত। যে কারণে এই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা আয়েশার (রা) সাথে তাঁর হুজরায় দেখা করতে যেতেন, সাহায্য বা খাবার পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং সামাজিকতা ও কথোকপনের চাহিদা পূরণের জন্য, যা তাঁর একাকীত্ব দূর করত এবং তাঁর সবচেয়ে গহীন বেদনা মুছে ফেলত। আয়েশা (রা) এই মহিলার সাথে নববী আচরণ দেখানে, যে আচরণ সব মানুষকে বরণ করে নিত। সেজন্যই এই মহিলা নবীজির (সা) ঘরে তাঁর স্থান খুঁজে পেয়েছিলেন এবং নবীজির (সা) চারিত্রিক গুণাবলী তাঁর ভাগ বুঝে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৪) এই মহিলা যখন নবীজির (স) কাছে হিজরত করলেন এবং মসজিদে নববীতে থাকা শুরু করলেন, তখন তিনি মুসলিমদের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াননি। তিনি নিজের জন্য একটি দায়িত্ব ও কাজ খুঁজে নিলেন। তাঁর পেশাগত পটভূমি তাঁর এ দায়িত্বের জন্য যথোপযুক্ত ছিল। এ দায়িত্ব ছিল মসজিদে নববীর খেদমত। তিনি

নিজেকে এ মসজিদ পরিস্কারের কাজে নিয়োজিত করেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলিমদের জনজীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন আর তাঁর এই ভূমিকা রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদে আগমনকারী সবাইই অনুভব করতে পারত। তারা যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করত, এর মর্যাদা অনুযায়ী তারা এটিকে পরিস্কার, পবিত্র, পরিচর্যাকৃত অবস্থায় পেত।

৫) নবীজি (সা) মানুষদের অনেক গুরুত্ব দিতেন, তাদের সবাইকেই বরণ করে নিতেন। এর ফলে সমাজের অতিসরল এবং অবাঞ্ছিত মানুষরা নবীজির (সা) কাছে তাদের স্থান ও মর্যাদা খুঁজে পেত। তাদের গুরুত্ব দেয়া হত এবং তাদের প্রতি খেয়াল রাখা হত। আর এজন্যই নবীজি (সা) যখন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাটিকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তিনি তাঁর অনুপস্থিতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন এবং মহিলাটির মৃত্যুর খবর তাঁকে না জানানোর কারণে সাহাবীদের তিরস্কার করলেন। এরপর তিনি তাঁর কবরের সামনে গিয়ে তাঁর জন্য জানাযা পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, তিনি যেন এই কবরগুলোকে তাদের অধিবাসীদের জন্য আলোকিত করে দেন।

নবীজি (সা) একটি মৃত নারীর জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। অথচ সেই নারী এমন কেউ ছিলেন না, যাঁর থেকে কিছু আশা করা যেতে পারে, তিনি ছিলেন বহিরাগত। তাঁর কোন নিকোটাত্মীয়ও ছিল না, তাঁর স্মরণের মাধ্যমে যাদের নৈকট্য অর্জন করা যেত। কিন্তু নবীজির (সা) চারিত্রিক গুণাবলী এমনই ছিল যে, তিনি সেই নারীকে তাঁর জীবদ্দশায় বরণ করে নেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খোঁজখবর নেন। তাঁর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য জানাযা পড়েন এবং দোয়া করেন। রাসূলের মসজিদের এই খাদেমার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করান। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি, যাকে উত্তম আদর্শের পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

৩০ | দুই শায়েখ

এই দুজন ছিলেন কুরাইশদের অগ্রগামী ব্যক্তি। তাঁরা ইসলামেও অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা দুজনই রাসূলুল্লাহর (সা) অতি নিকট সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁর থেকে খুবই কালেভদ্রে আলাদা হতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এমন বর্ণনা প্রচুর পাওয়া যায় যেখানে তিনি বলছেন, "আমি, আবু বকর ও উমার অমুক জায়গায় গেলাম। আমি, আবু বকর ও উমার অমুক জায়গায় প্রবেশ করলাম। আমি, আবু বকর ও উমার বের হলাম।"[71]

এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার পরও এই দুজনের মধ্যে একবার এমন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, যা রাসূলুল্লাহর (সা) ওপরও প্রভাব ফেলল। একবার তাঁদের দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ এবং কথা কাটাকাটি চলছিল। আবু বকর (রা) হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গেলেন এবং তাঁর মুখ থেকে এমন কিছু কথা বের হয়ে গেল যে, উমার (রা) তা শুনে খেপে গেলেন। অতঃপর আবু বকর (রা) তাঁর কথার জন্য দুঃখিত হলেন। কিন্তু উমার (রা) রেগে গিয়ে প্রস্তান করলেন। আবু বকর (রা) অনুতপ্ত হয়ে উমারের (রা) অনুসরণ করলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে মাফ করে দেন। কিন্তু উমারের (রা) উপর প্রচন্ড রাগ চেপে বসে এবং তিনি আবু বকরের (রা) অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। উমার (রা) আবু বকর (রা) থেকে সরে এসে তাঁর ঘরে ফিরে আসেন এবং আবু বকরের (রা) মুখের ওপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। উমারের (রা) ক্রোধ ছিল প্রচন্ড, কিন্তু আবু বকরের (রা) অনুতাপ ছিল এর চেয়েও কঠোর। আবু বকর (রা) উমারের (রা) ক্ষমা অর্জন ও তাঁকে খুশি করতে ব্যর্থ হয়ে শঙ্কিত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গমন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিসে সাহাবারা অবস্থান করছিলেন এমন সময় আবু বকর (রা) তাঁর জামা তুলে দ্রুত সেখানে আগমন করলেন, এমনকি তাঁর হাঁটুদ্বয় দেখা যাচ্ছিল। নবী (সা) তাঁকে দেখে সাহাবীদের বললেনঃ "তোমাদের এই সাথী ঝগড়া করেছে।" আবু বকর (রা) নবীজির (সা) নিকটবর্তী হলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন, বসলেন এবং বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আমার ও উমারের মাঝে ঝগড়া হয়েছিল। আমি তাঁকে যা বলেছি সে ব্যাপারে অনুতপ্ত হলাম। এরপর দ্রুত তাঁর কাছে যেয়ে ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু উমার (রা) ক্ষমা করতে অস্বীকার করল। আমি তাঁকে ঘরে প্রবেশ করা না পর্যন্ত

অনুসরণ করলাম। এরপর আমি আপনার কাছ আসলাম, হে রাসূলুল্লাহ।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক, হে আবু বকর। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক, হে আবু বকর। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক, হে আবু বকর”

অন্যদিকে ক্রোধের আগুন নির্বাপিত হতেই, উমারের (রা) মনে দ্রুত আবু বকরের (রা) জন্য ভালোবাসা আবার জেগে উঠল। আবু বকরের (রা) মর্যাদা ও অগ্রগামীতার ব্যাপারে তাঁর উপলব্ধি হল। আবু বকর (রা) ক্ষমা চাওয়ার পরও যে তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন নি – এ ব্যাপারে উমারের (রা) অনুতাপ বোধ হল। উমার (রা) তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে আবু বকরের (রা) খোঁজ করতে লাগলেন তাঁর সাথে সবকিছু ঠিকঠাক করে পারস্পরিক সন্তুষ্টি অর্জন করে ফেলার অভিপ্রায়ে। তিনি আবু বকরের (রা) গৃহে এসে বললেনঃ “আবু বকর কি আছেন ?” তাঁর পরিবারের লোকেরা বললেনঃ “না। হয়তো তিনি রাসূলুল্লাহর নিকট গিয়েছেন।” উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিসে এলেন হয়তো আবু বকরের সন্ধান পাবেন এই আশায়। যখন তিনি মজলিসে বসলেন, উমারের (রা) প্রতি ক্ষোভে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার রঙ বদলে গেল। ক্ষোভের কারণ ছিল এই যে, আবু বকর (রা) উমারের (রা) কাছে ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও উমার (রা) ক্ষমা করলেন না। মজলিসে উপস্থিত সবাই রাসূলুল্লাহর (সা) এই ক্ষোভের তীব্রতা বুঝতে পারছিল। আবু বকর (রা) যখন এই দৃশ্য দেখলেন তাঁর মনে করুণা জেগে উঠল এবং তিনি ভয় করলেন রাসূলুল্লাহ (সা) উমারকে (রা) এমন কিছু বলে ফেলবেন যা উমার (রা) অপছন্দ করবেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে অগ্রসর হয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে বসলেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! এক্ষেত্রে আমিই অধিকতর জুলুম করেছিলাম। আল্লাহর শপথ! এক্ষেত্রে আমিই অধিকতর জুলুম করেছিলাম।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “হে লোকসকল! আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি বলেছিলামঃ ‘হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।’ কিন্তু তোমরা বলেছিলেঃ ‘আপনি মিথ্যে বলছেন।’ কিন্তু আবু বকর বলেছিলঃ ‘আমি বিশ্বাস করলাম।’ এবং সে তাঁর জীবন ও সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা কি আমার সঙ্গীকে কষ্ট দেয়া ছাড়বে না? তোমরা কি আমার সঙ্গীকে কষ্ট দেয়া ছাড়বে না? তোমরা কি আমার সঙ্গীকে কষ্ট দেয়া ছাড়বে না?”

সাহাবারা নবীজি (সা) কর্তৃক আবু বকরের (রা) বড়ত্ব প্রকাশ, তাঁর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে বলতে দেখার পর থেকে, আবু বকরকে (রা) আর কখনো কোন কষ্ট দেয়া হয় নি।[72]

*** এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) সাহাবাদের সমাজ ছিল আদর্শ নৈতিক সমাজ কারণ তাঁদের উচ্চতর প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করেছেন স্বয়ং সর্বোত্তম চরিত্রের মালিক নবীজি (সা) এবং তাঁর সাহচর্যে থেকে যে মনস্তাত্ত্বিক আরোহণ তাঁরা হাসিল করেছিলেন সে কারণেও। এরপরও তাঁদের মধ্যে মানবিক বিবাদ সংঘটিত হত। যদি কোন সমাজ বিবাদ ও ঝগড়া থেকে মুক্ত থাকত, তবে সেটা সাহাবাদের সমাজই হত। যদি উম্মতের মধ্যে কেউ ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুক্ত থাকত, তবে আবু বকর (রা) ও উমারই (রা) সে দুজন হতেন। এটি আমাদের নিজেদের ও নিজেদের সমাজের দিক বাস্তব দৃষ্টিপাত করতে উৎসাহিত করে, যাতে আমরা নিজেদের ওপর অযথা কঠোর না হই এবং এরকম কিছু আমাদের কারো দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেলে আমরা যেন ভাববাদে ডুবে না যাই নিজেদের। "নিশ্চয়ই মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই।" এখানে মূল শিক্ষা হলঃ কোনকিছুকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে, যদিও আমরা সম্মুখভাগ দেখেই বিচার করার দিকে ঝুঁকে পড়ি। এরপর কোন খারাপ কাজের যে আনুষঙ্গিকতা আছে সেগুলো বন্ধ করতে হবে এবং এর প্রভাবসমূহকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং এর ওপর জেঁকে বসা ও অনড় হয়ে থাকার পরিবর্তে দ্রুত সঠিক পথে ফেরত যেতে হবে।[73]

২) আমরা এখানে দেখি, কিভাবে ক্ষণস্থায়ী আবেগপ্রসূত আচরণের পর আবু বকর (রা) ও উমার (রা) দ্রুত আবার সঠিক পথে ফিরে এসেছেন এবং নিজেদের ভুলগুলো দ্রুত সংশোধনের ব্যাপারে অনড় থেকেছেন। আবু বকরের (রা) পক্ষ থেকে প্রথম এমন কিছু আচরণ প্রকাশ পাওয়ার পর উমার (রা) যখন রাগান্বিত হলেন, তিনি দ্রুত উমারের (রা) ক্ষমা চাওয়ার জনুয় তৎপর হলেন। আর উমারও (রা) রাগ প্রশমিত হওয়ার পর আবু বকরের (রা) খোঁজ করতে করতে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত গেলেন যেখানে তিনি আবু বকরকে (রা) পাবেন ভেবেছিলেন।

আবার এই ঘটনায় আবু বকরের (রা) মনের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতাও লক্ষ্যণীয়। উমারের (রা) সাথে বিবাদের পর তিনি তাঁর পোশাক তুলে ধরে নবীজির (সা) কাছে দ্রুত গমন করলেন। তাঁর মধ্যে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল কারণ তাঁর আচরণের কারণে উমার (রা) তাঁকে ক্ষমা করছিলেন না। এটা ভাবাই স্বাভাবিক যে, তিনি নবীজির (সা) কাছে এসেছিলেন যেন তিনি উমারের (রা) কাছে তাঁর জন্য সুপারিশ করেন এবং তাঁর ও তাঁর

ভাই উমারের (রা) মধ্যে যা হয়েছে তা মিটমাট করে দেন। সেজন্যই আবু বকর (রা) যখন দেখলেন, নবীজি (সা) উমারের (রা) ওপর ক্রোধান্বিত হলেন তাঁর মায়া হল এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে এমন কিছুর ভয় করলেন যা উমার (রা) অপছন্দ করবে। সেজন্য তিনি অনুনয় করে বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! এক্ষেত্রে আমিই অধিকতর জুলুম করেছিলাম।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উমারের (রা) প্রতি আবু বকরের (রা) অন্তর তখন পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিল। এই সম্মানিত মানুষদের মনে কখনো হিংসা বাসা বাঁধতে পারত না, আর না তারা নিজেদের মনে ঘৃণার চাষাবাদ করতেন। "যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে" [সূরা আ'রাফঃ ২০১]।

৩) যদিও আবু বকর (রা) ও উমারের (রা) মধ্যকার বিবাদের ঘটনা ছিল ক্ষণিকের আবেগের ফলাফল এবং ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়ে তা প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু তাঁদের দুজনের মধ্যকার যে গভীর ভ্রাতৃত্ব সেটা দৃঢ় ও স্থায়ী থেকে যায়। এই আবু বকরই (রা) উমারের (রা) ওপর এতটা রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং এরপর তিনি উমারের (রা) পক্ষ থেকে এর প্রতিক্রিয়ারও সম্মুখীন হন। অথচ তাঁর মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হল তখন তাঁর মনে উমারের (রা) চেয়ে উত্তম ও কল্যাণময় আর কেউ ছিল না যার হাতে মুসলিমদের শাসনভার ও খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দেয়া যায়।

অন্যদিকে উমারের (রা) মনে আবু বকরের জন্য এতটাই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল যে, তিনি বলেনঃ "আবু বকর যে উম্মতের মধ্যে রয়েছে সে উম্মতের আমীর হওয়ার চাইতে আমার নিজের গর্দানে আঘাত করে উড়িয়ে দেয়া হবে তা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।"[74]

৪) এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আবু বকরের (রা) বিশাল এক স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর অগ্রগামীতা ও তাঁর জীবন ও সম্পদের যে আত্মত্যাগ সেটা স্মরণ করিয়ে দেয়া। এজন্যই নবীজি (সা) উমারের (রা) ওপর এতটাই ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি উম্মতকে তাঁর সঙ্গীর (আবু বকর) হকের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আহবান জানানঃ "তোমরা কি আমার সঙ্গীকে কষ্ট দেয়া ছাড়বে না?"

এর মাধ্যমে আবু বকরের (রা) প্রতি নবীজি (সা) তাঁর সন্তুষ্টি এবং আবু বকরের (রা) অপরাজেয় অগ্রগামীতা, উম্মতের মধ্যে তাঁর সুমহান অবস্থান এবং উম্মতের ওপর আবু বকরের (রা) অধিকার তুলে ধরেছেন। এখানে

এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, যারা সদগুণের অধিকারী তাদের সাথে তাদের গুণ ও মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা উচিত এবং তাদের গুণাবলী ও সক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়া উচিত।

৩১। আবু তুরাব

রাসূলুল্লাহ (সা) অভ্যাসবশতঃ তাঁর কন্যা ফাতিমার (আ) সাথে দেখা করার জন্য বের হলেন। সময়টা ছিল মধ্যাহ্ন। তিনি যখন ফাতিমার (আ) ঘরে পৌঁছালেন, আলীকে (রা) ঘরে খুঁজে পেলেন না। দিনের এসময়টাতে দম্পতিরা সাধারণতই ঘরেই অবস্থান করে। আরবদের একটি সুপরিচিত স্বভাব ছিল, সহধর্মীনির সাথে ঘরে দুপুরের বিশ্রাম নেয়া। এজন্য নবীজি (সা) তাঁর কন্যা জিজ্ঞাসা করলেনঃ “তোমার স্বামী কোথায়?” নবীজি (সা) যেন অনুভব করতে পারছিলেন যে, আলী (রা) এবং ফাতিমার (আ) মধ্যে কিছু একটা হয়েছে যে কারণে আলী (রা) ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে। তাই তিনি তাঁর কন্যা ফাতিমার (আ) আবেগে নাড়া দেয়ার জন্য তাঁর স্বামীর সাথে তাঁর যে সবচেয়ে ঘনিষ্ট সম্পর্ক সেটার উল্লেখ করে বলেনঃ “তোমার স্বামী কোথায়?”

ফাতিমা (আ) বললেনঃ “আমার এবং তাঁর মাঝে কিছু একটা হয়েছিল। তিনি আমার ওপর রাগ করে বেরিয়ে গিয়েছেন। আমার সাথে দুপুরের বিশ্রাম করেন নি।” নবী (সা) তাঁর সাথে থাকা লোকটিকে বললেনঃ “দেখ তো, আলী কোথায়?”

লোকটি আলীকে (রা) খুঁজতে খুঁজতে মসজিদের দেয়ালের ছায়ায় ঘুমন্ত অবস্থায় পেল। সে নবীজির (সা) কাছে ফিরে এসে বললঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আলী মসজিদে শুয়ে আছেন।” রাসূলুল্লাহ (সা) আলীর (রা) নিকট গেলেন। আলী (রা) শুয়ে থাকার সময় তাঁর পার্শ্বদেশ থেকে কাপড় পড়ে গিয়েছিল এবং সেখানে ধুলা লেগে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সম্মানিত হাত দিয়ে আলীর (রা) পার্শ্বদেশ থেকে ধুলা ঝেঁড়ে ফেললেন এবং রসিকতার সাথে বললেনঃ “ওঠো, হে ধুলার পিতা! ওঠো!”[75]

এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াদি হচ্ছেঃ

১) নবীজি (সা) তাঁর কন্যা ফাতিমাকে (আ) তাঁর স্বামীর ঘরে নিয়মিত দেখতে যান। পিতা হিসেবে তাঁর কন্যাই তাঁকে দেখতে আসবে – এতে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন নি। বরং তিনি নিজ পদক্ষেপে তাঁর কন্যাকে

দেখতে যান যেভাবে তাঁর কন্যা তাঁকে দেখতে আসতেন। এটা ছিল মুস্তাফা (সা) এবং জান্নাতে রমণীদের সর্দারনীর মধ্যে যে পিতা-কন্যার আবেগময় সম্পর্ক ছিল তার প্রতিফলন।

২) ফাতিমা (আ) খুবই বিনয় ও সংক্ষিপ্তভাবে স্বামীর সাথে তাঁর কি হয়েছিল সেটার বর্ণনা করেন এভাবেঃ "আমার ও তাঁর মাঝে কিছু একটা হয়েছে এরপর তিনি বের হয়ে যান।" তিনি বিবাদের খুঁটিনাটি লম্বা করে তুলে ধরেন নি। তিনি ভুল কার সেটাও নির্দিষ্ট করে বলতে যান নি, বরং ব্যাপারটিতে দুজনেরই অংশীদারিত্ব আছে এমন ভাবই এভাবে তুলে ধরেনঃ "আমার ও তাঁর মাঝে..."।

ফাতিমার (আ) এই আদাবে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ তিনি তো নবীজিরই (সা) কন্যা ও নবীর (সা) ঘরেই বড় হয়েছেন, যেখানে আল্লাহর আয়াত ও হেকমতসমূহ তেলাওয়াত করা হত। যখন নারী তাঁর ঘরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বাইরের মানুষের সামনে রাখঢাক করে রাখে না, সে তার গোপনীয়তা হারিয়ে বসে এবং তার সমস্যার পরিসর বাড়িয়ে তোলে। তখন একটি ছোট সমস্যায় একাধিক পক্ষের প্রবেশের ফলে সমস্যার আনুষঙ্গিকতারগুলোর ওপর তার আর নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

৩) ফাতিমার (আ) সংক্ষিপ্ত জবাবের মোকাবেলায় নবীজি (সা) বিস্তারিত জানতে চান নি। তিনি ফাতিমাকে (আ) জিজ্ঞাসা করেন নি, "তোমাদের দুজনের মধ্যে ঘটা জিনিসটি কি ছিল?" তিনি ফাতিমার (আ) ওপর বিস্তারিত জানানোর দায়িত্ব চাপিয়ে দেন নি। বরং এটাকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি নিজ কন্যার স্বামীর সন্ধানে লোক পাঠালেন, যিনি রাগান্বিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এ ধরনের ক্ষণস্থায়ী দাম্পত্য সমস্যার সাথে মোকাবেলা করার এটা ছিল একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ শৈলী। এ ধরনের দাম্পত্য সমস্যা বড়দের প্রবেশ একে আরো বাড়িয়ে তোলে। বরং এ ধরনের সমস্যাকে আরো উস্কে না দিয়ে একে স্বাভাবিকভাবে মোকাবেলা করলে সমস্যা ছোটই থাকে।

৪) তাঁর কন্যার স্বামী তাঁর কন্যার ওপর রাগান্বিত হওয়ার পরেও নবী (সা) তাঁর সাথে পিতৃসুলভ আচরণ করেন এবং তাঁকে এই উপলব্ধি করান যে, নবীজির (সা) পিতৃসুলভ ভালোবাসায় তাঁরা দুজনই শামিল। আলী (রা) যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন নবীজি (সা) তাঁর কাছে আসেন এবং নিজ পবিত্র হাতে তাঁর পার্শ্বদেশ থেকে ধুলো ঝেড়ে দেন। এরপর তাঁকে সস্নেহে ডেকে বলেনঃ "হে মাটির পিতা"। এ ধরনের স্নেহময়ী আচরণ অন্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাব সৃষ্টি করে এবং অন্তরে যেকোন ধরনের তিরস্কারভাবের অনুপস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে।

এটাই ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে তাঁর কন্যার স্বামী ও চাচাতো ভাই আলীর (রা) প্রতি পিতৃসুলভ ভালোবাসা। এখানে নবীজির (সা) চারিত্রিক উদারতা লক্ষ্যণীয়। তিনি আলীকে (রা) খুশি করার জন্য তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর শরীর থেকে ধুলোবালি ঝেঁড়ে দিয়ে সাহায্য করলেন, এরপর তাঁর ধুলোময় অবস্থা দেখে রসিকতার সাথে তাঁকে একটি উপাধি দিলেন। নবীজির (সা) নিকট ফাতিমার (আ) উচ্চমর্যাদা সত্ত্বেও তিনি আলীকে (রা) ফাতিমার (আ) ওপর রাগ করার জন্য তিরস্কার করেন নি।

৫) দাম্পত্য বিবাদকে আলী (রা) যেভাবে মোকাবেলা করেছেন এর মধ্যে এর মধ্যে প্রজ্ঞা রয়েছে, সে বিবাদে রাগান্বিত হওয়ার কারণও বিদ্যমান। আলীর (রা) ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে বিশ্রাম নেয়ার ফলে ঝগড়ায় যেমনটা কথা কাটাকাটি ও এক ধরনের অনড় অবস্থান থাকে তাতে ছেদ পড়ে। এর ফলে অনুভূতি ও রাগ প্রশমিত হওয়া এবং স্বামী-স্ত্রীর অন্তর পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়ার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই এ ধরনের অবস্থায় সামান্য পারস্পরিক দূরত্ব মূলত সুন্দর একটি বিচ্ছেদ, যার ফলে দুটি অন্তর তাদের আগের স্বচ্ছ অবস্থায় দিরে আসে এবং পারস্পরিক রাগ ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রশমিত হয়ে যায়।

৬) এ ঘটনা আলীর (রা) অন্তরে সুমিষ্ট প্রভাব রেখে যায় এবং তাঁর বাঁধভাঙ্গা খুশি জারী থাকে। তাঁর কাছে 'আবু তুরাব (মাটির পিতা)' সবচেয়ে পছন্দনীয় নামে পরিণত হয়, কারণ নবী (সা) তাঁকে সে নামে ডেকেছেন।

৩২। আমি তাকে ভালোবাসি

দিনের এ সময়টাতে কেউ বের হয় না, কিন্তু নবী (সা) তপ্ত দুপুরে গনগনে সূর্যের আলোর মধ্যেই বের হলেন। নবীজি (সা) ও তাঁর সাথে আবু হুরায়রা (রা) হাঁটছেন। আবু হুরায়রা (রা) জানেন না, নবীজি (সা) এসময় কোথায় যাবেন। তিনি সম্ভ্রমের কারণে তাঁকে জিজ্ঞাসাও করছেন না। নবীজি (সা) বনু কাইনুকার বাজারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এভাবে তিনি তাঁর কন্যা ফাতিমার (রা) ঘরে গিয়ে পৌঁছালেন।

তিনি বাড়ির প্রাঙ্গনে দাঁড়ালেন, ভেতরে প্রবেশ করলেন না। এরপর ডাকলেনঃ "লুকা' কোথায়? লুকা' কোথায়? লুকা' কোথায়?" এটা ছিল ছোট কাউকে সস্নেহে ডাকার শৈলী যার অর্থঃ "ছোটজন কোথায়? ছোটজন কোথায়?" নবীজি (সা) মূলত এর মাধ্যমে তাঁর নাতি হাসানকে (রা) ডাকছিলেন। ফাতিমা (আ) এবং হাসান (রা) দুজনেই রাসূলুল্লাহকে (সা) শুনতে পেলেন। হাসান (রা) আসতে চাইলেন। কিন্তু ফাতিমা (আ) তাঁকে ধরে রেখেছিলেন তাঁর নানার সামনে যাওয়ার আগে তাঁকে প্রস্তুত করে দেয়ার জন্য, যিনি দিনের এই সময় তাঁকে দেখতে এসেছেন। ফাতিমা (আ) হাসানকে (রা) সাফসুতরো করলেন, এরপর তাঁকে একটি লবঙ্গের মালা পরালেন, যা ছোট বাচ্চারা পরিধান করত। এরপর তাঁকে ছাড়লেন। হাসান (রা) তাঁর নানার কাছে ছুটে এল। নবীজি (সা) যখন তাঁকে দেখলেন তিনি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর দু হাত প্রসারিত করলেন। হাসানও (রা) দৌঁড়ে আসতে আসতে একইভাবে নিজের হাত প্রসারিত করলেন এবং নিজেকে সহৃদয় স্নেহশীল নানার বুকে ছুঁড়ে দিলেন। এরপর তাঁরা গলাগলি করলেন। নবীজি (সা) তাঁর নাতিকে শুকলেন এবং চুমু খেলেন। এরপর বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। তাকে যে ভালোবাসে তাকেও তুমি ভালোবাসো।"

আবু হুরায়রা (রা) সবই দেখলেন ও শুনলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এই আবেগ দেখে তাঁর আবেগও জেগে উঠল এবং তিনি বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ এ কথা বলার পর, হাসান বিন আলী অপেক্ষা আমার কাছে অধিকতর প্রিয় আর কেউ ছিলেন না।"[76]

*** এ ঘটনায় লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) নবীজি (সা) দিনের এমন সময় বের হয়েছিলেন যেসময় কেউ বের হয় না। মদীনা মুনাওয়ারার মত গরম শহরগুলোতে মধ্যাহ্নের সময় মানুষজন তাদের গৃহে অবস্থান করত। এ থেকে স্পষ্ট হয়, নবীজি (সা) এমনটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য করেছেন আর তা ছিল তাঁর নাতি হাসানকে (রা) দেখতে যাওয়া, তাঁকে জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া এবং তাঁর জন্য দোয়া করা।

পরিবারের অধিকার আদায়ের ব্যাপারটি নবীজি (সা) পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করেছেন। সর্বোত্তম আদর্শ নবী কারীম (সা) প্রত্যেককেই তার অধিকার দিয়েছেন। এই অধিকার পাওয়ার অগ্রাধিকার ছিল তাঁর সন্তান ও নাতি-নাতনীদের। এজন্যই তিনি তাঁর সন্তান ও নাতি-নাতনিদের দেখতে যাওয়ার জন্য অবসর সময় বেছে নিতেন না, বরং তিনি তাদেরকে তাদের যথার্থ সময়ই দিতেন, যদিও সেটার জন্য দিনের মধ্যাহ্নে তপ্ত গরম তাঁকে সহ্য করতে হত।

২) এ ঘটনায় নবীজি (সা) তাঁর নাতি হাসানের (রা) জন্য বাঁধভাঙ্গা ভাবোচ্ছাসের সাথে নিজ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছেন, যা ছিল তাঁর অসাধারণ অনুভূতির চমৎকার একটি দৃশ্য। প্রথমে তিনি তাঁর দু হাত হাসানের (রা) জন্য মেলে ধরেন, এরপর তাঁকে জড়িয়ে ধরেন, এরপর তাঁকে চুমু খান ও তাঁর ঘ্রাণ নেন। এরপর এ বলে তাঁর ভালোবাসার ঘোষণা দেন যেঃ “হে আল্লাহ, আমি তাকে ভালোবাসি।” এরপর হাসানের (রা) প্রতি ভালোবাসা যেন আরশের ওপরে এবং সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য দোয়া করেনঃ “আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যে তাকে ভালোবাসে তাকেও ভালোবাসুন।”

সন্তানসন্ততিদের আবেগে সিঞ্চিত করা মূলত তাদের একটি অতিপ্রয়োজনীয় মানসিক দাবী পূরণ করা। তাদের আবেগ-অনুভূতির এই চাহিদা যখন সঠিকভাবে পূরণ করা হয়, তারা জীবনমঞ্চে ন্যায়পরায়ণ অন্তর নিয়ে আবির্ভূত হয়, প্রীতিপূর্ণ জীবনযাপন করে এবং সমাজের সাথেও উন্নত ও সুউচ্চ মানসিকতার সাথে আচার-আচরণ করে।

বাবাদের এই ধরনের অনুভূতি প্রকাশে অপারগতা এবং সন্তানদের এই মানসিক চাহিদা পূরণে কমতির কারণে সন্তানদের মনে নির্জীবতা সৃষ্টি করে, যেটা মনস্তাত্ত্বিক পীড়া বিকাশলাভের উর্বরক্ষেত্র।

৩) নবীজি (সা) ফাতিমার (রা) ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন কিন্তু ভেতরে দাঁড়ালেন না। এরপর তিনি তাঁর প্রয়োজন তথা নাতিকে ডাকলেন। ফাতিমার (রা) মনে এর একটি সুন্দর ছাঁপ পড়ে, যিনি এ ঘটনার মাধ্যমে নিজ পিতার নিকট তাঁর সন্তানের মর্যাদা প্রত্যক্ষ করলেন।

সন্তানকে সম্মান করা মূলত তার পিতামাতাকেই সম্মান করা এবং সেই পিতামাতার অন্তরকে আনন্দে উদ্বেলিত করার সংক্ষিপ্ত পথ এটা। ভাবা যায়, নিকট থেকে নিজ পিতা ও পুত্রের মধ্যে এই সাক্ষাৎ এবং পুত্রের প্রতি পিতার এই বাঁধভাঙ্গা স্নেহ দেখে ফাতিমা আয-যাহরার (আ) মন কতটা খুশি হয়েছিল!

নিজ নাতি-নাতনীদের প্রতি নবীজির (সা) ভালোবাসা এবং সম্মান মূলত নিজ সন্তানদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও সম্মানেরই অংশবিশেষ।

৪) বালক হাসানের (রা) দু হাত প্রসারিত করে নিজ নানা মুহাম্মাদের (সা) কাছে ছুটে আসা মূলত এই আবেগময় বন্ধনের পিছে যে লম্বা পটভূমি আছে সেদিকেই ইঙ্গিত করে। হাসান (রা) নবীজির (সা) বিভিন্ন প্রকার আবেগ, স্নেহ এবং ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করেছেন। নবীজি (সা) প্রায়শই তাঁর ঘ্রাণ নিতেন, তাঁকে চুমু খেতেন এবং বলতেনঃ "আমি তাকে ভালোবাসি।" একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হাসান ও হুসাইনকে একসাথে দেখে খুতবা বন্ধ করে সামনে এগিয়ে তাঁদের দুজনকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেনঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা [সূরা তাগাবুনঃ ১৫]। আমি তাদের দেখে সবর করতে পারি নি।" এরপর তিনি তাঁর খুতবা পূর্ণ করেন।[77]

একবার নবীজি (সা) মসজিদে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন, সেখানে তিনি লম্বা সেজদা দিলেন। এরপর যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, লোকেরা তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করল। তিনি বললেনঃ "সেজদা করার সময় আমার নাতি হাসান আমার পিঠে চড়েছিল। সে নিজে থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে সরিয়ে দেয়া আমি অপছন্দ করেছি।"[78]

এই আবেগময় প্রশ্রয় নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, কোন ক্ষণস্থায়ী কিছু নয়। আর এজন্যই তা হাসান (রা) এবং তাঁর নানা নবীজির (সা) মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পারস্পরিক আকুলতা সৃষ্টি করেছিল।

৫) নবীজি (সা) তাঁর মেয়ের ছেলেদের উদ্বেলিতভাবে এবং প্রকাশ্যে ভালোবাসতেন, তাদের পিতৃসুলভ স্নেহের সাথে ডাকতেন এবং তাঁদের তাঁর নিজের বলে দাবী করতেন। তিনি হাসান (রা) ও হুসাইনের (রা) ব্যাপারে বলেনঃ "এরা দুজন আমার সন্তান এবং আমার মেয়ের সন্তান।" হাসান (রা) সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "আমার এ সন্তানটি নেতৃস্থানীয়।" তৎকালীন আরবরা কন্যাদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত এবং কন্যার সন্তান-সন্ততিদের সাথে রূঢ় আচরণ দেখাতো। তারা বলতঃ[7980]

"আমাদের সন্তান হচ্ছে আমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা

মেয়েদের সন্তানরা তো দূরবর্তী কোন লোকের সন্তান"

৬) নাতিদের জন্য নবীজির (সা) ভালোবাসা এবং যারা তাঁদের ভালোবাসবে তাঁদের জন্য তাঁর দোয়ার প্রভাব সাহাবীদের জীবনে লক্ষ্য করা যায়। সাহাবীরাও গভীর আবেগের সাথে নবীজির (সা) এই ভালোবাসা দেখে সাড়া দিয়েছেন। নবীজি (সা) যা ভালোবাসতেন, তাঁরাও তা ভালোবেসেছেন। আবু হুরায়রা (রা) হাসানের (রা) ব্যাপারে নবীজির (সা) কথা শুনে বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) হাসানের (রা) ব্যাপারে এ কথা বলার পর থেকে আমার নিকট হাসানের (রা) চেয়ে অধিকতর প্রিয় আর কেউ ছিল না।" যখন আবু হুরায়রা (রা) হাসানকে (রা) দেখতেন, তাঁর দু চোখে পানি চলে আসত।

আবু বকর (রা) খিলাফতপ্রাপ্তির পর একবার মসজিদ থেকে বের হয়ে হাসানকে (রা) বালকদের সাথে খেলতে দেখলেন। তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁকে নিজ কাঁধে উঠিয়ে নিলেন এবং আবৃত্তি করলেনঃ "তুমি আমার পিতার চেয়েও প্রিয়! তুমি তো নবীর (সা) অনুরূপ, আলীর (রা) অনুরূপ নও" আলী (রা) আবু বকরের (রা) পাশ দিয়েই হাঁটছিলেন। তিনি আবু বকরের (রা) এই কান্ড দেখে খুশিতে হেসে উঠলেন। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নবীর (সা) দুই সন্তান হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসি। আমরা তাদের দুইজনকে ভালোবাসার মাধ্যমে তোমার ও তোমার নবীর ভালোবাসা কামনা করি। তুমি আমাদের এই দুজনের পথের ওপর চালাও এবং তাঁদের সাথেই আমাদের জড়ো করো।

৩৩। উমামা

সাহাবীরা একবার যোহরের কিংবা আসরের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বিলাল (রা) নবীজিকে (সা) ডাকতে গিয়েছিলেন সালাতের জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বের হলেন তখন তিনি তাঁর মেয়ে যয়নাবের (রা) মেয়ে উমামাকে কাঁধে বহন করছিলেন। সালাতের জন্য দাঁড়ানো হল। কাতার সোজা করা হল। রাসূলুল্লাহও (সা) তাঁর সালাতের স্থানে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ তাকবীরে তাহরীমা বললেন। ছোট বালিকা উমামা তখনো তাঁর আগের অবস্থানে অর্থাৎ নবীজির (সা) সম্মানিত কাঁধে চড়ে আছে। নবীজি (সা) যখন রুকু করতে চাইলেন, তিনি কোমলভাবে তাঁকে ধরে মাটিতে রাখলেন। তিনি রুকু ও সেজদা করলেন। সেজদা শেষ করার পর তিনি আবার উমামাকে (রা) ধরে তাঁর কাঁধে চড়িয়ে নিলেন। এভাবেই তিনি সালাত শেষ করলেন। যখন সেজদা করতেন তিনি উমামাকে মাটিতে রাখতেন এবং যখন দাঁড়াতেন তখন তাঁকে তুলে নিতেন।

১) এই দৃশ্য থেকে সুস্পষ্ট ভয়ে ওঠে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) কতটা সাদাসিধে ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতেন। তিনি সালাতের জন্য বের হলেন, মসজিদে লোকেরা জড়ো হল। তাঁর কাঁধে তখন তাঁর মেয়ে যয়নাবের (রা) শিশুকন্যা উমামা। এ দৃশ্য কৃত্রিম ভাবগাম্ভীর্য ও শিষ্টাচারবিধি থেকে অনেক দূরে, বরং তা মানজীবনে অকপটতা ও মানবিক অনুভূতির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেয়ার দৃষ্টান্ত। এরপরও নবীজির (সা) সরলতা তাঁর মর্যাদা কিছুটাও কমাতো না। তাঁকে তো মর্যাদা, গাম্ভীর্য ও গরিমার চাদরে আবৃত করা হয়েছিল। তাঁর মহিমার মধ্যেই সরলতা এবং তাঁর সরলতার মধ্যেই মহিমা নিহিত ছিল, যা তাঁর মনুষ্যত্বে ফুটে উঠতঃ "বলুনঃ আমার রব মহান ! আমি একজন মানুষ ও রাসূল ছাড়া আর কিছুই নই" [সূরা ইসরাঃ ৯৩]।

২) একটি মেয়েশিশু নবীজির (সা) কাঁধে চড়ে তার ছোট্ট দু হাত দিয়ে শক্ত করে তাঁর মাথা ধরে আছে – এটি মূলত নবীজির (সা) ঘরে যা হচ্ছিল তারই সম্প্রসারিত অংশ। সম্ভবত, নবীজি (সা) তাঁর ঘরে এই মেয়েশিশুটির সাথে শিশুশৈলীতে কথা বলছিলেন এবং খেলছিলেন। যখন নবীজি (সা) সালাতের জন্য বের হতে চাচ্ছিলেন, শিশুটি তাঁর সাথে চূড়ান্তভাবে লেগে ছিল; তাঁকে সালাতের জন্য আসতেই দিচ্ছিল না। তিনি

আসতে চাইলেই হয়তো কানছিল। এজন্যই নবীজি (সা) শিশুটিকে তাঁর কাঁধে করে নিয়ে এলেন, যা ছিল উদার পিতৃ-অনুভূতি এবং উদ্বেল সহৃদয়তাপূর্ণ মানবিক একটি দৃশ্য।

৩) নবীজি (সা) তাঁর কাঁধে তাঁর শিশু নাতনিকে নিয়ে বের হলেন। তার ওপর এই শিশু ছিল তাঁর মেয়ের মেয়ে। তাঁকে নিয়ে নবীজি (সা) মুসল্লীদের কাতারের সামনে আসলেন। তিনি তাঁর নাতনিকে কাঁধে নিয়েই সালাত আদায় করলেন। এটা ছিল কন্যাসন্তানদের সমাদর করার একটি ব্যবহারিক শিক্ষা, যেটার মাধ্যমে তিনি লোকদের মন থেকে জাহেলিয়াতের অবশিষ্টাংশকেও শেষ করে দিতে চাইছিলেন। আরবরা জাহেলিয়াতের যুগে পুত্রদের প্রতি চূড়ান্ত রকমের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করত এবং কন্যাসন্তানদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত। "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তারা মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে" [সূরা নাহলঃ ৫৮-৫৯]। কাউকে কন্যা সন্তান জন্মদানের সংবাদ দেয়ার কারণে নিজ গোষ্ঠী থেকে মুখ লুকিয়ে রাখা এবং জনসমাবেশের সামনে নিজ কন্যার কন্যাকে কাঁধে নিয়ে বের হওয়া – এই দুয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য!

৪) এই কন্যাশিশুর প্রতি নবীজির (সা) যে মায়া ও সহৃদয়তা তাতে তার মা ও নবীজির (সা) কন্যা যায়নাবও (রা) শামিল, যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁর কন্যার অবস্থানের কারণে দ্বিগুণ খুশি হয়ে থাকবেন। ধরা যাক, তাঁকে কেউ তাঁকে প্রশ্ন করছেঃ আপনার কন্যা কোথায় এবং তিনি জবাব দিচ্ছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সালাতে বহন করে নিয়ে গিয়েছে – এমতাবস্থায় যায়নাবের হৃদয়ের অবস্থা কল্পনা করা যায়!!

একইভাবে নিজ কন্যাদের সাথে সদ্ব্যবহারের মধ্যে মূলত তাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি সদ্ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত। এভাবেই এর পরিসর ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়।

৫) যে নবী (সা) তাঁর কন্যার কন্যাকে সালাতে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন, সেজদা করার সময় তাঁকে মাটিতে রেখেছেন এবং দাঁড়ানোর সময় তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন, সেই তিনিই বলেছেনঃ "সালাতে আমার প্রশান্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে" সৃষ্টির মধ্যে তিনি সালাতে সবচেয়ে খুশু অবলম্বন করেছেন এবং সালাতের সবচেয়ে বেশি কদর তিনিই করেছেন। এরপরও তাঁর নিজ নাতনিকে ফরয সালাতে বহন করে নিয়ে আসা সালাতের যথার্থতায় কোন কমতি সৃষ্টি করে নি। বরং তা থেকে শরীয়াহতে যে সহজতা আছে সেটা ফুটে ওঠে। এজন্যই

ইমাম যাহাবী (রহ) এ ধরনের ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ "যে ফক্বীহ এ ব্যাপারে অতিসতর্ক তাঁর এখানে কি করার আছে ?"[8182]

তাই এটা বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে, এ ঘটনায় নবীজি (সা) দুটো ইবাদত একসাথে পালন করেছেন। নিজ রবের প্রতি সালাত আদায় কুরেছেন এবং নিজ কন্যার কন্যার ও নিজ কন্যার প্রতি ইহসান করেছেন। এ দুটোকেই তিনি এক্ষেত্রে একত্রিত করেছেন।

৩৪ | বাজারের মাদ্রাসা

নবীজি (সা) একবার মদীনার কিছু ঢাল থেকে নেমে আসছিলেন। মদীনা তো এ ধরনের ঢালু অঞ্চল দ্বারা ঘেরাও ছিল। এরপর তিনি বাজারে প্রবেশ করলেন, মানুষজন তাঁর দু পাশে। তিনি একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোন এক শারীরিক সমস্যার কারণে ছাগলটির দ কান অনেক ছোট ছোট ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ছাগলটির কান ধরে উঁচু করে বললেনঃ “তোমাদের মধ্যে কে আছ যে এটি এক দিরহাম দিয়ে কিনবে ?”

বাজারের মানুষজনের কাছে এ ছিল এক অদ্ভুত প্রশ্ন। কে এই বিকৃতদেহী ছাগল কিনবে ? ছাগলটির এখন কোন ব্যবসায়িক মূল্যই নেই। এটি হয়তো তার পরিবারের কাছেও পরিত্যাজ্য ছিল। এজন্য তারা এটিকে বাজারে ছেড়ে গেছে। এটির দিকে কারো কোন খেয়ালও নেই। কিন্তু নবীজির (সা) প্রশ্ন সবাইকে এটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারা জবাব দিলঃ “এটির কোন অংশই আমাদের হোক তা আমরা চাই না। এটিকে দিয়ে আমরা করবোটা কি ?”

রাসূলুল্লাহ (সা) আবার প্রশ্নটি করলেনঃ “তোমরা কি পছন্দ করবে এটি তোমাদের হোক ?” তারা জবাবে না বলল। এরপর তিনি প্রশ্নটি তৃতীয়বারের মত করলেনঃ “তোমরা কি পছন্দ করবে এটি তোমাদের হোক ?” এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে লোকদের বিস্ময়ানুভূতি আরো বৃদ্ধি পেল। তারা বললঃ “কখনোই নয় ! আল্লাহর শপথ ! এটি যদি জীবিতও হত তাহলেও কান ছোট হওয়ার কারণে ছিল শারীরিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। তাহলে মৃত অবস্থায় কেন আমরা এটিকে চাইবো ?” পরপর এই প্রশ্নগুলোর পিছে কি প্রজ্ঞা লুকিয়ে থাকতে সেটা জানতে মুখিয়ে থাকা লোকদের উদ্দেশ্যে নবী কারীম (সা) এবার সেই হাকীকতটি তুলে ধরলেন এবং তাদের মনস্তত্ত্বের গভীরে তা গেঁথে দিলেন। তিনি বললেনঃ “আল্লাহর শপথ ! তোমাদের কাছে এই মৃত ছাগলটি যেরকম, আল্লাহর কাছে এই পৃথিবী এর চেয়েও নিকৃষ্ট।”[83]

***এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াদি হচ্ছেঃ

১) রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার কিছু উঁচুভূমি থেকে ফিরছিলেন। এগুলো ছিল মদীনার সীমায় এবং পরস্পর থেকে বেশ দূরে। এই রকম ঘটনা আরো অনেক হাদীসে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তিনি আসরের পর বনু হারিছার এলাকায় যেতেন তাদের সাথে কথা বলার জন্য। আবার বনু সালিমা গোত্রের উট জবাই দেখতেও তাদের ওখানে যেতেন। তিনি সালাতে দেরী করেছেন কারণ তিনি বনু আমরু বিন আওফের এলাকায় গিয়েছিলেন তাদের সদস্যদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিটমাট করে দেয়ার জন্য। এরপর আরেকটি গোত্রের নিকট গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এক রোগীকে দেখতে।[8485]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, নবীজি (সা) তাঁর সাহাবাদের সাথে যোগাযোগরত ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে তাঁদের এলাকায় যেতেন। নবী (সা) মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন বা দূরে থাকতেন না। মানুষের মনে এর গভীর প্রভাব পড়ত। অনুসরণীয় ব্যক্তি থাকতেন মানুষের নিকটেই এবং মানুষ সরাসরি তাঁর কাছে যেতে পারত। পরবর্তীতেও দাওয়াতের দায়িত্ববহনকারীগণ একই পথ অনুসরণ করেন। এজন্য মানুষের মধ্যে তাঁদের গভীর সামাজিক প্রভাব এবং মানুষের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ ও প্রভাববিস্তারকারী মেলামেশা ছিল। সাম্প্রতিক সময়ের এমন কয়েকজন অনুসরণীয় ব্যক্তি হচ্ছেনঃ উস্তায হাসান আল বান্না, শায়খ আবদুল হামীদ বিন বাদিস এবং ইমাম আবদুল আযীয বিন বায।

২) শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবীজির (সা) চমৎকার শৈলী। আমরা এই ঘটনায় রাসূলের (সা) এমন শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখি যা খুবই প্রভাববিস্তারকারী। নবী (সা) এখানে দৃষ্টান্ত ব্যবহার করার পন্থা অনুসরণ করেছেন। একটি মৃত ছোট কান বিশিষ্ট ছাগল পড়ে ছিল, সেটাকে ব্যবহার করে নবীজি (সা) প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ ও তাদের চিন্তায় উদ্দীপ্ত করার জন্য। তিনি উদাহারণ পেশ করলেন বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার জন্য। পারস্পরিক কথোকপনের শৈলীতে তিনি তাঁর শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রদান করতে চাইলেন, যাতে সবাই এর ফলাফল হিসেবে যে জ্ঞান বেরিয়ে আসবে তাতে শরীক হতে পারে। এসবই হয়েছে অল্প কিছু সময়ের মধ্যে, কিন্তু এর প্রভাব ছিল অনেক গভীর। এ দৃশ্যটি সবার স্মৃতিতে হাজির থেকে যায়। আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের ওপর।

৩) নবীজির (সা) এই বিষয়টিকে বাজারে শিক্ষাদানের জন্য বাছাই করে নিলেন আর সে বিষয়টি হচ্ছেঃ আল্লাহর নিকট পৃথিবীর তুচ্ছতা। এই চমৎকার শৈলীর একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য আছে। বাজার এমন একটি জায়গা

যেখানে মানুষ দুনিয়ার চিন্তায় ডুবে যায় এবং আখেরাত থেকে তার দৃষ্টি সরে যায়। এমন পরিস্থিতিতে হয়তোবা সে ধোঁকাবাজি, মিথ্যা, বিক্রয়ের জন্য মিথ্যা শপথ, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদের মত অনেক হারাম আচরনে লিপ্ত হতে পারে। এধরনের আচরণ থেকে সবচেয়ে ভালো রক্ষাকবচ হতে পারে আখেরাতকে চিন্তার সামনে পেশ করা এবং পৃথিবীকে এর বাস্তবতাসহ তুলে ধরা, অস্থায়ী দুনিয়ার সাথে চিরস্থায়ী আখেরাতের তুলনা করা, মানুষকে ভবিষ্যত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করার শিক্ষা দেয়া।

৪) নবীজির (সা) পুরো জীবনেই শিক্ষা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জীবনক্ষেত্রই তো প্রশিক্ষণের সর্বোচ্চ পর্যায়। নবীজির (সা) আনীত দ্বীন তো জীবনেরই দ্বীনঃ “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন তোমাদের আহবান করেন তোমরা তাতে সাড়া দাও, যাতে তোমরা জীবন লাভ করতে পার” [সূরা আনফালঃ ২৪]। নবীজির (সা) শিক্ষা কখনোই মসজিদে মিম্বারের ভাষণ কিংবা মসজিদের হালাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বাজারের প্রাঙ্গন, সড়ক, খাবারের দস্তরখানা, এমনকি শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাবে মৃত্যুশয্যার এমন অবস্থাতেও তাঁর শিক্ষাদান চলত। জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও এর বিভিন্ন কার্যাবলী তাঁর অবিরত শিক্ষাদানের পরিসরের আওতাভুক্ত ছিল।

৫) এ ঘটনায় পৃথিবীকে মূলত আখেরাতের তুলনায় তুচ্ছ করে দেখানো হয়েছে। আখেরাতের তুলনায় এই পৃথিবী একটি মুহূর্ত বা পলক ছাড়া আর কিইবা? এজন্যই যখন কেয়ামতের দিন দুনিয়াবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ “তোমরা কত বছর পৃথিবীতে ছিলে?” তারা জবাব দেবেঃ “একদিন।” এরপর তারা অনুভব করবে, তারা এর চেয়েও কম সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছে। তখন তারা বলবেঃ “একটি দিনের কিছু সময় ছিলাম।” এরপর আল্লাহ আবার প্রশ্ন করবেন। আখেরাতের নেয়ামত ও দুর্ভোগের সাথে দুনিয়ার নেয়ামত ও দুর্ভোগের কোন তুলনাই হয় না। দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি নেয়ামতপ্রাপ্ত কাউকে যখন জাহান্নামে ডুবানো হবে সে বলবেঃ “আমি কখনোই নেয়ামতের কিছুই দেখি নি।” যখন দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ভোগ আক্রান্ত ব্যক্তিকে জান্নাতে ডুবানো হবে সে বলবেঃ “আমি দুর্ভোগের কিছুই দেখি নি।”[86]

তাহলে দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত ক্ষণস্থায়ী জীবনকে কিভাবে আখেরাতের চিরস্থায়ীতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে?

এ ধরনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পার্থিব বিষয়াদিকে অধিকতর সুশৃঙ্খলভাবে এবং জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিশীল করে পরিচালনা করতে এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের সমস্ত ব্যাপারগুলোকে এর প্রকৃত প্রেক্ষাপট ও প্রকৃত পরিসরে স্থাপন করতে সহায়তা করে।

এর মানে জীবন থেকে দূরে থাকা নয়, বরং এটিকে সংশোধন করা এবং এর নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা। আর সেজন্যই বাজারে থাকা মানুষদের সামনে পার্থিবজীবনের তুচ্ছতা স্পষ্ট করে তুলে ধরার পরেও বাজারে তাদের অবস্থান, ব্যবসায় লিপ্ত হওয়া এবং সেখানে রিযিক অন্বেষণ করাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। এসবই জীবনের স্বাভাবিক কার্যক্রম এবং জরুরত। কিন্তু এসব আরো স্বচ্ছ ও যথার্থ হয়ে উঠবে যদি মানুষ আখেরাতের দিকে তার যাত্রা ও সেখানকার চিরস্থায়ী জীবনের কথা মাথায় রেখেই দুনিয়াবী কার্যক্রম চর্চা করে যায়।

৩৫। তুমি কি আশ্চর্য হও না?

বারীরা (রা) আনসারদের কিছু লোকের দাসী ছিলেন। তিনি তাদের সাথে চুক্তি করলেন যে, তিনি প্রতি বছর ৯ আউন্স রৌপ্য প্রদানের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করবেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার (রা) কাছে এসে এই মূল্য প্রদানে তাঁর সাহায্য চাইলেন। বারীরার (রা) আর ৫ আউন্স রৌপ্য প্রদান বাকি ছিল। আয়েশা (রা) এক দফায় এই মূল্য পরিশোধ করে বারীরাকে (রা) মুক্ত করে দিলেন।

তিনি যখন মুক্ত হলেন এবং নিজের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরিভাবে নিজের হাতে নিলেন তখন তাঁর দৃষ্টি পড়ল নিজ দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর। তিনি মাত্র মুক্ত হলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী মুগীছ (রা) তখনো দাস। বারীরা (রা) তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত আযাদী ব্যবহার করে এই দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারে অথবা তা ছিন্ন করে দিতে পারে। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে, মুগীছের (রা) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক আর রাখবেন না কারণ তাঁর প্রতি বারীরার (রা) ভালোবাসার অনুভূতি অত শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু মুগীছের (রা) তাঁর প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রচন্ড। তাঁকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন মুগীছ (রা)। যখন তিনি বারীরার (রা) সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারলেন, তিনি তাঁকে খুশি করার জন্য মদীনার বাজারে বাজারে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন। মুগীছের অশ্রু দাঁড়ি বেয়ে বেয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু বারীরা (রা) তাঁর আকুতি মানতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেনঃ "তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই।" নবীজি (সা) এই দুজনকে সেই অবস্থায় দেখলেন। তখন তাঁর সাথে তাঁর চাচা আব্বাস (রা) ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেনঃ "হে আব্বাস! আপনি কি বারীরার প্রতি মুগীছের ভালোবাসা এবং মুগীছের প্রতি বারীরার ঘৃণা দেখে আশ্চর্য হন না!"

এরপর মুগীছ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে সুপারিশ চাইতে এলেন, যাতে রাসূল (সা) তাঁর ব্যাপারে বারীরার (রা) সাথে কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বারীরার সাথে মুগীছের ব্যাপারে কথা বললেনঃ "তুমি যদি তার ব্যাপারটি আরেকবার বিবেচনা করতে! সে তোমার সন্তানের পিতা।" বারীরা (রা) বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? এটা কি আমার জন্য ওয়াজিব কিছু?" নবীজি (সা) বললেনঃ "না! আমি মুগীছের জন্য সুপারিশ করছি।" বারীরা (রা) বললেনঃ "মুগীছের কোন প্রয়োজন আমার আর নেই। তিনি

যদি আমাকে এই এই জিনিসও দিতেন এরপরেও আমি তার কাছে থাকতাম না।” নবীজির (সা) শাফায়াত এবং বারীরার (রা) প্রতি মুগীছের প্রচন্ড ভালোবাসা ও আকাঙ্খা সত্ত্বেও বারীরা (রা) যা চেয়েছিলেন অর্থাৎ মুগীছের (রা) তাঁর তালাক সম্পন্ন হয়।[87]

*** এ ঘটনা থেকে লক্ষ্যণীয় বিষয়াদি হচ্ছেঃ

১) নবীজি (সা) আবেগের চাহিদা ও হৃদয়ের অনুভূতি বুঝতেন। এজন্য তিনি মুগীছের বারীরার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা এবং বারীরার মুগীছের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণার তিরস্কার ও সমালোচনা করেন নি, বরং তিনি এর প্রতিপাদন করে এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সেইসাথে বিপরীতমুখী এই দুই আবেগের প্রতি তাঁর বিস্ময়বোধ তাঁর চাচা আব্বাসকেও (রা) জানিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, প্রেম্য ছাড়া ছাড়া প্রেমিকের সন্ধান মেলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা প্রচন্ড ভালোবাসার বিপরীতে প্রচন্ড ঘৃণা দেখতে পাই।

হৃদয়ের বিভিন্ন অবস্থা ও আবেগের প্রভাবের বুঝ এবং মানসিক অনুভূতির ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীই হচ্ছে শরীয়াহ এবং ফিতরাতের সামঞ্জস্যের একটি অংশ। নবীজি (সা) আনীত হেদায়েত এসেছেই মানুষের আনন্দকে বিস্তৃত করা, দুঃখ নির্বাপন এবং তার আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে প্রশস্ত হওয়ার জন্য। এই আবেগ-অনুভূতিকে প্রকাশ করা যেতে পারে, এটিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত কিংবা পরিশোধিত করা যেতে পারে, কিন্তু এটিকে দমন বা এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় না। ভালোবাসার এই অনুভূতির স্বীকৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুস্তাফা (সা) কর্তৃক এক স্ত্রীর কাছে তার প্রেমিক স্বামীর জন্য সুপারিশ, যে স্বামীকে সে ছেড়ে দিতে চাইছিল।

২) “আপনি কি বারীরার প্রতি মুগীছের ভালোবাসা এবং মুগীছের প্রতি বারীরার ঘৃণা দেখে আশ্চর্য হন না!” এই উক্তি ও ঘটনা থেকে বুঝা যায়, নবীজির (সা) সমাজ ছিল ভালোবাসার সমাজ। কেউ সেখানে ভালোবাসা দেখলে অবাক হত না, কিন্তু ভালোবাসার বিপরীতে ঘৃণা দেখলে অবাক হত বৈ কি!

৩) বদরুদ্দীন আইনী তাঁর ‘উমদাতুল ক্বারী’-তে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ “কোন মুসলিম পুরুষের জন্য এটা দোষণীয় নয় যে, সে কোন মুসলিম মহিলাকে ভালোবাসবে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে। এতে কোন গুনাহ নেই যদিও সে এতে বাড়াবাড়ি করে ফেলে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে কোন হারাম বা গুনাহের কাজে লিপ্ত হচ্ছে”

৪) নবীজির (সা) তাঁর অধীনস্থ লোকদের যেসব বিষয়ের খেয়াল রাখতেন তার পরিসর অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল এবং সেসব ব্যাপারে তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগও করতেন। তিনি এক দাস এবং সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত দাসীর দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্যও সুপারিশ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এ ধরনের দেখাশোনা থেকে সব সাহাবীদের কাছে এমনকি একজন দাস সাহাবীদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, নবীজির (সা) মর্যাদা থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার তাঁদের আছে। আর সেজন্যই মুগীছ (রা) তাঁর কাছে সুপারিশ চান এবং নবীজিও (সা) এ ব্যাপারে দ্রুত সাড়া দেন। সাহাবাদের এসব ভাবাবেগমূলক প্রয়োজনসমূহকেই নবীজি (সা) যখন ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্বসহকারে দেখতেন, তখন তাঁর নিকট কোনটি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটি সাধারণ সেটা বুঝা মুশকিল ছিল।

৫) নবীজির (সা) সাথে কথোকপনের সময় বারীরার (রা) স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার সক্ষমতা এবং নিজের সিদ্ধান্ত ও পরিণতি নিজে বেছে নেয়ার পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকারও এখানে লক্ষ্যণীয়। শেষমেশ বারীরা (রা) স্পষ্টভাবে নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

তিনি রাসূলের (সা) সুপারিশের জবাবে তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ এটা কি কোন শর'ঈ হুকুম যা পালন করা ওয়াজিব নাকি দুজনের মধ্যে মিটমাট করে দেয়ার জন্য সুপারিশ? যখন তিনি জানতে পারলেন, এটা রাসূলের (সা) সুপারিশ মাত্র, তিনি তাঁর স্বামীর সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে অস্বীকৃতি জানালেন কারণ তিনি তাঁকে ভালোবাসতেন না, যদিও এর বিপরীতটার জন্য সুপারিশ করেছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)।

একটি নারী যে মাত্র তাঁর দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে তাঁর নিজের অধিকার বুঝে নেয়া ও নিজের মতামত প্রকাশ করার সক্ষমতা দেখলে অবাক হতে হয়। তবে এ বিস্ময় চলে যায় যখন এ তথ্য সামনে আসে যে, বারীরা (রা) নবুওয়াতী পরিবেশে ও মুহাম্মাদী মাদ্রাসাতেই লালিত-পালিত হয়েছে, যেখানে তাঁর যথাযথ, পুর্ণাঙ্গ ও আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। তিনি কমও করেন নি, বেশিও করেন নি। তিনি নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন এবং নিজের অধিকার চিনে নিয়েছেন।

৬) বারীরা (রা) তাঁর সুপারিশ ফিরিয়ে দেয়ার কারণে নবীজি (সা) তাঁর অন্তরে বারীরার (রা) ব্যাপারে কিছু মনে করেন নি, আর না তাঁর অন্তরে বারীরার (রা) জন্য ভালোবাসা কমেছে। বারীরাও (রা) অনুভব করেন নি যে, নবীজির (সা) সুপারিশ ফিরিয়ে দেয়ার কারণে রাসূলের (সা) অন্তরে তাঁর মর্যাদা অথবা তাঁর অন্তরে

রাসূলের (সা) মর্যাদা প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হবে। এটাই তো যৌক্তিক যে, কেউ যখন সুপারিশ করে সে ধরেই নেয়, সে সুপারিশ কবুল হওয়া বা প্রত্যাখ্যাত হওয়া দুটোই সমান।

৩৬। সেই তরুণ

সে ছিল অল্পবয়স্ক এক তরুণ। অল্প বয়স তাঁকে থামাতে পারে নি, আর না পেরেছে রাসূলুল্লাহর (সা) ভাবগাম্ভীর্য। রাসূলুল্লাহকে (সা) তো প্রকৃতিগতভাবেই ভাবগাম্ভীর্যতা দেয়া হয়েছিল। তরুণটি রাসূলুল্লাহর (সা) উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সে নবীজির (সা) কাছে এমন কিছুর অনুমতি চাইবে, যা তার তারুণ্যের তেজ ও কামনার কাঠিন্যকে হালকা করবে। সে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এল, তাঁর চারপাশে তাঁর সাহাবাগণ। এসে রাসূলুল্লাহর (সা) মুখোমুখি দাঁড়াল এবং তাঁকে বললঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন।" এ প্রশ্ন শুনে সবার মাথায় যেন বজ্রপাত হল। রাসূলুল্লাহর (সা) চারপাশে থাকা সাহাবাদের সবাইই তার দিকে তাকালেন। সবাই তার প্রতি চিৎকার করে বলতে লাগলেনঃ "কি! যাঁর ওপর যিনাকে হারাম করে ওহী নাযিল হয়েছে, তাঁর কাছ থেকে কিভাবে যিনার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে? যিনি মানবজাতিকে পবিত্র করতে এসেছেন তাঁর কাছ থেকে কিভাবে অশ্লীলতার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে?!"

নবীজি (সা) সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ "তাকে ছেড়ে দাও। তাকে বলতে দাও।" অর্থাৎ, তাকে ছেড়ে দাও, সে বিস্তারিত বলুক। তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করো না। এরপর তিনি আগমনকারীর দিকে ফিরে বললেনঃ "কাছে এসো।" তরুণটি কাছে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে বসল। তিনি এরপর পিতৃসুলভ ভঙ্গীতে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দা'ঈর অন্তঃদৃষ্টি ও অসাধারণ কথোকপনকারীর শৈলীতে বললেনঃ "তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, তোমার মায়ের সাথে কেউ এমনটা করুক?" তরুণটি বললঃ "আল্লাহর শপথ! কখনোই না, হে রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আল্লাহ আমাকে উৎসর্গীত করুক।" নবীজি (সা) বললেনঃ "কেউ যদি তার মায়ের জন্য তা পছন্দ না করে, তবে কি সে তার মেয়ের জন্য এমনটা পছন্দ করবে?" তরুণটি জবাব দিলঃ "আল্লাহর শপথ! কখনোই না, হে রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আল্লাহ আমাকে উৎসর্গীত করুক।" রাসূল (সা) বললেনঃ "কেউ যদি তার মেয়ের জন্য তা পছন্দ না করে, তবে কি সে তার বোনের জন্য এমনটা পছন্দ করবে?" তরুণটি জবাব দিলঃ "আল্লাহর শপথ! কখনোই না, হে রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আল্লাহ আমাকে উৎসর্গীত করুক।" রাসূল (সা) এরপর বললেনঃ "কেউ যদি তার বোনের জন্য তা পছন্দ না করে, তবে কি সে

তার ফুফুর জন্য এমনটা পছন্দ করবে?” তরুণটি বললঃ “আল্লাহর শপথ! কখনোই না, হে রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আল্লাহ আমাকে উৎসর্গীত করুক।” রাসূল (সা) এরপর বললেনঃ “কেউ যদি তার ফুফুর জন্য তা পছন্দ না করে, তবে কি সে তার খালার জন্য এমনটা পছন্দ করবে?” তরুণটি বললঃ “আল্লাহর শপথ! কখনোই না, হে রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আল্লাহ আমাকে উৎসর্গীত করুক।” রাসূল (সা) এরপর বললেনঃ “কেউ যদি তার খালার জন্য তা পছন্দ না করে, তবে আল্লাহ যা অপছন্দ করেছেন তা অপছন্দ করো। মানুষের জন্য সেটা পছন্দ করো যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করো এবং মানুষের জন্য সেটা অপছন্দ করো যা তুমি নিজের জন্য অপছন্দ করো।” তরুণটি বুঝতে পারল, সে তার নিজের জন্য যা চাচ্ছিল তা তার হৃদয়কে কলুষিত করে দিয়েছে। সেজন্য সে বললঃ “হে রাসূলুল্লাহ! দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমার অন্তরকে পবিত্র করে দেন।” নবীজি (সা) তাঁর হাত তরুণটি বুকে রেখে বললেনঃ “হে আল্লাহ, তার গুনাহ মাফ করে দাও, তার অন্তরকে পবিত্র করে দাও, তার লজ্জাস্থানকে হেফাজতে রাখ।” তরুণটি চলে গেল। মানুষজন তার অবস্থা দেখতে লাগল। তারা বললঃ “এরপর থেকে তরুণটি এসব জিনিসের দিকে ঘুরেও তাকায় নি।”[88]

১) এই অল্পবয়স্ক তরুণের নিজের চাহিদা পূরণের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কোনরকমের দুশ্চিন্তা ও দ্বিধা ছাড়া আগমনটি লক্ষ্যণীয়, যদিও সে যেজন্য এসেছিল সেটি ছিল খুবই বিশেষ ও সংবেদনশীল একটি ব্যাপার। এমনটা কখনোই হতে পারত না, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের সম্পর্ক গড়ে না উঠত। এটা এমন এক সম্পর্ক ছিল যা বিভিন্ন প্রজন্ম, সামাজিক স্তর, লিঙ্গ এবং অঞ্চলের মধ্যকার দূরত্ব ঘুঁচে দিয়েছিল এবং সাহাবাদের সবাই নবীজির (সা) প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। কখনো কখনো ছোট বালিকা তাঁর দু কাঁধের মাঝে অবস্থিত নবুওয়াতের মোহর নিয়ে খেলত। আবার কখনো কখনো কোন মহিলা তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে থাকত এবং তাঁর হাত ধরে তাঁকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। কখনো কখনো কোন বেদুইন এসে তাঁর সামনে এসে বলতঃ “আমি আপনার কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা চাই এবং এ ব্যাপারে আপনার উপর জোরাজুরি করব।” নবীজির (সা) মর্যাদা, তাঁর ভাবগাম্ভীর্য, বয়সের পার্থক্য - এসবের কিছুই এ ঘটনায় বর্ণিত তরুণটিকে নবীজির (সা) সামনে সুস্পষ্টভাবে এবং চূড়ান্ত প্রশান্তি ও স্থিরতার সাথে নিজের অন্তরের সমস্যা তুলে ধরা থেকে থামাতে পারে নি।[89][90][91]

সমাজকে ধরে রাখা এবং এর বিভিন্ন গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা ছিল নবীজির (সা) সুমহান চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। যেই নবুওয়াতী উত্তরাধিকার এবং দাওয়াতী কাজের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিতে চায়, তাঁর

জন্য এই পথ অনুসরণ ছাড়া আর কোন গতি নেই।

২) নবীজি (সা) তরুণটির সাথে যেভাবে কথোকপন চালিয়ে গেলেন এবং এর মাধ্যমে তার চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করলেন, তাকে জবাব দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন ও সবশেষে তার বিচারবুদ্ধিকে শরয়ী দায়িত্ব ও আনুগত্যের অধীন করলেন তা লক্ষ্যণীয়। নবীজির (সা) জন্য এটা বলা সম্ভব ছিল যেঃ "তোমার জন্য কোন ছাড় আমি দিতে পারছি না।" আমরা কল্পনা করতে পারি, সে তরুণটিকে যখন এমনটা বলা হত, তাহলেও সে সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিত। কিন্তু হারাম উপভোগের ব্যাপারে নবীজি (সা) তরুণটির সামনে এক নতুন দিক উন্মোচন করলেন। তিনি কেবল তার বুদ্ধিবৃত্তিকে সেদিকে অভিমুখী করলেন না। অথচ তরুণটি যা চাইছিল তার জঘন্যতা এবং প্রচন্ড ক্ষতি তার মাথায় গেঁথে দেয়ার জন্য সেটাই যথেষ্ট ছিল। ফলে তরুণটি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সন্তুষ্ট হল এবং ফলস্বরূপ রাসূলের (সা) কথার আনুগত্য ও অনুসরণ করল। এ থেকে বুঝা যায়, দা'ঈদের উপরও দাওয়াতের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব রয়েছে। কেউ যদি এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতেন, তবে রাসূলুল্লাহই (সা) সেই ব্যক্তি হতেন। এরপরও তাঁর সুন্নত ও দেখানো পথ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলা এবং সুষ্ঠু চিন্তাভাবনার মাধ্যমে মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ও সঠিক উপায়ে সন্তুষ্ট করা। এর মাধ্যমে তিনি মানবজাতিকে তাদের চিন্তার স্থবিরতা থেকে মুক্তি দিয়ে সঠিক পথের দিকে ধাবিত করেছেন। আল্লাহ উস্তায আক্কাদের ওপর রহম করুন যেদিন তিনি বলেছিলেনঃ "চিন্তাভাবনা হচ্ছে ইসলামী দায়িত্ব।"

৩) নবী (সা) যেভাবে চমৎকার আবেগী উপায়ে প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণ হাজির করেছেন এবং এই তরুণের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন যে, তার প্রতি নবীজির (সা) পিতৃসুলভ মনোভাব বিদ্যমান এবং তিনি তাঁকে যে নসীহত দিয়েছেন তা কোমলতা ও ভালোবাসা উদ্ভূত – তা লক্ষ্যণীয়। এ বিষয়টি সুপষ্ট হয়ে উঠে যখন নবীজি (আ) সাহাবাদের মানা করেন তরুণটিকে ভর্ৎসনা না করতে এবং বলেনঃ "তাকে ছেড়ে দাও। তাকে কথা বলতে দাও।" এরপর নবীজি (সা) তরুণটিকে কাছে টানার জন্য বলেনঃ "কাছে এসো।" তরুণটি তাঁর সামনে বসে অর্থাৎ সে নবীজির (সা) হাতের নাগালেই ছিল। এ ধরনের দৈহিক নৈকট্য আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। এরপর তরুণটি নবীজির (সা) কাছে যে দোয়া চাইলো, তিনি দ্রুত তাতে সাড়া দিয়ে এর চেয়েও বেশি দোয়া করে দিলেন তার জন্য। এছাড়াও নবী (সা) তরুণটির বুকে তাঁর সম্মানিত হাত রাখেন।

নবীজি (সা) তাঁর বরকতময় হাত সেই তরুণটির বুকে রাখেন যেন সে তার অন্তরে নবীজির (সা) হাতের শীতলতা খুঁজে পায়। তরুণটি তার বাকি জীবন হয়তোবা নবীজির (সা) এই স্পর্শের আনন্দে উদ্বেল হয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সে যেন এর প্রভাব নিজের মনস্তত্ত্বেও খুঁজে পেয়েছে, যেন নবীজি (সা) তাঁর হাত দ্বারা তরুণটির শেষঘন্টা সরিয়ে দিয়েছেন।

নবীজির (সা) সেই আবেগময় স্পর্শ ছিল সেই নববী চাবি যা দ্বারা হৃদয়ের তালা খুলে গিয়েছে। সেই তরুণটির জন্য সৌভাগ্য। রাসূলুল্লাহর (সা) নৈকট্য, বুকে তাঁর স্পর্শ, তাঁর দোয়া – এসবই যেন তরুণটির জন্য প্রশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলের (সা) কাছে তরুণটির চাওয়া বরকতময় হোক, যার ফলে সে এতকিছু লাভ করেছে। আর আমরা? আমরা কি এ ঘটনা শিক্ষা নেবো যে, দাওয়াহ মূলত ভালোবাসা, শিক্ষাদানও ভালোবাসা, জীবন ভালোবাসা; আমরা কখনোই মানুষের কাছে আমাদের দাওয়াত পৌঁছে দিতে পারব না, যতক্ষণ না আমরা তাদের অন্তরে ভালোবাসার মাধ্যমে পৌঁছাবো।

৪) তরুণটির সাথে কথা বলার সময় সে যে পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে এবং তরুণটির মানসিক গড়নের ওপর সে পরিবেশের প্রভাবের প্রতি রাসূলের (সা) খেয়াল করাটাও এখানে লক্ষ্যণীয়। নবীজি (সা) এক আরব যুবকের সাথে কথা বলছিলেন, যে আরববরা তাদের প্রখর মর্যাদাবোধের জন্য পরিচিত ছিল। তারা অমর্যাদার ভয়ে তো নিজেদের শিশুকন্যাদেরই জীবন্ত দাফন করে দিত। নিজের সম্মানের ওপর আঘাত আসাটাই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় অমর্যাদার কারণ ছিল। এজন্যই যখন নবীজি (সা) তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে তরুণটিকে তার এক নিকটাত্মীয় নারীর সাথে অন্য কেউ যিনা করছে এমনটা চিন্তা করালেন, তার মর্যাদাবোধের আগুন জ্বলে উঠল। অনেকটা যেন, এই তরুণ রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে বসে তাঁর প্রশ্ন শুনছে আর তার কপাল দরদর করে ঘামছে এবং চেহারার চামড়ার নিচে যেন সে অগ্নিতাপ অনুভব করছে। সে তার কল্পনায় সেটাই কল্পনা করছে যা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশ্নে ফুটে উঠেছে। এজন্যই রাসূলের (সা) প্রশ্নের জবাবে সে দ্রুত উত্তর দিচ্ছিলঃ “আল্লাহর শপথ! কখনোই না, হে রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আল্লাহ আমাকে উৎসর্গীত করুক।”

এখন এই প্রশ্ন যদি যৌন উচ্ছৃঙ্খলায় ভরপুর একটি সমাজের সদস্যকে করা হয় সে নিজের দু কাঁধ ঝাকিয়ে শান্তভাবে উত্তর দেবেঃ ‘এটা তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত ব্যাপার।’

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর শিক্ষাদান ও দাওয়াতের সময় শিক্ষার্থীর পরিবেশ ও পটভূমির দিকে খেয়াল করতেন এবং এর মাধ্যমে তার বুদ্ধি ও অন্তরে পৌঁছানোর সবচেয়ে নিকটতর রাস্তা অবলম্বন করতেন। এজন্যই যখন একবার এক বেদুইন তাঁর কাছে এসে কালো হওয়ার জন্য সন্তানের পিতৃত্ব নিতে অস্বীকার করলেন, তখন নবীজি (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমার কাছে কি উট আছে?" বেদুইন বললঃ "হ্যাঁ, হে রাসূলুল্লাহ!" নবীজি (সা) বললেনঃ "এর রঙ কি?" বেদুইন জবাব দিলঃ "লাল।" নবীজি (সা) বললেনঃ "এর মধ্যে কি কালো রংয়ের এর উট আছে?" বেদুইন বললঃ "এর মধ্যে কালো আছে।" নবীজি (সা) বললেনঃ "এই কালোটা কোথা থেকে এল।" বেদুইন জবাব দিলঃ 'এটি সম্ভবত কোন বংশগত কারণে হয়েছে।' নবীজি (সা) বললেনঃ "তোমার সন্তানের ব্যাপারটাও এরকম।" এভাবে তিনি বেদুইনটির চিন্তা থেকে বিভ্রান্তি দূর করলেন এবং বেদুইনটিকে তার পূর্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে দিলেন।[92]

এ ধরনের প্রশ্ন মানসিক সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হতে পারত, কারণ বেদুইনটি উট লালনপালন করত এবং সে উটটির পূর্বপুরুষদের বংশলতিকাও জানত।

এখানে আমরা দাওয়াত ও সন্তুষ্ট করার ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতি খেয়াল রাখা ও একে উত্তমভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে নবীজির (সা) দক্ষতা দেখতে পাই।

৩৭। নিরাপত্তার দলিল

“আজকের দিন বিশ্বস্ততা ও সৎকর্মশীলতার দিন” – তিনি এই কথা শুনেন একটি বর্শা তাকে আঘাত করার পর। সেসময় তিনি সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারদের একটি দলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং একটি চিঠি নিজ হাতে তুলে ধরে জোরে জোরে বলছিলেনঃ ‘এটা আপনারই দেয়া চিঠি।’

এই চিঠিটি লেখা এবং তার এই চিঠিটি তুলে ধরার মধ্যে যে ৮ বছরের ব্যবধান তা কিভাবে পার হল? তিনি সেই দিনের কথা স্মরণ করতেন এবং যা তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন তা নিজ চোখের সামনে বাস্তবায়িত হতে দেখেন।

তিনি সেইদিনের কথা স্মরণ করেণ যেদিন কুরাইশদের কিছু দূত তাদের গোত্র বনু মুদলিজের ছাউনিতে এসে বললঃ কুরাইশরা মুহাম্মাদকে (সা) ধরে আনা বা হত্যার জন্য ১০০উট এবং তাঁর সাথী আবু বকরকে (রা) ধরে আনা বা হত্যার জন্য ১০০ উটের পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এ দুজন তখন মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন। সেদিন তার অন্তর যেকোন বেদুইনের মতই এ সব পুরস্কার হাতিয়ে নিতে চাচ্ছিল। উট সংগ্রহ ও ক্রয়ের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা এবং উটের আধিক্য নিয়ে গর্ব করা যেকোন বেদুইনেরই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ছিল।

তিনি সেসময় তাঁর গোত্রের সমাবেশস্থলে বসে ছিলেন। সেসময় সেই গোত্রেরই একজন লোক এসে তাদের সামনে দাঁড়াল এবং বললঃ “আল্লাহর শপথ! আমি তিনজন ব্যক্তিকে কালো পোশাকে উপকূলগামী পথ ধরে যেতে দেখেছি। আমার মনে হয়, এরা মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথীরাই হবে।” তিনি এ কথা শুনে সাথে সাথে বুঝলেন যে, এই তিনজন মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সাথীরাই হয়ে থাকবেন এবং বেদুইন অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করলেন যে, তারা পরিচিত পথ এড়িয়ে উপকূলগামী পথ ধরে যাচ্ছেন তাদের ধাওয়াকারীদের এড়ানোর জন্য। তিনি দেখলেন, কুরাইশদের ঘোষিত পুরস্কার লাভ করার সুযোগ হাতের মুঠোয়। তিনি একাই এই পুরস্কার হাতিয়ে নিতে চাইলেন, এজন্য কাউকে এ অভিযানে শরীক করলেন না। তিনি চোখ দিয়ে ঐ লোককে ইশারা করলেন চুপ করতে এবং বললেনঃ “এরা মুহাম্মাদ ও তার সাথী হতেই পারে না। এরা মূলত

অমুক আর অমুক। তারা আমাদের চোখের সামনেই নিজের হারানো উট খুঁজতে বের হয়েছিল।” লোকটি উত্তরে বললঃ “হয়তোবা।”

তিনি সেই মজলিসে অল্প কিছুক্ষণ থাকলেন যাতে তাঁর দ্রুত প্রস্থান কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। এরপর তিনি নিজের বাড়িতে প্রবেশ করে দাসীকে আদেশ দিলেন তাঁর ঘোড়া প্রস্তুত করতে। দাসীটি ঘোড়া প্রস্তুত করে তাঁর জন্য পাহাড়ের পিছে অপেক্ষা করতে থাকল। তিনি তাঁর বাড়ির পিছন দিক হতে বের হলেন। তিনি তাঁর অস্ত্র সাথে নিলেন, তূণীর ভরা ভাগ্যনির্ধারণী তীর ছিল, বর্শা নিলেন কিন্তু সেটাকে নত করে রাখলেন যার ফলে তাঁর চলার সময় বর্শার এক দিক দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল। তিনি এমনটা করলেন যাতে তাঁকে কেউ দেখতে না পায়। এভাবে তিনি তাঁর ঘোড়ার কাছে এলেন। এরপর তিনি তাঁর তূণীর থেকে ভাগ্যনির্ধারণী তীর বের করলেন। জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের স্বভাব ছিল, তারা যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইত তখন এই ভাগ্যনির্ধারণী তীর ব্যবহার করত। কিন্তু সেই তীর বের হল যা তাঁকে তাঁদের অনুসরণ না করতে ইঙ্গিত দিল। কিন্তু তাঁর পুরস্কারের প্রতি লোভের কাছে তাঁর জাহেলী বিশ্বাস হার মানল। তিনি ভাগ্যনির্ধারণী তীরের সিদ্ধান্ত মানলেন না। তিনি ঘোড়ায় চড়ে তা দিয়ে দ্রুতবেগে যেতে থাকলেন। সেসময় মাটি ছিল শক্ত চামড়ার মত যেটার উপর দিয়ে ঘোড়াটি ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ছুটে যাচ্ছিল। তিনি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে ঘোড়া দিয়ে খুব দ্রুত তাদের পানে ছুটে চলছিলেন। অবশেষে তাঁর চোখের সামনে তাঁদের উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি তাঁদের এত নিকটে চলে এলেন যে, নবীজির (সা) তেলাওয়াত শুনতে পেলেন। নবীজি (সা) পেছন দিরে তাকাচ্ছিলেন না। কিন্তু আবু বকর (রা) বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। তিনি বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! এই ধাওয়াকারী আমাদের অনুসরণ করছে।” রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেনঃ “দুশ্চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।” এরপর দোয়া করলেনঃ “হে আল্লাহ, তোমার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাকে আমাদের থেকে বিরত রাখো। আল্লাহ তাকে পরাস্ত করো।” ঘোড়া যখন শক্ত মাটিতে ছুটে চলে, তখন মাটিতে স্রেফ এর খুরের স্পর্শই লাগে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকরকে (রা) ধাওয়াকারীর ঘোড়ার সামনের দুই পা মাটিতে এর পেট পর্যন্ত ডেবে যেতে থাকল, যেন এটি জলাভূমিতে ডেবে যাচ্ছে। ঘোড়ায় আরোহণকারীও উল্টে পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে বোকা বনে গেলেন। তাঁর ঘোড়ার দু পা মাটিতে ডুবে আছে। অথচ তিনি নিজে অনুভব করছেন এই মাটি হচ্ছে শক্ত মাটি। তিনি বুঝতে পারলেন, এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়ার ফল।

তাই তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) ডেকে বললেনঃ “হে মুহাম্মাদ! আমি জানি এটা আপনার কাজ। আপনি আমার বিরুদ্ধে দোয়া করেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। আল্লাহর শপথ! আমি আপনাদের দুজনের কোন ক্ষতি করব না। আমার পক্ষ থেকে এমন কিছু হবে না যা আপনারা অপছন্দ করবেন।” রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য দোয়া করলেন আর তাঁর ঘোড়াও হ্রেষাধ্বনি করে উঠে দাঁড়াল।

যখন ঘোড়াটি মাটি থেকে এর সামনের দুপা ছুটালো, এর নিচ থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকল যা ঘূর্ণিবাতের মত আকাশের দিকে উঠতে থাকল। এসব নিদর্শন দেখার পর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, রাসূলুল্লাহই (সা) সুস্পষ্ট এবং নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করবেন। কিন্তু নবুওয়াতী চরিত্রের ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে তিনি ভাবলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) যখন বিজয় হবে তখন তিনি বলবেনঃ “বনু মুদলিজের সেই বেদুইনকে আমার কাছে নিয়ে এসো যে আমাদের মক্কা থেকে বের হওয়ার পথে অনুসরণ করেছিল। আজ আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবো।” এজন্য তিনি নবীজির (সা) কাছ থেকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে চাইলেন। তিনি নবীজি (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের ডেকে বললেনঃ “আমি সুরাক্বা বিন জু’শাম। আমার দিকে তাকান। আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই।”

রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকরকে (রা) বললেনঃ “তাকে জিজ্ঞাসা করোঃ তুমি আমাদের কাছে কি চাও?” আবু বকর (রা) তা বলার পর সুরাক্বা বললেনঃ “আপনি আমার জন্য একটি নিরাপত্তা দলিল লিখে দিন যা আমার ও আপনার মাঝে একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে।” এরপর তিনি দাঁড়ালেন ও তাঁর ঘোড়ায় চড়ে দুজনের কাছে আসলেন। এরপর রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেনঃ “আপনার গোত্র আপনাকে হত্যা বা ধরে আনার জন্য আপনার রক্তপণের সমপরিমাণ মূল্য নির্ধারণ করেছে। আমি তাদেরকে তাই বলব যা তারা শুনতে চায়।” এরপর তিনি তাঁদেরকে যাত্রার জন্য খোরাক দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর থেকে কিছুই নিলেন না। সুরাক্বা বললেনঃ “আপনারা সামনে আমার উট ও ভেড়ার পাশ দিয়ে যাবেন। সেখান থেকে আপনাদের যা খুশি নিতে পারেন।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “আমাদের সেটার কোন প্রয়োজন নেই।” তাহলে আমাকে আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “আমাদের যাত্রার কথা লুকিয়ে রাখো। আমাদের অনুসরণ করে এমন কাউকে ছেড়ো না।” এরপর তিনি আমির বিন ফুহাইরাকে আদেশ দিলেন সুরাক্বার জন্য একটি নিরাপত্তা দলীল লিখে দিতে। এরপর সেটা তিনি সুরাক্বাকে ছুঁড়ে মারলেন। সুরাক্বা সেটা নিলেন এবং তাঁর তূণীরে সেটা

রাখলেন, এরপর ফিরে গেলেন। সুরাক্বা গিয়ে কাউকে খুঁজে পেলেন না। এরপর ফিরে এসে বললেনঃ "আপনাদের সাথে এখানে যা হয়েছে সেটাই যথেষ্ট। আপনারা আমার আসার পথ ও নিদর্শন দেখেই আমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছেন। আমি আপনাদের যাত্রার চিহ্ন মুছে দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি কাউকে দেখিনি।" এরপর নবীজি (সা) ও তাঁর সঙ্গীগন সেই পথ পরিবর্তন করে অন্য পথ অবলম্বন করলেন।

এরপর বছরখানেক পার হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহর (সা) খবর মক্কা ও মদীনার মধ্যে চালাচালি হতে থাকল। হঠাৎ একদিন খবর এলঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয় করে ফেলেছেন এবং হাওয়াযিন গোত্রকে পরাজিত করেছেন এবং তায়েফ অবরোধ করেছেন। সুরাক্বা দেখলেন, মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। সুরাক্বা সেই নিরাপত্তা দলিল নিয়ে বের হলেন এবং মক্কার নিকটবর্তী জু'আররানা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) নাগাল পেলেন। তিনি নবীজির (সা) কাছে পৌঁছালেন, সেসময় তাঁকে ঘিরে ছিল আনসারদের সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারদের একটি দল। সুরাক্বা সেই সশস্ত্র দলের মাঝে ঢুকে পড়লেন। তারা সুরাক্বাকে দেখে তাঁদের বর্শা দিয়ে আঘাত করে বললেনঃ "থামো! কি চাও তুমি?" কিন্তু সুরাক্বা নবীজির (সা) নিকটবর্তী হতে সক্ষম হলেন, তিনি তখন তাঁর উটের পিঠে অধিষ্ঠিত ছিলেন যার তাঁর পায়ের নলি থেকে ইযার সরে গিয়েছিল। এটি যেন খেঁজুরের ভেতরের অংশের মত সাদা ছিল। সুরাক্বা তাঁর দলিলটি উপরে তুলে ধরে উচ্চস্বরে করে বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ, এটা আমাকে দেয়া আপনার দলিল। আমি সুরাক্বা বিন জু'শাম।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "হ্যাঁ। আজ ওয়াদা পালন ও সততার দিন। তাকে কাছে আনো।" সুরাক্বা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটে এলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করলেন। সুরাক্বা (রা) যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটে অবস্থান করছিলেন তাঁর হরেক রকমের অনুভূতি হচ্ছিল। এগুলো ছিল নৈকট্যের দরুণ আনন্দাভূতি, এ দৃশ্য দেখে বিস্ময়ানুভূতি এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সম্ভ্রমানুভূতির সংমিশ্রণ। তিনি কিছু একটা মনে হওয়াতে সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করেন। এছাড়া তিনি আর কিছু বলেন নি কারণ তাঁর মনে এতসব অনুভূতির আগমন। তিনি প্রশ্ন করেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! একটি হারানো উট যদি আমার জলাধারে চলে আসে, যা আমার উটের জন্য নির্ধারিত এবং আমি যদি সেটিকে পানি খাওয়াই তাতে কি আমার সওয়াব হবে?" নবীজি (স) জবাব দিলেনঃ "হ্যাঁ। প্রত্যেক জীবিত বস্তুর জন্য রয়েছে সওয়াব।" রাসূলুল্লাহ (সা) সুরাক্বাকে গ্রহণ করলেন, তাঁকে নিকটবর্তী করলেন এবং তাঁর জন্য খুশি হলেন। তিনি তাঁকে অতীতের কোন কিছুই মনে করিয়ে দেন নি, যেন তাঁদের মধ্যে আগে কিছুই হয় নি।[93]

সুরাক্বা খুব সম্ভবত সেসময় অনুভব করেছেন, তাঁর আর সেই নিরাপত্তা দলিলটির প্রয়োজন নেই। নবীজির (সা) সুমহান চরিত্রের চাদরেই তিনি নিরাপত্তা লাভ করে ফেলেছেন।

এরপর সুরাক্বা তাঁর গোত্রের কাছে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর উটসমূহের মধ্যে কয়েকটিকে সাদাক্বা হিসেবে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পাঠিয়ে দিলেন।[94]

এ ঘটনার কয়েকটি বিস্ময়কর দিক হলঃ

১) সুরাক্বা কর্তৃক রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিরাপত্তার দলিল চাওয়া। কখনো কি শোনা গিয়েছে যে, ধাওয়াকারী যাকে ধাওয়া করা হচ্ছে তার থেকে নিরাপত্তা চাচ্ছে ?

২) যে সুরাক্বা দিনের প্রথমভাগে নবীজিকে (সা) হত্যা বা আটক করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল, সেই একই সুরাক্বাই দিনের শেষভাগে এসে নবীজিকে (সা) ধাওয়া করছে এমন কারো থেকে তাঁকে রক্ষা করতে তৎপর ছিল।

৩) সুরাক্বা ও রাসূলুল্লাহর (সা) মধ্যে দু সাক্ষাতের বিশাল তফাৎ। প্রথমবার যখন সুরাক্বার সাথে নবীজির (সা) সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি মরুভূমিতে হিজরতরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর সঙ্গী আবু বকর (রা), পথ-প্রদর্শক এবং আবু বকরের (রা) খাদেম ছাড়া আর কেউ ছিল না। আরব গোত্রগুলো তখন তাঁর জন্য ওৎ পেতে ছিল এবং তাঁকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন সুরাক্বার সাথে নবীজির (সা) সাক্ষাৎ হয় তখন নবীজির (সা) আশেপাশে দশহাজার যোদ্ধা, যারা ছিল মক্কাবিজয়ী বাহিনী। আরব গোত্রগুলো তখন তাঁর কাছে দলে দলে আসছে ঈমান আনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে।

৪) সুরাক্বা যখন উটের লোভে নবীজির (সা) পিছু নিয়েছিল সে অবস্থা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় রাসূলুল্লাহ কাছে উট পাঠিয়ে দিলেন সে অবস্থা – এ দুয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য !

৫) মহাকালের পরিধিতে ৮ বছর কতই না সংক্ষিপ্ত সময়, যা যেন চোখের পলকে পার হয়ে যায় ! কিন্তু নবীজির (সা) জীবনে এ সময়কাল বিভিন্ন ঘটনাবলিতে পরিপূর্ণ। এ সময়কালে বদর, উহুদ, খন্দক যুদ্ধ

সংঘটিত হয়, হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপর আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে। সুরাক্বার চোখের সামনে ৮ বছর আগের ও পরের পার্থক্য স্পষ্ট ছিল।

৩৮ । এর চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই

তাঁর মধ্যে শক্তির ও তারুণ্যের তেজের সাথে সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতি আকাঙ্খা একত্রিত হয়েছে। সেজন্য তিনি তাঁর শক্তি ও তারূন্যের দৃঢ়তা সে খাতেই ব্যয় করলেন, যা তিনি ভালোবাসেন ও যার আকাঙ্খা তিনি করেন। তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি ইবাদতে কঠিন পরিশ্রম করবে। তিনি বললেনঃ “আমি যতদিন বেঁচে থাকব, সারারাত ইবাদত করব এবং সারাদিন রোযা রাখব।” তিনি দৃঢ়তা ও শক্তি নিয়ে এ কাজের জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি প্রত্যেক রাতে সালাতে কোরআন খতম দিতেন এবং দিনে রোযা রাখতেন।

তাঁর পিতা তাঁর সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য এমন এক কুরাইশী মেয়ে খুঁজছিলেন যিনি হবেন উদার বিবেচনা এবং ভালো বুদ্ধিবিবেচনার অধিকারিণী। যখন তাঁদের মধ্যে বিয়ে হল, তরুণ সাহাবীটি ইবাদতের কারণে তাঁর স্ত্রীর কাছেও গেলেন না। সাহাবীটির পিতা যখন ছেলের বউকে দেখতে এলেন, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ “তোমার স্বামীকে কেমন দেখলে ?” ছেলের স্ত্রী জবাব দিলেনঃ “তিনি খুবই উত্তম একজন পুরুষ মানুষ। তিনি রাতে ঘুমান না, দিনে রোযা রাখেন, আমার সামনে তাঁর সতর উন্মুক্ত করেন না। বিছানায় আমি যখন তাঁর কাছে আসি, তিনি আমার নিকটে আসেন না।” আমরু (রা) নিজের ছেলের এমন কান্ডে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তিনি ছেলেকে তিরস্কার করে বললেনঃ “তোমাকে একটি মুসলিম মেয়ের সাথে বিয়ে করালাম। আর তাকে তুমি নিজ হতে নিবৃত্ত করে রাখছ। তুমি এই এই করছো !”

কিন্তু আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতার কথাকে তেমন পাত্তা দিলেন না। তিনি দেখলেন তাঁর মধ্যে শক্তি আছে এবং তিনি ইবাদতের সুমিষ্ট স্বাদ উপভোগ করছেন। কিন্তু ব্যাপারটিতে আমরুর (রা) ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে নিজ ছেলের কর্মকান্ডের ব্যাপারে অভিযোগ করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহর (রা) বাড়িতে ছুটে গেলেন এবং তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন। আবদুল্লাহ (রা) নবীজির (সা) জন্য চামড়ার তৈরী গদি বিছিয়ে দিলেন, যার ভেতরটা ছিল খেঁজুরের আঁশ দিয়ে ভর্তি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) সেটার ওপর বসলেন না। তিনি মাটির ওপর বসলেন। গদিটা তাঁর এবং আবদুল্লাহর (রা)

মাঝে রয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “হে আবদুল্লাহ বিন আমরু, আমাকে জানানো হয়েছে যে, তুমি সারারাত সালাত পড়, সারাদিন রোযা রাখ। তুমি বলেছঃ ‘যতদিন বেঁচে আছ ততদিন দিনে রোযা রাখবে ও রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকবে।’” আবদুল্লাহ (রা) উত্তর দিলেনঃ “হ্যাঁ, হে রাসূলুল্লাহ! আমি এটা বলেছি, আপনার জন্য আমার বাবা-মা উৎসর্গীকৃত হোক। আমি এর দ্বারা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই চাই না। আমি এগুলো করতে সমর্থ।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “তুমি এটা করতে পারবে না। তাই এটা করো না। তুমি যদি এমনটা করো, তবে তোমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে, তোমার অন্তর দুর্বল হয়ে যাবে। আমি রাতে সালাতে দাঁড়াই আবার ঘুমাইও। আমি কখনো কখনো রোযা রাখি, কখনো কখনো রাখি না। তাই তুমিও রাতে সালাতে দাঁড়াও এবং ঘুমাও। রোযা রাখো আবার রোযা ছেড়ে দাও। তোমার ওপর তোমার অন্তরের অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার চোখের অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার দেহের অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার সন্তানের অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার অতিথির অধিকার আছে। তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাসে তিনটি রোযা রাখবে। যেহেতু প্রত্যেক ভালোকাজের সওয়াব দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়, এভাবে রোযা রাখলে সেটা সারামাস রোযা রাখার সওয়াবের সমান হবে।” আবদুল্লাহ বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে আমার শক্তি ও তারুণ্য আরো কাজে লাগাতে দিন। আমি এর চেয়েও বেশি করতে সক্ষম।” নবীজি (সা) বললেনঃ “তাহলে প্রত্যেক মাসে পাঁচটি রোযা রাখো।” আবদুল্লাহ বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে আমার শক্তি ও তারুণ্য আরো কাজে লাগাতে দিন। আমি এর চেয়েও বেশি করতে সক্ষম।” নবীজি (সা) বললেনঃ “তাহলে প্রত্যেক মাসে সাতটি রোযা রাখো।” আবদুল্লাহ বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমি এর চেয়েও বেশি করতে সক্ষম।” নবীজি (সা) বললেনঃ “তাহলে একদিন রোযা রাখ, আর দুইদিন রোযা রেখো না।” আবদুল্লাহ বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমি এর চেয়েও বেশি করতে সক্ষম।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “তাহলে আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম যে রোযা সেটা রাখো। আর সেই রোযা হচ্ছে নবী দাউদের (আ) রোযা। তিনি ছিলেন মানুষের সর্বাধিক ইবাদতকারী। এটাই সর্বোত্তম রোযা, এর চেয়ে বেশি করতে যেও না।” আবদুল্লাহ বললেনঃ “নবী দাউদের (আ) রোযা কেমন ছিল ?” নবীজি (সা) উত্তর দিলেনঃ “তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা রাখতেন না। তিনি ওয়াদা করে ভঙ্গ করতেন না। যখন যুদ্ধে মোকাবেলা করতেন, পলায়ন করতে না।” আবদুল্লাহ বললেনঃ “কে এমন আছে যার সামনে থেকে আমি পলায়ন করবো।” এরপর বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমি এর চেয়েও বেশি করতে সক্ষম।” নবীজি (সা)

বললেনঃ “এর চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই। যে সারাজীবন রোযা রাখল, সে এমন যেন সে কখনো রোযাই রাখে নি।”

এরপর নবীজি (সা) বললেনঃ “প্রত্যেক মাসে একবার কোরআন খতম দেবে” অর্থাৎ রাতের সালাতে। আবদুল্লাহ বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমি এর চেয়েও বেশি করতে সক্ষম।” নবীজি (সা) বললেনঃ “তাহলে প্রত্যেক বিশদিনে একবার কোরআন খতম দেবে।” আবদুল্লাহ বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমি এর চেয়েও বেশি করতে সক্ষম।” নবীজি (সা) বললেনঃ “তাহলে প্রত্যেক দশদিনে একবার কোরআন খতম দেবে।” আবদুল্লাহ বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমি এর চেয়েও বেশি করতে সক্ষম।” নবীজি (সা) বললেনঃ “তাহলে প্রত্যেক সাতদিনে একবার কোরআন খতম দেবে। এর চেয়ে বেশি করতে যেও না।” আবদুল্লাহ বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে আমার শক্তি ও তারুণ্য কাজে লাগাতে দিন। আমি এর চেয়েও বেশি করতে সক্ষম।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মানা করে বললেনঃ “আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে দাউদের (আ) রোযা, সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে দাউদের (আ) সালাত। তিনি রাতের প্রথম অর্ধেক ঘুমাতেন, এরপরের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়াতেন, এবং পরের এক ষষ্ঠাংশ আবার ঘুমাতেন। প্রত্যেক আমলের জন্যই শক্তি থাকে। কিন্তু এই শক্তি ক্ষণস্থায়। যে এই শক্তির সময়কালকে আমার সুন্নতের উপর অতিবাহিত করবে সে সুপথপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু যার এই শক্তির সময়কাল আমার সুন্নতের ওপর অতিবাহিত হবে না তার জন্য ধ্বংস।”

এরপর নবীজি (সা) আবদুল্লাহকে বললেনঃ “তুমি হয়তো লম্বা জীবন পাবে না, কিন্তু তা তুমি জানো না।” আবদুল্লাহ বিন আমরু (রা) পরবর্তীতে লম্বা জীবনের অধিকারী হন। এমনকি তাঁর বয়স ৯০ বছর হয়ে যায় এবং তাঁর নিয়মিত আমলের শক্তি কমে যায়। বৃদ্ধবয়সে তিনি দিনের বেলা নিজ পরিবারকে সাতদিনে একবার কোরআন খতম করে শোনাতেন যাতে রাতের বেলা সালাতে তাঁর কষ্ট কম হয়। এরপর তিনি যখন শক্তি যোগাড় করতে চাইতেন, তিনি বেশি কয়েকদিন রোযা রাখতেন না, তারপর হিসেব করে এর সমান সংখ্যক দিন রোযা রাখতেন। নবীজি (সা) তাঁর জন্য কিছু একটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটা ছেড়ে দেয়া আবদুল্লাহর (রা) জন্য অপছন্দনীয় ছিল।

আবদুল্লাহ প্রায়ই এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন, এরপর বলতেনঃ “আমি জোরাজুরি করেছিলাম। তাই আমার ওপরও চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ যা বলেছেন, আমি তাই (বৃদ্ধ) হয়েছি। আমি যদি রাসূলুল্লাহর (সা)

দেয়া সহজতা গ্রহণ করতাম, তবে তা আমার জন্য আমার পরিবার ও সম্পদের চেয়েও প্রিয় হত। আজ আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে কিছুর নির্দেশ দিয়েছেন সেটা ছাড়া আমি নিজের জন্য অপছন্দ করি।”[95]

*** এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াদি হচ্ছেঃ

১) এ ঘটনায় নবীজি (সা) এবং তাঁর সাহাবাদের মধ্যকার গভীর সম্পর্ক ও তাঁদের জীবনে নবীজির (সা) শক্তিশালী উপস্থিতির ব্যাপারটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আমরু বিন আস (রা) নবীজির (সা) কাছে গিয়ে এমন একটি ব্যাপারে কথা বলেছেন, যা ছিল তাঁর ও তাঁর ছেলের মধ্যে একান্তই বিশেষ। তিনি প্রচন্ড গুরুত্ব সহকারে নবীজির (সা) সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর মুস্তাফা (রা) নিজেই আবদুল্লাহ বিন আমরু বিন আসের (রা) বাড়িতে গেলেন তাঁর সমস্যার চিকিৎসা ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সংশোধনের জন্য।

এটা থেকে সাহাবাদের জীবনে রাসূলুল্লাহর (সা) তেজস্বী উপস্থিতি খেয়াল করা যায়, যা তাঁদের ব্যাপারগুলোতে রাসূলুল্লাহর (সা) এই অদ্ভুত সংশ্লিষ্টতার একটি কারণ।

২) নবীজি (সা) এ ব্যাপারে আমরু বিন আস (রা) থেকে তাঁর ছেলের কর্মকান্ড শুনে এরপর তাঁকে তাঁর মতামত বা আদেশ দেয়াটা যথেষ্ট মনে করেন নি। তিনি নিজে আবদুল্লাহ বিন আমরুর (রা) বাড়িতে যান এবং তাঁর থেকে ব্যাপারটি যাচাই করে নেন, এরপর এর পেছনে তাঁর যুক্তিগুলো শুনেন। তিনি আবদুল্লাহর পীড়াপিড়ি শুনলেন, তিনি তাঁর যুক্তিগুলোও জানতে পারলেন তাঁর এ কথার মাধ্যমেঃ “আমি এমনটা করতে সক্ষম।” এরপর নবীজির (সা) দিকনির্দেশনা শুরু হল। আমরা দেখি যে, এই দিকনির্দেশনার মধ্যে আবদুল্লাহর (রা) কেন্দ্রীয় যুক্তির খন্ডনও ছিল। যুক্তিটা ছিলঃ তিনি নিজের জন্য যা নির্ধারণ করে নিয়েছেন সেটা চালিয়ে যেতে তাঁর সক্ষমতা আছে। তিনি বলেছেনঃ “আমি এমনটা করতে সক্ষম।” নবী (সা) উলটো বললেনঃ “তুমি তা পারবে না।” এরপর তিনি স্পষ্ট করলেন যে, এই ধরনের আমলে নিজের সত্ত্বার ওপর সীমালংঘন ঘটেঃ “তুমি যদি এমনটা করো, তবে তোমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং তোমার অন্তর দুর্বল হয়ে পড়বে।” এরপর তিনি নিজের উত্তম আদর্শ তুলে ধরেনঃ “আমি রাতে সালাত আদায় করি এবং ঘুমাইও। কোনদিন রোযা রাখি, কোনদিন রোযা রাখি না।” যিনি আমাদের রোযা রাখা এবং রাতে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি নিজেই কখনো কখনো রোযা রেখেছেন, কখনো কখনো রোযা রাখেন নি। রাতে সালাতও

আদায় করেছেন, আবার ঘুমিয়েছেনও। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে এই ব্যাপারে অনুসরণ করা। এরপর তিনি আবদুল্লাহর (রা) এই দৃঢ়তার ফলে নিজের, স্ত্রীর, সন্তানের ও অতিথিদের যে অধিকার নষ্ট হবে সে ব্যাপারটা তুলে ধরেন।

নবীজির (সা) এই সংক্ষিপ্ত বাচন আবদুল্লাহর (রা) নির্ধারিত আমলের পেছনের সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণাকে আমলে নিয়েছে। এরপর তা আবদুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গীকে সংশোধন করেছেন এবং তাঁর নির্ধারিত আমলের যে বিভিন্ন মাত্রার প্রভাব তাঁর জীবনের ওপর পড়বে সেটাকে তুলে ধরেছেন। নবীজির (সা) বাচন কতই না সংক্ষিপ্ত অথচ তা এই বিষয়ের সবগুলো দিককে পরিবেষ্টন করেছে।

৩) এ ঘটনায় জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যকার ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর নবীজিকে (সা) জোর দিতে দেখা যায়, যা তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার একটি প্রমাণ। তিনি বলেনঃ "তোমার ওপর তোমার অন্তরের অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার চোখের অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার দেহের অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার সন্তানের অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার অতিথির অধিকার আছে।"

নবীজি (সা) জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং এগুলোর মধ্যকার ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জীবনের একটি দিকে বাড়াবাড়ি জীবনের অন্যান্য দিকে কমতির সৃষ্টি করবে। জীবনের অনেক ধরনের অধিকার আছে যেগুলো সংরক্ষণের দিকে খেয়াল রাখা উচিত।

৪) এ হাদীসে নবুওয়াতের অন্যতম একটি নিদর্শন দেখা যায়। নবীজি (সা) এবং আবদুল্লাহ বিন আমরুর (রা) মধ্যে যখন এ কথোকপন চলছিল তখন আবদুল্লাহর বয়স ছিল ত্রিশের ঘরে। নবীজি (সা) তাঁকে বলেনঃ "হয়তো তুমি লম্বা জীবন লাভ করবে।" আবদুল্লাহ (রা) নবীজির (সা) এ কথা শোনার পর আরো প্রায় ৬০ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক এই নবীর ওপর যিনি নিজের থেকে কোন কথা বলতেন না।

৫) সাহাবাদের জীবনে কোন কিছু মেনে চলার শক্তিও এ ঘটনা থেকে দেখা যায়। আবদুল্লাহ বিন আমরুর (রা) সাথে নবীজির (সা) সাথে কথোকপনে তাঁরা দুজন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়মিত আমলে একমত হন, যা

আবদুল্লাহ (রা) করতে থাকবেন। সেটা হচ্ছেঃ একদিন রোযা রাখা, আরেকদিন রোযা না রাখা। সাতদিনে কোরআন খতম দেয়া। তিনি তাঁর তারুণ্যে এবং সক্ষমতা থাকা সময়ে এই আমল যথাযথভাবে পালন করেন। এরপর তিনি অতিবৃদ্ধ বয়সে পৌঁছেন। তাঁর শক্তি কমে যায় ও তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এরপরও তিনি সেই নিয়মিত আমলে কমতি আনেন নি, যদিও এই আমল ছিল নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নবীজির (সা) সাথে যে আমলের ব্যাপারে তিনি একমত হয়েছিলেন, সেটা ছাড়া তিনি পছন্দ করেন নি।

এ থেকে আমরা সাহাবাদের (রা) জীবনে নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃঙ্খলার শক্তি দেখতে পাই। যদি নফল ইবাদতেই তাঁদের এরকম সুশৃঙ্খলার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও ফরয ইবাদতগুলোতে তাদের দৃঢ়তা কেমন ছিল ?!

৬) আমরু বিন আসের (রা) উত্তম পিতৃত্বও এখানে লক্ষ্যণীয়। তিনি একজন প্রজ্ঞাবান ও অভিজ্ঞ মানুষ, যিনি তাঁর ছেলের ব্যাপারে চিন্তা, তাঁকে দেখতে যাওয়া এবং তাঁর অবস্থার খবরাখবর নেয়া থেকে কখনো বিরত হন না। তিনি ছেলের নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্তই এ ধরনের দেখাশোনা সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি তাঁর ছেলের কোন ভুল পেলে তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তা সংশোধন করে দেন। তিনি তাঁর অন্তঃদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা বুঝছিলেন যে, তাঁর ছেলের জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হবে। এজন্যই তিনি ছেলের স্ত্রীকে প্রশ্ন করে ছেলের খোঁজ খবর নেন। ছেলের স্ত্রীর জবাব থেকে তিনি তাঁর ছেলের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে জানতে পারেন। বিশেষ সম্পর্কের কথা আসলে, নারীরা তাদের স্বভাবসুলভ লজ্জাশীলতার কারণে তা চেপে যায়। কিন্তু আবদুল্লাহর (রা) স্ত্রি সাহস করে আবদুল্লাহর (রা) আমল তাঁদের দাম্পত্য বিশেষ সম্পর্কে কি সমস্যা সৃষ্টি করছে তা তুলে ধরেন। কিন্তু তিনি তা চূড়ান্ত বুদ্ধিমত্তা ও আদাবের সাথে তুলে ধরেন। তিনি প্রশংসামূলক ভঙ্গীতে নিজ স্বামীর বর্ণনা তুলে ধরেনঃ "তিনি খুবই উত্তম একজন পুরুষ মানুষ। তিনি রাতে ঘুমান না, দিনে রোযা রাখেন, আমার সামনে তাঁর সতর উন্মুক্ত করেন না। বিছানায় আমি যখন তাঁর কাছে আসি, তিনি আমার নিকটে আসেন না।" এই উচ্চমানের কথা থেকে এই নারীর সম্ভ্রমবোধ, বুদ্ধিমত্তা ও তাঁর নিজের শরয়ী অধিকারের ব্যাপারে তাঁর সচেতনতার সন্ধান মেলে; সেইসাথে এই নারীকে নিজ ছেলের জন্য পছন্দ করার পেছনে আমরুর (রা) প্রজ্ঞারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩৯ । আশ’আরীগণ

একদল সম্ভ্রান্ত সৎকর্মশীল লোক রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হিজরত করলেন। তাঁরা ছিলেন ইবাদতগুজার ও আল্লাহওয়ালা লোক। রাত্রিবেলা তাঁদের গুণগুণ কোরআন তেলাওয়াতের শব্দের জন্য তাঁদের ঘর চিহ্নিত করা যেত। তাঁরা শৌর্য্য ও পরার্থপরতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তাদের পরিবারের জন্য যখন খাদ্য কম থাকত, তারা একটি কাপড় নিয়ে সেখানে তাদের সবার কাছে যা খাদ্য আছে তা জমা করতেন, এরপর তা নিজেদের মধ্যে সমান সমান ভাগ করে নিতেন। তাঁরা তাঁদের দারিদ্র্য ও সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও চমৎকার সবর করতেন।

তাবুক অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। তাঁর কাছে এই আশা’আরীগণ আসলেন জিহাদ ও শাহাদাতের তামান্না নিয়ে। তাঁরা চাচ্ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) যেন তাঁদের সৈন্যবাহিনীর সাথে বহন করে যুদ্ধে নিয়ে যান। দারিদ্র্যের কারণে তাঁরা এ লম্বা সফরের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না। তাঁরা এমন সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাহন চাওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন যখন তিনি খুব রাগান্বিত ছিলেন। এটার কারণ ছিল সম্ভবত তখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মুসলিম বাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য তাঁর প্রচন্ড ব্যস্ততা ও মনোনিবেশ। তাই আশ’আরীগণ যখন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বাহন চাইলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রাগান্বিত হয়ে জবাব দিলেনঃ “আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের কোন বাহনই দেবো না।” তাঁরা রাসূলের (সা) সামনে থেকে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের ওপর রাগ করেছেন – এই আশঙ্কায় তাঁরা প্রচন্ড কষ্ট পেলেন।

তাঁরা যখন এমনটা ভাবছিলেন, ঠিক তখনই বিলাল (রা) তাঁদেরকে ডেকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যাওয়ার আহবান করলেন। তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে গেলেন, তিনি তাঁদেরকে পাঁচটি বড়, মোটাতাজা এবং সুন্দর উট দিলেন এবং বললেনঃ “আল্লাহর রাসূল তোমাদের এই বাহনগুলো দিয়েছেন। অতএব তোমরা এগুলোতে আরোহণ করো।” তাঁরা রওনা দিলেন। কিন্তু একটু সময় পরই তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলেনঃ “আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁর নিজের শপথ ভুলে যাওয়ার ফায়দা নিয়েছি। আমরা তাঁকে তাঁর শপথের কথা মনেও করিয়ে দেই নি। আল্লাহ আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দিবেন না। আমরা এর পর আর

কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারব না। চলো আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে যাই এবং তাঁকে তাঁর সেই শপথের কথা মনে করিয়ে দেই।” তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে এলেন এবং বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আপনি তো শপথ করেছিলেন, আমাদেরকে বাহন দেবেন না। কিন্তু আপনি আমাদের বাহন দিলেন। আমরা ভাবলাম, আপনি হয়তো আপনার শপথের কথা ভুলে গিয়েছেন।” নবী (সা) কিছুক্ষণ আগেও রাগান্বিত ছিলেন। কিন্তু এবার তিনি তাঁর সদা পরিচিত সহৃদয়তা ও হাসিখুশি মন নিয়ে বললেনঃ “আমি তোমাদেরকে বাহন দেই নি। আল্লাহ তোমাদের বাহন দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্, এরপর থেকে আমি শপথ করার পর যদি যে বিষয়ে শপথ করেছি তার চেয়ে যদি উত্তম কিছু দেখি, তাহলে সে উত্তম বিষয়ের উপর আমল করব এবং শপথ ভঙ্গের জন্য কাফফারা দিয়ে দিব।” এটা শুনে তাঁদের মন তৃপ্তি ও অন্তর শান্ত হল এবং তাঁরা প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভব করল।[96]

*** এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলঃ

১) এ ঘটনায় নবীজির (সা) যে রাগ দেখা যায়, তা মানবপ্রকৃতির খুবই স্বাভাবিক একটি অংশ। নবী (সা) থেকে এ রাগ প্রকাশিত হয়েছে নবীজির (সা) দাওয়াতের একটি বড় দিকের ওপর জোর দেয়ার জন্যঃ “আমার প্রতিপালক মহান! আমি মানুষ ও রাসূল ছাড়া আর কি?” [সূরা ইসরাঃ ৯৩]। তাঁর কাছ থেকে ক্রোধানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, যাতে তিনি তাঁর উম্মতের জন্য রাগ অবস্থায় কি করতে হয় সেই বিষয়ে আইন নিয়ে আসতে পারেন। একইভাবে তিনি কখনো কখনো ভুলে গিয়েছেন, যাতে ভুলে গেলে কি করতে হয় সেই ব্যাপারে আইন নিয়ে আসতে পারেন নিজ উম্মতের জন্য। একইসাথে তিনি উম্মতকে মানুষের জন্য মানুষকেই রিসালাতের দায়িত্ব ও আদর্শ করে পাঠানোর পিছে আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞা শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। নবীজির (সা) অন্যান্য মানুষের মতই স্বভাবজাত প্রকৃতি, অনুভূতি এবং আবেগ ছিল।

২) এই ঘটনায় নবীজির (সা) রাগান্বিত হওয়া একটি ব্যতিক্রম অবস্থা, যা নবীজির (সা) ক্ষেত্রে একটি সাধারণ মূলনীতির মহিমা তুলে ধরে। নবীজি (সা) রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচন্ড ক্ষমতা রাখতেন। নবীজির (সা) ক্রোধান্বিত হওয়ার এ ব্যতিক্রম ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন সময় ক্রোধ উস্কে দেয় এমন ঘটনাগুলোতে নবীজি (সা) যে ক্ষমা ও ধৈর্য্য দেখিয়েছেন তা এজন্য নয় যে, তাঁর প্রকৃতি ফেরেশতাদের প্রকৃতির মত, যেখানে এ ধরনের আবেগ-অনুভূতি দেখানোর সুযোগ নেই, অর্থাৎ ফেরেশতারা উত্তেজিত হয়,

কিন্তু মানুষের মত ক্রোধ দেখাতে পারে না। বরঞ্চ নবীজি (সা) রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতেন; তিনি রাগ চেপে যেতেন, ক্ষমা করতেন এবং উদারতা দেখাতেন। তাঁর চারিত্রিক মহিমার কারণে তিনি বেশিরভাগ সময়েই নিজের উত্তেজনার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারতেন।

৩) আশ'আরীগণ এমন কোন কারণে আসেন নি, যা ক্রোধ উস্কে দেয়ার কারণ হতে পারে। তাঁরা ধনী হওয়ার জন্য সম্পদ অথবা গনীমত চাইতে আসেন নি। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিজেদের ঘামসঞ্চিত রক্ত এবং হৃদয়সঞ্চিত জীবন আল্লাহর পথে স্বস্তায় পেশ করতে এসেছিলেন। তাঁরা নবীজির (সা) কাছে বাহন চাইতে এসেছিলেন যা তাঁদের সেখানে নিয়ে যাবে যেখানে তাঁদের রক্ত ঝরবে, তাঁদের আত্মা বিলি হবে এবং তাঁদের শেষ নিঃশ্বাস আল্লাহর জন্য ত্যাগ করা হবে। তাহলে নবীজি (সা) কেন তাঁদের ওপর রাগান্বিত হলেন, অথচ তিনি বেদুইনদের সাথে ক্ষমা, উদারতা এবং সহনশীলতা দেখিয়েছেন, যারা তাঁর কাছে নাছোড়বান্দার মত সম্পদ চাইতো আর নবীজিও (সা) তাঁদের ভরপুর সম্পদ দান করতেন? তিনি বেদুইনদের বিরক্তিকর জোরাজুরির মোকাবেলায় নিজের সুন্দর সহনশীল আচরণ দেখাতেন। রাসূলুল্লাহ বলেনঃ "আমার কাছে যদি এই কাঁটাওয়ালা ঝোপগুলোর সমান সংখ্যক উট থাকত, আমি তা তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দিতাম। তোমরা আমাকে কৃপণ বা কাপুরুষ হিসেবে পেতে না।"[97]

এমনটাই ছিল নবীজির (সা) আচরণ তাঁদের সাথে যাঁদের তিনি ভালোবাসতেন, তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসতেন; তিনি তাঁদের প্রতি সহনশীল ছিলেন, তাঁরাও তাঁর প্রতি সহনশীল ছিলেন; তিনি তাদের প্রশ্রয় দিতেন, তাঁরাও তাঁকে প্রশ্রয় দিতেন। তবে তিনি অন্যদের নিজের সম্পদ থেকে এবং তাদের সাথে অধিকতর উদার আচরণ দেখাতেন। এটা এজন্য না যে, তিনি তাদের তাদের ভালোবাসতেন বরং এজন্য যে, ইসলামে নতুন আসা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সংস্পর্শ কম পাওয়ার কারণে তাদের ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়া ও কোমলতার অধিকতর প্রয়োজন ছিল। এজন্যই নবীজি (সা) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! আমি কাউকে কাউকে দেই, আবার কাউকে কাউকে দেয়া থেকে বিরত থাকি। যাদেরকে আমি দেই না তারা আমার কাছে তাদের থেকে অধিকতর প্রিয় যাদের আমি দেই। আমি কিছু মানুষকে দেই যাদের মধ্যে আমি ধৈর্য্য ও সন্তুষ্টি দেখি না। আবার আল্লাহ যাদের অন্তরে নিজের যা আছে তা নিয়ে তুষ্টি ও কল্যাণ সৃষ্টি করেছেন তাদের আমি দেই না।" নবীজির (সা) এই দানের মধ্যে যেমন সম্পদ দান অন্তর্ভুক্ত, তেমনি অন্তর্ভুক্ত তাঁর চারিত্রিক ও আচরণগত উদারতা। এজন্য

কেউ যখন তার প্রাকৃতিক ঝোঁক অনুযায়ী আচরণ করে, তখন তার এমন কারো থেকে সতর্ক থাকা উচিত যে তাকে তার কোন আচরণের জন্য ক্ষমা করবে না।[98]

৪) নবী কারীমের (সা) আশ্চর্যজনক চারিত্রিক মহত্ব এখানে ফুটে উঠেছে। তিনি প্রকাশ্যে জোর দিয়ে শপথ করেছিলেন যে, তিনি আশ'আরীগণকে দেবেন নাঃ "আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে বাহন দেব না।" কিন্তু এরপরও তিনি চূড়ান্ত দ্রুততার সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক মনে তাঁর এই শপথ থেকে ফিরে আসেন যখন এর চেয়ে উত্তম বিকল্প খুঁজে পান। যে শপথ তিনি প্রকাশ্যে করেছেন এবং এর ওপর কসমও খেয়েছেন সেটা থেকে ফিরে এর চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্তে আসতে তিনি দোষের কিছু দেখেন নি।

অনেক সময় এমন হয় যে, আমরা আবেগের বশে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। এরপর এর শৃঙ্খলে নিজেদের এমনভাবে বেঁধে ফেলি যে, তা বদলে করে এর চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্তে যাওয়া অথবা ভুল সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার ইচ্ছাশক্তি আমাদের হয়ে উঠে না, যদিও তা পুত্রের ব্যাপারে পিতার অথবা ছাত্রদের ব্যাপারে শিক্ষকের কিংবা শাসিতদের ব্যাপারে শাসকের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে।

এমন ঘটনা কতই না দেখা যায়, অনেকে ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও শয়তানের প্ররোচনা অথবা নিজেদের অহংকারের কারণে একগুঁয়েভাবে নিজেদের ভুলের উপর অটল থাকে, যদিও তাদের সামনে তাদের ভুল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলেনঃ "ইনশাআল্লাহ্, এরপর থেকে আমি শপথ করার পর যদি যে বিষয়ে শপথ করেছি তার চেয়ে যদি উত্তম কিছু দেখি, তাহলে সে উত্তম বিষয়ের উপর আমল করব।"

৫) ফেরেশতাদের মত স্বচ্ছ ও পবিত্র মনের অধিকারী এই আশ'আরীগণের অন্তরে ঝাঁক মারতে পারলে আমাদের হয়তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হত। তাঁরা পৃথিবীর বুকে ঈমান, স্বচ্ছতা ও দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করত। তাঁদের অন্তরে তাঁদের নবীর (সা) জন্য বিন্দুমাত্র তিক্ততাও ছিল না, যদিও তিনি তাঁদের ওপর রাগান্বিত হতেন, তাঁদেরকে মানা করে দিতেন এবং সেটার ওপর কসমও খেতেন। বরং তাঁদের অন্তরে তো রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য ভালোবাসা ও তাঁর কথার জন্য সম্মানই পাওয়া যেত। তাঁরা যখন ভাবলো, তাঁরা নবীজিকে (সা) তাঁর শপথের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের দোষারোপ করে তাঁর কাছে ফিরে

গেলেন। তাঁরা নিজেরাই নবীজিকে (সা) তাঁর শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিলেন এবং তাঁকে তাঁর শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইলেন।

এটা হচ্ছে হৃদয়ের স্বচ্ছতা, অন্তরের উজ্জ্বলতা এবং রিসালাতের সত্যতা ও রাসূলের (সা) ওপর ঈমানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত।

রাসূলুল্লাহকে (সা) তো আল্লাহ তাঁর রিসালাতের জন্য বাছাই করেছিলেনই। তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিলেন তাঁদেরকে আল্লাহ তাঁকে সঙ্গ দেয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথে যারা আছে..." [সূরা ফাতহঃ ২৯]।

৬) রাসূলুল্লাহর (সা) এ ঘটনার আগে আরো অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যেখানে তাঁর কোমলতা, মানুষের মনে ভালোবাসার বীজ বুনে দেওয়া এবং তাদের অন্তরসমূহকে অভিভাবকত্বের অনুভূতি দিয়ে পরিপূর্ণ করে তোলা ফুটে উঠেছে। এসব পূর্বাপর ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে যখন রাসূলের (সা) রাগান্বিত হওয়ার ঘটনা ঘটে তা অভিঘাতের সৃষ্টি করে না। বরং এ ঘটনাকে এর সীমিত পরিসরে আবদ্ধ করে এর উত্তম ব্যাখ্যা করতে হবে। এই কাজের ফলে রাসূলুল্লাহর (সা) ভালোবাসা ও সহৃদয়তার যে সুবিশাল ভান্ডার আছে তা থেকে তেমন কিছুই কমবে না।

৪০। দু বেণীর অধিকারী

নু'মান উপত্যকা। এখানে বিশাল জায়গা। এটি চারদিকে সুউচ্চ পাহাড় দ্বারাও ঘেরাওকৃত। এই পাহাড়গুলো এতটাই লম্বা যেন মনে হয় এগুলোর কাঁধে আকাশের গম্বুজ অবস্থিত। সেখান থেকে এক ব্যক্তি তাঁর উটে চড়ে ইয়াছরিব অভিমুখে রওনা দিল। এই অভিমুখে ৮দিন চলার পরই সে মদীনায় পৌঁছাবে। মদীনায় তার কোন ব্যবসা নেই যেখানে থেকে লোকটি লাভবান হবেন; আর না সেখানে তার কোন আত্মীয়স্বজন আছেন যাদের সে দেখতে যাচ্ছে। তার সেখানে প্রয়োজন সেই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করা যিনি নিজেকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে দাবী করেন। লোকটি তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা ও রিসালাতের বাস্তবতা যাচাই করতে যাচ্ছেন। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর আনুগত্য কোন দ্বীনের মাধ্যমে করা যাবে সেই ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে।

লোকটি মদীনায় পৌঁছাল। তার উটটিকে মসজিদের দরজার কাছে রেখে রশি বাঁধল, এরপর মসজিদে প্রবেশ করল। লোকটি ছিল এক শক্তপোক্ত বেদুইন যার চুলগুলো কোঁকড়া ছিল। সে তার চুলে দুটো বেণী করত। লোকটি মসজিদে সামনে এগিয়ে সাহাবাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁরা তখন বসা অবস্থায় ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের মাঝেই অবস্থান করছিলেন। আগমনকারী রাসূলুল্লাহকে (সা) চিনতে পারল না, তাই সাহাবাদের নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলঃ "তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান কে?" রাসূলুল্লাহকে (সা) সাহাবাদের থেকে আলাদা করা যেত না। তাঁর এমন কোন চিহ্ন বা অবস্থা ছিল না যা দ্বারা তাঁকে আলাদা করা যেত। তাই সাহাবারা নবীজির (সা) ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য ছাড়া এমন কিছু পেল না যা দ্বারা তাঁকে চেনানো যায়। তাই তাঁরা বললেনঃ "ওই যে উজ্জ্বল বর্ণের ঢেলান দিয়ে বসে আছেন যে ব্যক্তি তিনিই আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।" আগমনকারী নবীজির (সা) দিকে অগ্রসর হল এবং তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। এরপর তাঁকে অন্যদের মত ডেকে বললঃ "হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।" নবীজি (সা) উত্তর দিলেনঃ "আমিই আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।" আগমনকারী বললঃ "মুহাম্মাদ?" নবীজি (সা) বললেনঃ "হ্যাঁ।" এটা তো রূঢ়ভাবে নবীজিকে (সা) ডাকা ছিলই, এর ওপর আগমনকারী বললঃ "আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব এবং আপনার ওপর জোরাজুরি করব। আমার ব্যাপারে মনে কিছু নেবেন না।" মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ

শিক্ষক জবাবে বললেনঃ “আমি কিছুই মনে করব না। তোমার যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করতে পার।” তাঁর আনীত দ্বীনে বা শিক্ষায় কোন অবৈধ জিনিস অথবা কোন দুর্বোধ্য দিক ছিল না। সবকিছুই ছিল সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

আগমনকারী এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল যা থেকে তার বুদ্ধিগত স্বচ্ছতা এবং পদ্ধতিগত চিন্তাভাবনা ফুটে। তার প্রথম প্রশ্ন ছিলঃ “আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?” রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দিলেনঃ “আল্লাহ।” এরপরের প্রশ্ন ছিলঃ “পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে?” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “আল্লাহ।” এরপর জিজ্ঞাসা করলঃ “এই পাহাড়-পর্বত ও জগতে যা কিছু আছে তা কে সৃষ্টি করেছে?” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “আল্লাহ।” এরপর আগমনকারী বললঃ “আমি সেই সত্ত্বার নামে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি এই আসমান ও পৃথিবী, পর্বতমালা ও জগতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন, যিনি আপনার এবং আপনার পূর্ববতী ও পরবর্তী মানুষদের ইলাহঃ ‘আল্লাহ কি আপনাকে সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন?’” নবীজি (সা) বললেনঃ “হ্যাঁ।” এরপর আগমনকারী বললঃ “আমি আপনাকে সেই সত্ত্বার নামে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেনঃ আল্লাহ কি আপনাকে এই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করব এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা আল্লাহর সাথে যেসব মূর্তির উপাসনা করত তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত করি?” নবীজি (সা) বললেনঃ “হ্যাঁ।” এরপর আগমনকারী বললঃ “আমি আপনাকে সেই সত্ত্বার নামে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেনঃ আল্লাহ কি আপনাকে এই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমরা দিনে ও রাতে এই পাঁচবার সালাত আদায় করব?” নবীজি (সা) উত্তর দিলেনঃ “হ্যাঁ।” এরপর আগমনকারী জিজ্ঞাসা করলঃ “আমি আপনাকে সেই সত্ত্বার নামে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেনঃ আল্লাহ কি আপনাকে এই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আপনি ধনীদের থেকে সাদাকা নিয়ে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করবেন?” নবীজি (সা) উত্তর দিলেনঃ “হ্যাঁ।” এরপর আগমনকারী জিজ্ঞাসা করলঃ “আমি আপনাকে সেই সত্ত্বার নামে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেনঃ আল্লাহ কি আপনাকে এই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমরা রমযান মাসে রোযা রাখব?” নবীজি (সা) উত্তর দিলেনঃ “হ্যাঁ।” এরপর আগমনকারী জিজ্ঞাসা করলঃ “আমি আপনাকে সেই সত্ত্বার নামে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেনঃ আল্লাহ কি আপনাকে এই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তাঁরা বাইতুল্লাহয় হজ্জ্ব করবে?” নবীজি (সা) উত্তর দিলেনঃ “হ্যাঁ।” আগমনকারী বললঃ “তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সেই সত্ত্বার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আপনি

যেগুলো বলেছেন আমি সেগুলোর বেশিও করব না, কমও করব না। আমি বনু সা'দ বিন বকর গোত্রের দিমাম বিন ছা'লাবা। আমরা জাহেলিয়াতের সময়েই এসব ন্যক্কারজনক জিনিসের অনেকগুলো থেকে দূরে থাকতাম। ইসলামে আসার পর আমরা এসব থেকে আরো বেশি দূরে থাকব।"

দিমাম যখন যাওয়ার জন্য মুখ ঘুরালেন, নবী (সা) বললেনঃ "এই লোকটি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। যদি এই দুই বেণীওয়ালা লোকটি যা বলছে তা সত্য হয়ে থাকে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

গভীর জ্ঞানী সাহাবারা এই বেদুইনের গভীর বুঝ থেকে অবাক হলেন। উমার (রা) বললেনঃ "আমি দিমাম অপেক্ষা চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নকারী আর দেখি নি।"

দিমাম যখন তাঁর গোত্রের কাছে পৌঁছালেন, তারা তাঁর নিকট জড়ো হল। দিমাম প্রথম যে কাজটি করলেন সেটি হলঃ তাঁর গোত্রের সবচেয়ে বড় উপাস্যটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। এরপর চিৎকার করে বললেনঃ "লাত ও উযযা কতই না জঘন্য!" তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁদের উপাস্য মূর্তির ওপর তাঁর দুঃসাহস দেখে অবাক হল এবং তাঁকে উপাস্যদের ক্রোধ ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে বললঃ "হে দিমাম! বারাসের ভয় করো, জুযামের ভয় করো।"

কিন্তু দিমাম তো এই আকীদা ত্যাগ করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও আকীদার সংশোধন করেছে। তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের বললেনঃ "তোমাদের ধ্বংস হোক। আল্লাহর শপথ! এই দুই মূর্তি ক্ষতি-উপকার কোনটাই করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওপর একটি কিতাব নাযিল করেছেন। তিনি তা দ্বারা তোমরা যে অবস্থায় ছিলেন তা থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আদেশ-নিষেধের বিধান নিয়ে এসেছি।"

তিনি তাদের সাথে কথা বলে সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের বুঝাতে লাগলেন। সেদিন তাঁর উপস্থিতিতে থাকা একজন নারী বা পুরুষ কেউই ইসলাম গ্রহণ না করে থাকেনি। সাহাবাগণ তাঁর এই কাজের কথা শুনলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ "আমরা কোন আগত প্রতিনিধি থেকে দিমাম বিন ছা'লাবার কথা থেকে উত্তম কথা শুনিনি।"[99]

*** এই ঘটনা থেকে লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ

১) দ্বীন পালনে সঠিকতা এবং বিশ্বাসে দৃঢ়তা দিমামের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। সেজন্যই তিনি এত লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে মদীনায় সফর করেছেন, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে তাঁর কাছে যেসব কথা পৌঁছেছিল সেগুলোর সত্যতা যাচাই করতে পারেন এবং তাঁর আগের ধর্মের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। এ থেকে ধর্ম পালনের ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। এরপর যখন তাঁর সামনে এই রাসূলের এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাঁর সামনে থাকা লোকটি যে আল্লাহর নবী তা পরিস্কার হয়ে যায়, তিনি এই দ্বীন আরোপিত দায়িত্ব তুলে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

২) নবীজি (সা) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যেভাবে পরিপূর্ণভাবে আত্মীভূত থাকতেন, তা এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায়। তাঁদের কাছে আগমনকারী একজন নবীজিকে (সা) তাঁদের মধ্য থেকে আলাদা করতে পারছিল না। তাই সে বলে উঠেছিলঃ "তোমাদের মধ্যে কে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান?" নবীজির (সা) পোশাক আশাক বা অবস্থায় এমন কিছু ছিল না যা তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করবে। সেজন্যই তিনি সাহাবীদের তাঁর চারপাশে দাঁড়াতে মানা করেছিলেন যেমন কিনা অনারবদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। নবীজির (সা) এই অবস্থা ছিল অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের অবস্থা থেকে অনেক দূরে। সাহাবীদের সাথে তাঁর এরকম নৈকট্য এবং তাঁদের সাথে এরকম আত্মীভুবন সাহাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চালচলন সংশোধন করে দেয় এবং তাঁদের অন্তরের গহীনে তাঁর জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে।[100]

৩) দিমাম নবীজির (সা) কাছে এসেছিলেন মক্কা বিজয়ের পর, যখন মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছিল। সেসময় আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ এলাকাই রাসূলুল্লাহর (সা) শাসনাধীনে চলে আসে। এ অবস্থাতেও দিমাম নবীজির (সা) সাথে এভাবে কথা বলেন ও তাঁর সাথে এভাবে রুক্ষতা দেখান ও প্রশ্ন করার জন্য চাপাচাপি করেন। এরপরও নবীজি (সা) তাঁর সুমহান চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে দিমামের এই আত্মবিশ্বাস ও কথাবার্তায় সাহসিকতাকে প্রশ্রয় দেন, যাতে তাঁকে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতার ওপর ছেড়ে দেয়া যায় এবং তাঁকে নিজেকে ছোট করা ও তোষামদি না করতে হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে দিমামের মূল্যবোধ সুরক্ষিত থাকে। তাঁকে অসম্মান বা অপমান কোনটারই শিকার হতে হয় নি, ঘৃণায় জর্জরিত হতে হয় নি। তাঁরা নবীজির (সা) সামনে সম্মান নিয়ে দাঁড়াতেন, যখন তাঁর সামনে থেকে চলে আসতেন, তাঁদের সম্মান ও

আত্মবিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পেত। যদি তিনি কঠোরভাষী ও রূঢ় হৃদয়ের হতেন, তাহলে তাঁরা সবাই তাঁর চারপাশ থেকে সরে পড়তেন।

৪) "তোমার যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করতে পার" – এটা ছিল সত্য ও হেদায়েতের সন্ধানীদের সামনে নবুওয়াতী সংকেত। তাদের জন্য কোন প্রশ্নই নিষিদ্ধ প্রশ্ন নয়। রাসূলুল্লাহর (সা) আনীত দ্বীনে এমন কিছুই নেই যা উল্লেখ করতে লজ্জা পেতে হয় কিংবা যেটার ব্যাপার প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ অথবা যেটা বুঝতে ও অনুধাবন করতে বুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়ে। এজন্যই নবীজি (সা) তাঁর কাছে আগমনকারীর সামনে প্রশ্নের দুয়ার উন্মুক্ত রেখেছেন এই বলেঃ "তোমার যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করতে পার।" এবং আগমনকারীকে এই বলে নিশ্চিন্ত করলেন যেঃ "আমি তোমার ব্যাপারে কিছু মনে করব না।" এভাবেই একজন মুসলিম নিজের দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। এখানে এমন কিছু নেই যে ব্যাপারে প্রশ্ন করা তার জন্য নিষিদ্ধ।

৫) দিমাম (রা) কেবল এই জন্য নবীজির (সা) রিসালাতের ওপর ঈমান নেন নি যে, দিমামের (রা) নবীজির (সা) দিকে ছুঁড়ে দেয়া কসম নবীজি (সা) কবুল করে নিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যেঃ যে মিথ্যা দাবী করে, সে ঐ দাবীর ওপর কসম খেতেও দ্বিধা করবে না। নবীজির (সা) এই কসমের পাশাপাশি ছিল নবুওয়াতের সত্যতার যে প্রমাণসমূহ দিমাম পেয়েছিল সেগুলো। এই প্রমাণগুলো ছিলঃ

নবীজির (সা) দাওয়াতের বিষয়সমূহের ব্যাপারে দিমামের (রা) জ্ঞান। দিমাম (রা) নিজে থেকেই নবীজির (সা) সামনে দ্বীনের বিধানগুলো পেশ করেছিলেন, যেগুলোর কথা তিনি নবীজির (সা) প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। আর নবীজি (সা) কর্তৃক সেগুলোর সত্যায়নই দিমামের জন্য যথেষ্ট ছিল। নবী (সা) যেসব বিষয়ের দিকে মানুষকে ডাকছিলেন, সেগুলোতেই তাঁর রিসালাতের সত্যতা নিহিত ছিল।

দিমামের (রা) সামনে নবীজির (সা) যে রূপ ছিল সেটাও তাঁর জন্য একটা দলিল ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা ছিল সত্যবাদীদের চেহারা, যেমন কিনা আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) তাঁর ব্যাপারে বলেনঃ "তুমি যখন তাঁর চেহারা দেখবে এবং খেয়াল করবে, তুমি জানতে পারবে যে, তাঁর চেহারা মিথ্যাবাদীদের চেহারা নয়।"[101]

আরব গোত্রগুলোর নিকট নবীজির (সা) সত্যবাদীতার জন্য খ্যাতিও তাঁর নবুওয়াতের আরেকটি দলিল। সেজন্যই দিমাম (রা) তাঁকে দিয়ে শপথ করালেন কারণ তিনি জানতেন, এমন তো হতে পারে না যে, নবীজি

(সা) তাঁর কথায় সত্য বলেন, অথচ তিনি তাঁর শপথ ভঙ্গ করবেন। এমন তো হতে পারে না যে, তিনি মানুষের ব্যাপারে সত্য বলবেন, কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন। এসব দলিল মাথায় রেখেই তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) ওপর ঈমান আনেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন সব সত্যবাদীর বড় সত্যবাদী।

৬) "আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশিও করব না, এর চেয়ে কমও না।" – এ কথা বলে দিমাম (রা) নবীজির (সা) সামনে থেকে বিদায় নিলেন। এর আগে তিনি নবীজির (স) সামনে ইসলামের আরকানসমূহ পেশ করেছিলেন। এরপর তিনি এগুলোর চেয়ে বেশি করা থেকে অব্যাহতি চান, এবং এগুলোর চেয়ে কম করবেন না বলে ঠিক করেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর গোত্রের কাছে এলেন, তাদের মাঝে বক্তব্য দিলেন এবং দা'ঈ হিসেবে আবির্ভূত হলেন। তাদের সাথে তর্ক করলেন এবং তাদের শিখালেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সবাই আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করল।

দিমাম (রা) বুঝেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) সামনে যা কিছু করা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন দাওয়াত এর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা যা থেকে কম করবেন না বলে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়েছিলেন সেটার অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সর্বপ্রথম দাওয়াতী কাজ করেন। এটা ছিল দিমামের গভীর অনুধাবনের (ফিক্বহ) অংশ যে ব্যাপারে রাসূল (সা) এভাবে বলেন যেঃ "এই লোকটি গভীরভাবে অনুধাবন করেছে (ফাক্বীহা)।"

৪১ | নববী রাত

এটা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) বরকতপূর্ণ জীবনের অন্য অনেক রাতের মতই স্থির ও স্বাচ্ছন্দ্যময় একটি রাত। তাঁর জাগ্রত চোখ রাতটিকে পর্যবেক্ষণ করছিল এবং এর প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর উম্মাহর জন্য ব্যয় করছিলেন; সূর্যাস্ত থেকে সকালের উদয় হওয়া পর্যন্ত। যেন পুরো ব্যাপারটি আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

এই রাতের সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে (রা) সেদিন সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে তাঁকে মসজিদে উপবিষ্ট অবস্থায় পেলেন। নবীজির (সা) ব্যস্ততা দেখে আবদুল্লাহ (রা) তাঁর সাথে কথা বলতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) মাগরিব পড়লেন। মাগরিব সালাত শেষ করে, তিনি আবার সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এশার আযান পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন। এশার সালাত শেষ করে তিনি মসজিদে আরো চার রাকাআত সালাত আদায় করলেন। মসজিদে তখন তিনি ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। এরপর তিনি তাঁর গৃহের দিকে রওনা দিলেন। আব্বাসপুত্র তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে নিজ পিতা ও নবীজির (সা) চাচা আব্বাসের প্রয়োজনের ব্যাপারে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেনঃ “হে বৎস! আমার সাথে এক রাত কাটাও।” নবীজি (সা) তখন তাঁর স্ত্রী ও ইবনে আব্বাসের (সা) খালা মাইমুনার ঘরে রাত যাপন করছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) নবীজির (সা) কথায় আগ্রহ সহকারে রাজি হলেন। ইবনে আব্বাস (রা) তো তাঁর চাচাতো ভাই রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর খালা মাইমুনার (রা) ঘরেই রাত যাপন করতে যাচ্ছিলেন। “চাচা তো বাবার মতই।” আর “খালা তো মা।”[102103]

ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি মনে মনে বলছিলেনঃ “আমি আজ রাতে ঘুমাবো না। আমি দেখবো রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর রাতের নামাযে কি কি করেন।” তিনি না ঘুমাতে সংকল্পবদ্ধ হলেন যাতে রাসূলুল্লাহর (সা) রাতের সুন্নত ও হেদায়েত জেনে নিতে পারেন। এরপরও অতিরিক্ত সতর্কতাস্বরূপ তিনি তাঁর খালাকে বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে সালাতে দাঁড়ালে আমাকে জাগিয়ে দিবেন।”

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রী মাইমুনার সাথে এক ঘন্টা কথা বললেন। এরপর তাঁর সাথে বিছানায় গেলেন ও ঘুমালেন। তাঁদের কাছে একটাই বালিশ ছিল। নবীজি (সা) ও তাঁর স্ত্রী মাইমুনা বালিশের দৈর্ঘ্য বরাবর মাথা দিলেন আর বালক ইবনে আব্বাস (রা) বালিশের প্রস্থ বরাবর মাথা দিলেন। তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন, কখন রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতের জন্য জাগবেন এবং কিভাবে তা আদায় করবেন। যখন অর্ধেক রাত হল, রাসূলুল্লাহ (সা) জেগে উঠলেন এবং শয়নরত ইবনে আব্বাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ “বালক কি ঘুমিয়ে গিয়েছে?” এরপর তিনি বসলেন এবং তাঁর পবিত্র মুখের ওপর হাত ঘষে ঘুমের ভাব দূর করলেন। এরপর তিনি রাতের স্থিরতায় আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করে তাকালেন এবং আল্লাহর সৃষ্টির বড়ত্ব নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। তিনি সে সময় পড়ছিলেনঃ “নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও...” [সূরা আলে ইমরানঃ ১৯০-১৯১]। এভাবে তিনি সুরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পড়লেন। এরপর তিনি ঘরে থাকা পানির মশকের দিকে গিয়ে এর ঢাকনা খুললেন এবং সেখান থেকে একটি পাত্র দিয়ে পানি তুলে লম্বা সময় ধরে কম পানি দিয়ে সুন্দর ওযু করলেন। রাতটি শীতের রাত ছিল। এরপর তিনি তাঁর মেসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিস্কার করলেন। এরপর তিনি তাঁর একটি হাদরামাওতী জামা দেহে পেঁচিয়ে সালাত আদায় শুরু করলেন।

ইবনে আব্বাস (রা) নবীজির (সা) সব কর্মকান্ড নিজের চোখে লক্ষ্য করছিলেন। এরপর যখন নবীজি (সা) সালাত শুরু করলেন, ইবনে আব্বাস শায়িত অবস্থা থেকে উঠলেন এবং ঘুম থেকে জাগা ব্যক্তির মত শরীরের আড়মোড়া ভাঙলেন। তিনি জেগে জেগে নবীজিকে (সা) পর্যবেক্ষণ করছিলেন সেটা নবীজি (সা) জানতে পারুক সেটা ইবনে আব্বাস (রা) পছন্দ করেন নি। ইবনে আব্বাস ওযু করলেন যেভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) ওযু করেছেন, এরপর এসে নবীজির (সা) বামপাশে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে হাত দিয়ে ধরে নিজের পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। নবীজি (সা) ইবনে আব্বাসের প্রতি খেয়াল রাখছিলেন। তিনি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। এরপর তিনি তাঁর মাথায় হাত রাখেন এবং এরপর তাঁর

কানের লতিতে হাত রেখে মোচড়ালেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ “আমি জানি তিনি এমনটি করেছেন অন্ধকারে আমার নাগাল পাওয়ার জন্য।”

ইবনে আব্বাস (রা) নবীজির (সা) সেই রাতের সালাতের কথা সংরক্ষণ করে রাখেন। নবীজি (সা) প্রথমে দু রাকাআত সালাত ছোট করে পড়েন। এরপর তিনি আরো ১১ রাকাআত সালাত পড়েন। ফলে তিনি সর্বমোট ১৩ রাকাআত সালাত পড়েন। তাঁর সালাত ছিল সন্ন্যাসব্রতের ন্যায় ও প্রশান্তিকর। তিনি রাতের একটি বড় অংশ লম্বা সময় ধরে আল্লাহর প্রশংসা করে কাটান। ইবনে আব্বাসের মতে, রাসূলের (সা) সালাতের সময়ের দৈর্ঘ্য তাঁর ঘুমের সময়ের দৈর্ঘ্যের সমান ছিল আর তা হচ্ছেঃ রাতের এক তৃতীয়াংশ।

ইবনে আব্বাসের (রা) মতে, নবী (সা) তাঁর সালাত তাকবীরে ইহরামের মাধ্যমে শুরু করেন, এরপর তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান-যমীন ও এর মাঝে যা কিছু আছে তার সৃষ্টিকর্তা। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান ও যমীনের এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার নূর। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক। আপনি সত্য, আপনার বাণী সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কেয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আপনার কাছেই আমি আত্মসমর্পণ করি, আপনার প্রতি ঈমান আনি, আপনার উপরই তাওয়াক্কুল করি, আপনার দিকেই বর্ধিত হই, আপনার জন্যই দ্বন্দে জড়াই। আপনি আমাদের রব, আপনার দিকেই শেষ যাত্রা। হে রব! আমার গোপনীয় ও প্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দিন, যা আমি আপনার কাছে পাঠিয়েছি, যা আমি পাঠাই নি। আপনিই আমার ইলাহ, আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।”

তিনি সেজদায় এই দোয়া করেনঃ “হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে নূর সৃষ্টি করে দিন, শ্রবণে নূর সৃষ্টি করে দিন, আমার বাচনে নূর সৃষ্টি করে দিন, আমার দৃষ্টিতে নূর সৃষ্টি করে দিন, আমার ডানে নূর সৃষ্টি করে দিন, আমার বামে নূর সৃষ্টি করে দিন, আমার নিচে নূর সৃষ্টি করে দিন, আমার উপরে নূর সৃষ্টি করে দিন, আমার সামনে নূর সৃষ্টি করে দিন, আমার পেছনে নূর সৃষ্টি করে দিন, আমার নূর বৃদ্ধি করে দিন।” যখন তিনি সালাত শেষ করতেন, তিনি বিছানায় ফিরে গিয়ে আবার গভীর নিদ্রা যান। ইবনে আব্বাস তাঁর নাক ডাকার শব্দ পান। এরপর বিলাল (রা) যখন ফজরের আযান দেন, নবীজি (সা) জেগে উঠেন। এরপর দু রাকাআত সালাত ছোট

করে আদায় করেন। এরপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। এরপর লোকদের সাথে ফজরের সালাত আদায় করেন।[104]

*** এভাবেই রাসূলুল্লাহর (সা) আলোকিত রাত সম্পন্ন হল। এখানে থেকে শিক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) এই হাদীস নবীজির (সা) নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা উচিত। এই হাদীস রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত এবং তিনি যা প্রচার করেছেন সেটার সত্যতার সাক্ষী। যিনি তাঁর রাতের ঘুম ও এর আরাম বিসর্জন দিয়ে ঘরের ভেতর খুশু' ও ভক্তির সাথে সালাত আদায় করেন, যখন তাঁর ঘরে একজন ছোট বালক ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই এবং তাঁরাও আপাতদৃষ্টিতে ঘুমাচ্ছে, তাঁর নিজের নবুওয়াতের ব্যাপার নিয়ে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট এবং অত্যন্ত উঁচু মাত্রায় বিশ্বাসী। এটা এমন এক অবস্থা যেখানে অভিনয় বা কপট আচরণ প্রবেশ করতে পারে না। অবসর ও আরাম করার সময়ে মানুষ তার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থায় ফিরে যায় এবং অন্তরের অভিপ্রায় ও বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহর (সা) যে ব্যাপারগুলো ফুটে ওঠে সেগুলো আল্লাহর ব্যাপারে তাঁর দাবীর সত্যতা এবং জালিয়াতি ও মিথ্যা দাবী থেকে তাঁর দূরে থাকার একটি বড় প্রমাণ। সব সত্যবাদীর বড় সত্যবাদীর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

২) এই হাদীসে আমরা নবীজির (সা) কথার ব্যবহারিক প্রত্যায়ন দেখি। তিনি বলেছেনঃ “সালাতে আমার জন্য প্রশান্তি রাখা হয়েছে।” সেই রাতে নবীজি (সা) কতটুকু সালাত পড়লেন? তিনি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী পুরোটা সময় সালাত পড়ে কাটালেন, এরপর এশার পর চার রাকাআত সালাত আদায় করলেন আস্তে আস্তে। মসজিদে তখন আর কেউই ছিল না। এরপর রাতে নিজ বাড়িতে রাতের এক তৃতীয়াংশ ধরে আরো ১৩ রাকাআত পড়লেন। এমনটাই ছিল সালাতের সাথে নবীজির (সা) দৃঢ় সম্পর্ক। তিনি কমই সালাত থেকে বিরতি নিতেন, কিন্তু আবার তাতে আকাঙ্খা ও আকুলতা সহকারে ফিরে যেতেন।[105]

এটাও উল্লেখযোগ্য যে, এই সুমহান নবী (সা) যখন সালাতে দাঁড়াতেন তিনি কোন গুনাহ করেছেন বলে মনে করতে পারতেন না। এরপরও তিনি তাঁর রবের ওয়াদা সত্য জেনেই সালাতে দাঁড়াতেনঃ “যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।” [সূরা ফাতহঃ ২]। কিন্তু তিনি তাঁর চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার কারণে এর অন্য একটি অর্থ করতেন আর সেটা হচ্ছে আল্লাহর দাসত্বের বাস্তবায়ন করা, তাঁর ভালোবাসা

অনুভব করা, তাঁর কাছে মোনাজাতের স্বাদ উপভোগ করা এবং তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। তাঁর সালাতগুলো এমন ছিল সালাতের স্বাদ তিনি উপভোগ করতেন, এতে ডুবে যেতেন এবং এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করতেন। তিনি বলেনঃ "আযানের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তির ব্যবস্থা করো, হে বেলাল!" তিনি আরো বলতেনঃ "সালাতে আমার জন্য প্রশান্তি রাখা হয়েছে।"[106]

৩) এই ঘটনা হিজরী ৯ সাল বা এরও পরের অর্থাৎ নবীজি (সা) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। তাঁর শাসনাধীনে আরব উপদ্বীপের পুরোটা চলে এসেছে। এরপরও তাঁর জীবনযাপনে সরলতা ও সংযম দেখা যায়। নবীজির (সা) ঘরে ব্যবহার্য জিনিসপত্রের স্বল্পতাও লক্ষ্যণীয়। অথচ এটা হচ্ছে সেই ঘর যেখান থেকে আল্লাহ সকল অপবিত্রতাকে দূর করে তাকে চূড়ান্তভাবে পবিত্র করেছেন। এ ঘরে ছিল একটি পানির মশক এবং একটিমাত্র বিছানা। এজন্যই ইবনে আব্বাসের শোয়ার জন্য আলাদা বিছানা ও বালিশ ছিল না। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর স্ত্রীর সাথে বালিশ ভাগাভাগি করতে হয়। তাঁরা দুজন বালিশের দৈর্ঘ্য বরাবর এবং ইবনে আব্বাস (রা) বালিশের প্রস্থ বরাবর শয়ন করলেন। আর সেই রাতে নবীজির (সা) বাড়িতে কি খাওয়া হয়েছিল সেটা বর্ণনায় না আসলেও প্রকৃত অবস্থা কি ছিল তা অনুমেয়।

এই সুমহান নবী (সা) মানুষের দ্বীন ও দুনিয়াকে সংশোধন করার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন ও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি যখন এই পৃথিবী ও এর মানুষদের ছেড়ে যান তখন তাদেরকে বঞ্চিত করে যান নি অথবা পৃথিবীর সম্পদ থেকে নিজেকে কিছু দিয়ে যান নি বা তা থেকে নিজের বিলাসিতার জন্য কিছু খরচ করেন নিঃ "হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় তো তাঁর কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি বুঝো না?" [সূরা হূদঃ ৫১]।

৪) নবীজির (সা) ব্যক্তিত্বে ভারসাম্য এবং তাঁর জীবনে বিভিন্ন ভূমিকা চমৎকারভাবে পরিপূর্ণতার সাথে পালন করাটাও লক্ষ্যণীয়। ইবনে আব্বাস (রা) যখন তাঁকে বাড়ির বাইরে খুঁজে পেলেন, তাঁকে সর্বপ্রথম মানুষের বিষয়াদী নিয়ে ও নিজ উম্মতের অধিকার আদায়ে ব্যস্ত থাকতে দেখলেন। এরপর যখন নবীজি (সা) ঘরে ফিরলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে বসে একঘন্টা কথা বললেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর স্ত্রীর অধিকার আদায় করলেন। এরপর তিনি ঘুমালেন এবং নিজের দেহের অধিকার আদায় করলেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন নিজের রবের অধিকার আদায়ের জন্য। এসব ভূমিকা তিনি এক রাতেই পালন করলেন একজন

আবেদ ও একজন মানুষ হিসেবে। তিনি সবাইকে যার যার হক দিলেন। আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর ওপর।

৫) এ ঘটনায় চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে রাতে নিজ ঘরে রাত্রযাপন করার দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি নবীজির (সা) সদাচরণ এবং আতিথেয়তা ফুটে ওঠে। এছাড়াও এর প্রতিফলন ঘটে ইবনে আব্বাসকে (রা) ‘হে বৎস’ বলে সম্বোধন করা এবং তাঁর সাথে নিজ বালিশ ভাগাভাগি এবং রাতের আঁধারে তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে। তিনি ইবনে আব্বাসের মাথায় হাত দিয়ে ঘষে দেন এবং তাঁর কান ধরে হালকা মোচড় দেন। এই ধরনের মূল্যবান কান্ডগুলোর প্রভাব তো আছেই। এগুলোর সাথে রয়েছে নিজের নিকটাত্মীয় ও চাচার মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখা। আব্বাস পুত্র যখন তাঁর কাছে ফেরত এলেন এবং তাঁকে রাতের ঘটনা সব খুলে বললেন, আব্বাসের ওপর তখন সেটার বিরাট প্রভাব কল্পনা করা যায়? এটা ছিল মূলত রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক তাঁর চাচা আব্বাসকে সম্মান ও নৈকট্য প্রদর্শন, যা তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে (রা) আতিথেয়তার মাধ্যমে করেছেন। নবীজি বলেনঃ “চাচা তো পিতার মতই।”[107]

৬) আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা) অল্প বয়সেই উৎকর্ষতা অর্জন এ ঘটনায় ফুটে ওঠে। তিনি সেসময় মাত্র ১২ বছর বয়স্ক ছিলেন। এরপরও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) রাত্রিকালের আমল দেখার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হন এবং এর ওপর প্রচন্ড গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পুরো রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন। অথচ সেসময় রাত্রিবেলা যে আবহাওয়া ছিল তা মানুষকে রাতের ঘুমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায়। তিনি সে রাতে যা হয়েছিল তা স্মরণ রাখেন এবং এর ওপর নিজেও ভালোভাবে আমল করেন।

ইবনে আব্বাসের (রা) এই রাত্রি জাগরণের ফল ছিল এই যে, উম্মতের সামনে নবীজির (সা) রাত্রিকালীন কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এমনভাবে হাজির থাকল যেন তারা নিজ চোখে তা দেখছে।

৪২। তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াত বিদ্যমান

তিনি ছিলেন ইসলামে চতুর্থ প্রবেশকারী। তিনি ইসলামী দাওয়াতের সূচনার শুরুর দিকে মক্কায় নবীজির (সা) কাছে আসলেন এবং বললেনঃ “আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর নবী।” এরপর তাঁর সামনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নবীজির (সা) মুখে খুশির চিহ্ন দেখতে পেলেন। নবীজি (সা) যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ “তুমি কে ?”, তিনি জবাব দিলেনঃ “গিফার গোত্র থেকে জুনদুব।” এজন্যই আবু যার (রা) বলতেনঃ “আমি ইসলামে চতুর্থ প্রবেশকারী। আমার আগে তিনজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।”

তাঁর এই অগ্রগামীতার একটি কদর ছিল। তিনি যখন মদীনায় নবীজির (সা) কাছে হিজরত করেন, নবীজির (সা) নিকট তাঁর একটি আলাদা সম্মান ছিল। আবু যার (রা) সামনে উপস্থিত থাকলে নবীজি (সা) তাঁকে দিয়ে শুরু করতেন। আর যদি তিনি অনুপস্থিত থাকতেন, তাহলে তাঁর খোঁজ করতেন। রাসূলের (সা) নিকট তাঁর এই অবস্থান সত্ত্বেও তাঁর দ্বারা এমন একটি ব্যাপার সংঘটিত হয় যা তাঁর অন্তরে চূড়ান্ত প্রভাব ফেলে এবং তিনি বাকিজীবন এই ঘটনার উল্লেখ করে যান।

ঘটনাটি এরকম যেঃ তাঁর এবং এক খাদেমের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং এ অবস্থায় তাঁরা পরস্পর গালিগালাজ করেন। খাদেমটির মা ছিল অনারব কৃষ্ণাঙ্গ। আবু যার (রা) খাদেমটিকে এই বলে গালি দেনঃ ‘হে কালো মায়ের সন্তান।’ সে তা শুনে ক্রোধান্বিত হল এবং নবীজির (সা) কাছে গিয়ে আবু যারের (রা) নামে নালিশ করল এবং আবু যার তাকে কি বলেছে তা শুনালো। সে আবু যারের (রা) জন্য রাসূলের (সা) কাছে ক্ষমাও চাইল।

এরপর আবু যার (রা) যখন নবীজির (সা) সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ “তুমি কি অমুককে গালি দিয়েছো ?” আবু যার (রা) উত্তর দিলেনঃ “হ্যাঁ, হে রাসূলুল্লাহ।” নবীজি (সা) বললেনঃ “তুমি কি তাকে তার মায়ের প্রসঙ্গ তুলে গালি দিয়েছ ?” আবু যার (রা) বললেনঃ “হ্যাঁ, হে রাসূলুল্লাহ। যে কাউকে গালি দেয় সে তার বাবা-মাকেও গালি দেয়।” নবীজি (সা) বললেনঃ “হে আবু যার ! তুমি এমন একজন যার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াত রয়ে গিয়েছে।” আবু যারের (রা) ওপর এই কথার গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি

ছিলেন জাহেলিয়াতকে পিছে ফেলে আসার ক্ষেত্রে অগ্রগামী, ইসলামে প্রবেশকারী চতুর্থজন। এরপরেও তাঁর মধ্যে কিভাবে জাহেলিয়াত থেকে যায়! আবু যার (রা) বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়ে গিয়েছে?" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "হ্যা, এই বৃদ্ধবয়সেও তোমার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়ে গিয়েছে। তোমাদের অধীনস্থরা তোমাদের ভাই, আল্লাহই তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। অতএব, আল্লাহ যার অধীনে তার কোন ভাইকে রেখেছেন, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাই পরায় যা সে নিজে পরে। তার ওপর যেন তার সাধ্যাতীত কাজ চাপিয়ে না দেয়। আর যদি দেয় তাহলে যেন তাকে সাহায্য করে।"

রাসূলুল্লাহর (সা) এই কথা আবু যার (রা) তাঁর সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং ঘটনাটি জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর কল্পচোখের সামনে থেকে যায়। জীবনের শেষ দিকে তিনি মদীনার নিকটবর্তী মরু এলাকা রাবাযায় থাকতেন। তাঁর সাথে তাঁর দাসও থাকত। আবু যারের (রা) পাশ দিয়ে মা'রুর বিন সুওয়াইদ (রা) যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, আবু যার (রা) তাঁর দাসের সাথে পোশাক ভাগাভাগি করে নিলেন। আবু যার (রা) তা থেকে একটি চাদর পরিধান করলেন, আর তাঁর দাস একটি চাদর পরিধান করল। পোশাকটি দু ভাগের চাদরের সমন্বয়ে বানানো হয়েছিল। চাদর দুটো একই রকমের।

দাসের সাথে আবু যারের (রা) আচরণ দেখে মা'রুর খুব অবাক হলেন। সেযুগে দাসদের সাথে পোশাকের ক্ষেত্রে সমতা মানুষদের মধ্যে রীতি হিসেবে চালু ছিল না। তিনি আবু যারকে (রা) উদ্দেশ্য করে বললেনঃ "আপনি যদি আপনার দাসের ভাগের চাদরটি আপনার ভাগের চাদরের সাথে জড়ো করতেন, তাহলে তা আপনার জন্য পুরো একটি জামা হত। আপনার দাসকে তো আপনি অন্য জামাও পরাতে পারতেন।"

আবু যার (রা) বললেনঃ "আমি তোমাকে এ ব্যাপারে একটি ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করত। রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে একবার আমার আর আমার এক (মুসলিম) ভাইয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল এবং আমাদের মধ্যে পরস্পর গালি বিনিময় হচ্ছিল। আমি তাঁর অনারব কৃষ্ণাঙ্গ মায়ের প্রসঙ্গ তুলে তাকে গালি দিলাম......" এরপর তিনি পুরো ঘটনা এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে কি বলেছিলেন তা মা'রুরের কাছে বর্ণনা করলেন। এবার মা'রুর বুঝতে পারলেন কেন আবু যার তাঁর দাসের সাথে পোশাক নিয়ে এমনটা করলেন। কিন্তু এরপর তাঁর

বিস্ময়ভাব গেল না। তিনি এই ঘটনাটি মনে রাখলেন এবং তা বর্ণনা করলেন যাতে আমরা তা থেকে শিক্ষা আহরণ করতে পারি।[108]

১) এ ঘটনা থেকে প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে সাহাবাদের সাথে নবীজির (সা) সদা নৈকট্য। যে লোকটিকে আবু যার (রা) তার মায়ের প্রসঙ্গ তুলে গালি দিয়েছিলেন সে নবীজিকেই (সা) সবচেয়ে কাছে পেল নালিশ দেয়ার জন্য এবং গালিদাতাকে ক্ষমা করে দিতে বলল। নবীজি (সা) লোকটির নালিশকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিলেন এবং আবু যারকে (রা) এর জন্য কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করলেন।

নালিশকারী লোকটির ধার্মিকতা এবং তাঁর অবস্থার পরিবর্তন তাঁর নবীজির (সা) কাছে গিয়ে আবু যারের বিরুদ্ধের নালিশ করার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নি। নবীজি (সা) সবারই নিকটজন ছিলেন।

নববী তারবিয়াত মানুষের মনে আত্মসম্মানবোধ এবং নিজেদের কর্তব্যের পাশাপাশি নিজেদের অধিকারের ব্যাপারেও সচেতনতা তৈরী করেছিল। এজন্যই খাদেমটি আবু যারের (রা) সাথে কথাকাটাকাটির সময়ই ব্যাপারটি বুঝতে পারে। আবু যারের (সা) নিজের ভাষাতেই তা ফুটে ওঠেঃ “আমরা পরস্পর গালি বিনিময় করছিলাম।”

খাদেমটি বুঝতে পারে যে, আবু যার তাঁর সীমা লংঘন করেছে এবং তাকে তার মায়ের প্রসঙ্গ তুলে গালি দিয়েছে। তার মায়ের বর্ণ তো কোন লজ্জা বা কমতির বিষয় ছিল না। সে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে আবু যারের (রা) নামে নালিশ করল, যাতে নবীজি (সা) বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেন এবং আবু যারকে (রা) প্রচন্ড রকম ভর্ৎসনা করেন, যদিও আবু যার (রা) ছিলেন মুসলিমদের মধ্যে অগ্রগামী এবং সম্মানের অধিকারী।

জাহেলিয়াতের সময় এই লোকের এসব অনুভূতি কোথায় ছিল, যখন তার নিজেকে কিছু লোকের সম্পত্তি মনে করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না এবং আবু যার (রা) যা বলেছেন এবং এর চেয়েও কঠোর বাক্য সকাল-সন্ধ্যা হজম তার জন্য নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হত ?

মানুষের পরিবর্তনের সূচনা হয় নিজেকে ভেতর থেকে পুনঃনির্মাণ করার মাধ্যমে যার মাধ্যমে সে নিজের মূল্য, অধিকার ও কদর বুঝতে পারে। এটা হচ্ছে সেই রাসূলের (সা) মাধ্যমে মনুষ্যত্বের উন্নীতকরণ, যাঁকে পুরো জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

২) আমরা এ ঘটনায় রাসূল (সা) কর্তৃক বর্ণবাদ উদ্ভূত অহংকারের মূলোৎপাটন দেখি। জাহেলিয়াতের অংশ হিসেবে বর্ণবাদের অবশিষ্টাংশ অনেক অন্তরে রয়ে গিয়েছিল। এজন্যই নবীজি (সা) আবু যারকে (রা) বলেছিলেনঃ "তুমি কি তার মায়ের প্রসঙ্গ তুলে তাকে গালি দিয়েছ? তুমি এমন একজন যার ভেতর জাহেলিয়াত রয়ে গিয়েছে।"

লোকটির মায়ের কৃষ্ণ বর্ণ কোন লজ্জার ব্যাপার ছিল না। তার মা তার কৃষ্ণ বর্ণ নিজে বাছাই করে নেয় নি। একইভাবে আবু যার (রা) নিজেও তাঁর উজ্জ্বল বর্ণ বাছাই করে নেয়নি। কারো জন্য অন্যের মা-বাবার প্রসঙ্গ তুলে গালি দেয়া ঠিক নয়। মা-বাবা কারো অর্জন নয়। কেউ যদি মা-বাবার প্রসঙ্গ তুলে গালি দেয় তবে সে জাহেলিয়াতের রীতির চর্চা করল। জাহেলিয়াতের যুগের রীতি ছিল নিজের বংশ নিয়ে গর্ব করা এবং অন্যের বংশ নিয়ে সম্মানহানি করা।

প্রকৃত লজ্জা কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার মধ্যে নয়, বরং জাহেলী আচরণ করার মধ্যে নিহিত। এজন্যই রাসূল (সা) যখন বললেন যে, আবু যারের (রা) মধ্যে জাহেলিয়াত রয়ে গিয়েছিল, সেটা আবু যারের (রা) জন্য বড় আঘাত ছিল। তিনি নবীজিকে (সা) বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়ে গিয়েছে?" অর্থাৎ আমি তো ইসলামের মধ্যেই বড় হয়েছি এবং ইসলামের প্রথমদিকের প্রবেশকারীদের একজন আমি। জাহেলিয়াতের প্রথম দিকের ত্যাগকারীদের একজন আমি। তাহলে আমার মধ্যে কিভাবে জাহেলিয়াত থাকে?

৩) যেসময় নবী (সা) জাহেলিয়াতের অহংকার এবং বংশ, বর্ণ এবং শেকড় নিয়ে গর্ব করার রীতি চূর্ণবিচূর্ণ করছিলেন, ঠিক সেই একই সময়েই তিনি মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ছিলেন, যা এই হাদীসে ফুটে উঠেছে। নবীজি বলেনঃ "তোমাদের অধীনস্থরা তোমাদের ভাই।" মূল আরবী বাক্যে বিধেয় আগে বসেছে, এরপর উদ্দেশ্য এসেছে। অথচ হওয়ার কথা ছিল উলটো। নবীজি (সা) এভাবে বলেছেন কারণ কথার বিষয়বস্তুর একাগ্রতা, সংক্ষিপ্ততা ও গুরুত্ব, অর্থাৎ তোমাদের অধীনস্থরা অবশ্যই তোমাদের ভাই।

এরপর নবীজি (সা) বলেছেনঃ "আল্লাহই তাদের তোমাদের অধীনস্থ করেছেন।" অর্থাৎ, মনে রেখো, তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করা – এটা আল্লাহরই সিদ্ধান্ত। ইনি যদি চাইতেন, তাহলে তোমাদের তাদের অধীনস্থ করতে পারতেন।

এরপর নবীজি (সা) বলেনঃ “আল্লাহ যার অধীনে তার কোন ভাইকে রেখেছেন।” এখানে তিনি আবার আল্লাহর সিদ্ধান্তের দিকে এবং কিছু সৃষ্টিকে তোমাদের খেদমতে নিয়োগ করার ব্যাপারে তাঁর অনুগ্রহ এবং নেয়ামতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি অধীনস্থদের ভাই বলে অভিহিত করেছেন। সে যদি খাদেমও হয়, এরপরও তার ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা এতটুকুও কমবে না। খাদ্য ও পোশাকে সমতা, কাজ দেয়ার সময় অনুগ্রহ পাওয়া এবং এরও আগে তার অন্তরের অনুভূতির দিকে খেয়াল রাখা ও তাকে কষ্ট না দেয়া - এসবকিছুর অধিকার তার আছে। রাসূলুল্লাহর (সা) এই সংক্ষিপ্ত কথার দিকে গভীরভাবে মনোযোগ দিলে বুঝা যায় কিভাবে ভ্রাতৃত্বের অর্থ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, এর ধারণাকে শক্ত ভিত দেয়া হয়েছে এবং এর অধিকারকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। খুব সংক্ষেপে গভীর ও সামগ্রিক অর্থবাচকতার সাথে বিষয়টিকে তুলে আনা হয়েছে।

৪) নবীজির (সা) কথা দ্বারা আবু যারের (রা) গভীরভাবে প্রভাবিত হওয়া এবং নবীজির (সা) আদেশ পালনে তাঁর বলিষ্ঠতাও অবাক করার মত। তিনি তাঁর জীবনের শেষভাগে রাবাযায় থাকতেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এরপরও তিনি উঁচুমাত্রার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগতশীল জীবন যাপন করতেন। এটা তাঁর এ কথায় প্রকাশ পায়ঃ “একবার আমার ও আমার এক ভাইয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।” এখানে দেখা যাচ্ছে, কিভাবে তিনি তাঁর কথায় ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারটি তুলে এনেছেন। অথচ তিনি ঝগড়া ও পারস্পরিক গালিগালাজের একটি ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি যেম নবীজির (সা) “তোমাদের অধীনস্থরা তোমাদের ভাই” – এই কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করতে চাচ্ছিলেন। এছাড়াও তিনি নবীজির (সা) দিকনির্দেশনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে দেখান। তিনি একটি পোশাক নিজের ও তাঁর দাসের মধ্যে ভাগাভাগি করে সমতা প্রতিষ্ঠিত করেন অথচ তিনি দাসকে এর চেয়ে কম কিছু দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি।

এরপর রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে ঘটে যাওয়া তাঁর কাহিনী বিস্তারিতভাবে অন্যের কাছে বর্ণনা করা থেকে বোঝা যায়, তাঁর অন্তরে এই কাহিনী কতটা জীবন্ত হয়ে ছিল যেন ব্যাপারটি কেবল আগেরদিন ঘটেছে। অথচ ঘটনাটি ঘটেছিল আরো চার দশক আগে।

রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ এবং এর অনুসরণে এরকমটাই ছিল সাহাবাদের মেজাজ। তাঁদের আচরণের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশসমূহ শক্তিশালী ও গভীরভাবে মূর্ত হয়ে উঠত এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তা তাঁদের অন্তরে জীবন্ত হয়ে থাকত।

৫) নবী (সা) যখন চূড়ান্তভাবে সকল প্রকার বর্ণবাদভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছেন - যদিও তা সর্বনিম্ন পর্যায়েরও হয় যেমন কিনা গায়ের রঙ ভিত্তিক বর্ণবাদিতা – তখন পৃথিবীতে কোন সার্বজনীন মত বা মানবাধিকার সংস্থা ছিল না। তৎকালীন বৈশ্বিক সামাজিক বাস্তবতা চিৎকার দিয়ে বর্ণবাদভিত্তিক বৈষম্যের জানান দিচ্ছিল। এটা ছিল আরো ১৪০০ বছর আগের কথা। বিশ্বসভ্যতা ১৪ শতক পর এসে এই নবুওয়াতী হেদায়েত অনুসরণ করছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসেও যুক্তরাষ্ট্রের আইন-কানুনে বর্ণবাদভিত্তিক বৈষম্য ফুটে উঠত। ১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মন্টিনিগ্রো শহরে বাসে কালোদের জন্য সংরক্ষিত আসনে না বসে সাদাদের জন্য নির্ধারিত আসনে বসার জন্য রোযা পার্কসকে গ্রেফতার করা হয়। আদালত তাঁর বিরুদ্ধে রায় দেয় এবং তাঁকে অপরাধে অভিযুক্ত করে। বর্ণবাদভিত্তিক পৃথকীকরণ আইন বাতিল করার জন্য আন্দোলন ১৯৬৮ পর্যন্ত চলে।

মুহাম্মাদের (সা) এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা এই বৈশ্বিক সমাজ বাস্তবতাকে অনেক আগেই অতিক্রম করে গিয়েছে এবং এই বর্ণবাদী সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে সংশোধন করার জন্য অনেক আগে থেকেই কাজ করেছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যা নিয়ে এসেছিলেন তা তাঁর রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা ওহী, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বাজ্ঞ।

৪৩। আবু বকরের কন্যা

“সে আবু বকরের কন্যা।” – কথাটি রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশার (রা) প্রতি ভালোবাসা ও প্রশংসা স্বরূপ বলেছিলেন তাঁর উজ্জ্বল চেহারায় মুচকি হাসি নিয়ে। তিনি আয়েশার (রা) অল্প বয়স সত্ত্বেও দ্রুত অন্তর্জ্ঞান এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখেছিলেন। আয়েশা (রা) আত্মরক্ষা করছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুপোকাত করলেন এবং বিজয়ী হলেন। অবশেষে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে একদম চুপ করিয়ে দিলেন।

ঘটনা হলঃ রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণ দু দলে বিভক্ত ছিলেন। একটি ছিল আয়েশার দক্ষিণদিকের দল, যেটাতে ছিলেন হাফসা (রা), সাওদা (রা) এবং সাফিয়্যা (রা)। আরেকটি ছিল যায়নাবের (রা) উত্তরদিকের দল, যেটাতে ছিলেন উম্মে সালমা (রা), উম্মে হাবিবা (রা), জুওয়াইরিয়া (রা) এবং মাইমুনা (রা)। রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরসমূহের আশেপাশে সা’দ বিন মু’আয (রা), সা’দ বিন উবাদা (রা) এবং আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) মত যেসব আনসারী সাহাবীগণ থাকতেন তাঁরা রাসূলের (সা) জন্য প্রচুর উপহার পাঠাতেন। এর কারণ ছিল তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিবেশী। তাঁরা আয়েশার (রা) জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) ভালোবাসার ব্যাপারে জানতেন। সেজন্য যেদিন রাসূলুল্লাহর (সা) আয়েশার (সা) সাথে থাকার পালা আসত, তাঁরা সেদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) উপহার দিতেন। এর মাধ্যমে তাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) খুশি করতে চাইতেন। যদি তাঁদের কারো কাছে আগেভাগে উপহার থাকত, তবে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) আয়েশার (রা) সাথে থাকার দিনের জন্য অপেক্ষা করতেন। সেদিন আসলে তাঁরা আয়েশার (রা) সাথে থাকা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে উপহার পাঠিয়ে দিতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের উত্তর দল উম্মে সালমার (সা) কাছে এসে একত্রিত হল। তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) অধিকতর অনুগ্রহপ্রাপ্তা। তাঁরা উম্মে সালমাকে (রা) বললেনঃ “হে উম্মে সালমা, মানুষজন যেদিন রাসূলুল্লাহর (সা) আয়েশার সাথে থাকার পালা আসে, সেদিন তাঁকে উপহার দেন। আমরাও আয়েশার (রা) মত ভালো ভালো জিনিস কামনা করি। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা বলুন, তিনি যেন লোকদের বলে দেনঃ যারা রাসূলুল্লাহকে (সা) উপহার পাঠাতে চান তারা যেন তিনি কোন

স্ত্রীর সাথে আছেন সেদিকে না তাকিয়েই উপহার পাঠান।” এরপর যেদিন রাসূলুল্লাহর (সা) উম্মে সালমার (রা) সাথে থাকার পালা এলো, উম্মে সালমা তাঁকে বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ, আমার সাথীরা আমার কাছে একত্রিত হয়েছিল। তাঁরা বলেছেন, লোকেরা কেবল আপনি যেদিন আয়েশার সাথে থাকেন সেদিনই আপনাকে উপহার দেয়। অথচ আয়েশা যা ভালোবাসে আমরাও তাই ভালোবাসি। মানুষকে বলুন, তারা যেন আপনি কোন স্ত্রীর সাথে আছেন সেটি বিবেচনা না করেই আপনাকে উপহার দেয়।” রাসূলুল্লাহ (সা) একথা শুনে উম্মে সালমা (রা) থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং তাঁর কথার কোন উত্তর দিলেন না। এরপর উম্মে সালমার (সা) সঙ্গিনীগণ যখন আবার তাঁর কাছে এসে একত্রিত হলেন, তাঁরা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) কি বলেছেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। উম্মে সালমা (রা) বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ আমাকে কিছুই বলেন নি!” তাঁরা বললেনঃ “আপনি তাঁর সাথে আবার কথা বলুন।” এরপর যখন আবার রাসূলুল্লাহর (সা) উম্মে সালমার (রা) সাথে থাকার পালা এল, তিনি আবার রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে এ ব্যাপারে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে কিছুই বললেন না। উম্মে সালমার (রা) সঙ্গিনীগণ আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন রাসূলুল্লাহ (সা) কি বলেছেন তা জানতে। উম্মে সালমা উত্তর দিলেনঃ “রাসূলুল্লাহ আমাকে কিছুই বলেন নি!” তাঁরা তখন তাঁকে বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু না বলা পর্যন্ত আপনি তাঁর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে থাকুন।” এরপর যখন আবার রাসূলুল্লাহর (সা) উম্মে সালমার (রা) সাথে থাকার পালা এল, তিনি তৃতীয়বারের মত রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে এ ব্যাপারে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ “হে উম্মে সালমা, আমাকে আয়েশার (রা) ব্যাপারে ত্যক্ত করো না। আল্লাহর শপথ! আয়েশা (রা) ছাড়া তোমাদের মধ্যে কারো সাথে থাকার সময় আমার ওপর ওহী নাযিল হয় না।” উম্মে সালমা (রা) তখন বললেনঃ “আপনাকে উত্যক্ত করা থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।”

উম্মে সালমার (রা) সঙ্গিনীগণ জানতেন যে, তিনি এরপর এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আর কথা বলবেন না। এজন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা ফাতিমাকে (রা) খবর পাঠালেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষ হওয়ার সুবাদে যেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন এবং তাঁকে বলেনঃ “আপনার স্ত্রীগণ আবু কুহাফার পুত্রের (আবু বকর) কন্যার ব্যাপারে সুবিচার করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছেন।” ফাতিমা (রা) এমনটা না করে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে দিলেন। অবশেষে যায়নাব বিনতে জাহশ (রা) তাঁর কাছে এসে এ ব্যাপারে কথা বললেন। ফাতিমা (রা) বললেনঃ “আমি এ ব্যাপারে কথা বলব।”

অতঃপর ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এলেন। তখন তিনি আয়েশার (রা) ঘরে তাঁর সাথে শায়িত অবস্থায় ছিলেন। ফাতিমা (রা) ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেনঃ “আপনার স্ত্রীগণ আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা আবু বকরের (রা) কন্যার ব্যাপারে আপনার কাছে সুবিচার চান।” নবীজি (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ “তোমাকে কি যায়নাব পাঠিয়েছে?” ফাতিমা (রা) উত্তর দিলেনঃ “যায়নাব এবং অন্যরা মিলে পাঠিয়েছেন।” নবীজি (সা) জিজ্ঞাসা করলেনঃ “যায়নাবই কি তাদের পক্ষ হয়ে তোমাকে তা বলেছে?” ফাতিমা (রা) উত্তর দিলেনঃ “হ্যাঁ।” রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন। এরপর তিনি ফাতিমাকে (রা) উদ্দেশ্য করে বললেনঃ “হে আমার কন্যা! আমি যা ভালোবাসি, তুমিও কি তাই ভালোবাসো?” ফাতিমা (রা) উত্তর দিলেনঃ “অবশ্যই, হে রাসূলুল্লাহ।” নবীজি (সা) বললেনঃ “তাহলে একে ভালোবাসো।” এ কথা বলে তিনি আয়েশার (সা) দিকে ইশারা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ কথা শুনে ফাতিমা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে তাঁর ও রাসূলুল্লাহর (সা) কথোকপনের ব্যাপারে অবহিত করলেন। তাঁরা তাঁকে বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহর কন্যা! আপনি তো আমাদের জন্য কিছুই করতে পারলেন না। আপনি আবারো রাসূলুল্লাহর কাছে ফেরত যান এবং তাঁকে বলুনঃ ‘আপনার স্ত্রীগণ আবু বকরের কন্যার ব্যাপারে আপনার কাছে সুবিচার চাচ্ছে।’” ফাতিমা (রা) তাঁদের বললেনঃ “আল্লাহর শপথ! আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর সাথে আর কখনো কথা বলব না।”

এরপর রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণ যায়নাবকে (রা) বললেনঃ “আপনি রাসূলুল্লাহর কাছে যান।” তাঁদের যায়নাবের সাহায্য চাওয়ার মূল কারণ ছিল তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মীয়তা (যায়নাব (রা রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন), রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর নৈকট্য এবং আয়েশার (সা) সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দীতা।

যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আয়েশার (রা) সাথে তাঁর লেপের নিচে শায়িত। এটা ছিল সেই একই অবস্থা, যেই অবস্থায় ফাতিমা (রা) এসেছিলেন। যায়নাব (রা) আল্লাহর রাসূলের (সা) কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং তাঁকে অনুমতি দেয়া হল। যায়নাব (রা) প্রবেশ করলেন। সেসময় তিনি ক্রোধান্বিত ছিলেন। তিনি নবীজিকে (সা) বললেনঃ “আপনার স্ত্রীগণ আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা আপনার কাছে আবু বকরের কন্যার ব্যাপারে সুবিচার চাইছে।” এরপর যায়নাব (রা) আয়েশার (রা) কুৎসা করতে

লাগলেন এবং লম্বা সময় ধরে তাঁকে গালিগালাজ করলেন। আয়েশা (রা) চুপচাপ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে দেখছিলেন। আয়েশার (রা) চেহারা ও দৃষ্টিতে যায়নাবের (রা) কথার প্রভাব স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল। তিনি দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে তিনি কথা বলেন কিনা সেটা দেখার জন্য। তিনি জানতেন, তিনি যদি উত্তর দেন এবং নিজের আত্মরক্ষায় কিছু বলেন তাহলে নবীজি (সা) সেটা অপছন্দ করবেন না। অতঃপর আয়েশা (রা) যায়নাবের (রা) মুখোমুখি হলেন এবং তাঁর কথার উত্তর দিতে লাগলেন। যায়নাব (রা) তাঁর সাথে পেরে উঠলেন না। আয়েশা (রা) কথা দিয়ে তাঁকে একদম চুপ করিয়ে দিলেন, এমনকি যায়নাবের (রা) মুখ শুকিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) এটা দেখে মুচকি হাসলেন এবং উজ্জ্বল মুখ করে বললেনঃ "এটাই আবু বকরের কন্যা", যিনি আবু বকরের (রা) মতই বুদ্ধিমান, বিস্তৃত জ্ঞান, নিজের যুক্তিতে দৃঢ় এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন আবু বকরের কন্যা এবং তাঁর পিতার মত। তিনি জুলুম করতেন না।[109]

*** এঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছেঃ

১) আমরা এ ঘটনায় সুন্দর কিছু প্রকাশ্য অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পাই। আয়েশার (রা) জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) ভালোবাসা কোন গোপনীয় ব্যাপার ছিল না। তা প্রকাশ্য বিষয় ছিল এবং সবাই এ ব্যাপারে অবগত ছিল। এমনকি সাহাবারা পর্যন্ত ব্যাপারটি জানতেন এবং তাঁরা তাদের উপহারও পাঠাতেন সে ঘরে যে ঘরে রাসূলের (সা) এই ভালোবাসার মানুষ থাকতেন। নবীজি (সা) আয়েশার (রা) জন্য তাঁর এই সুন্দর অনুভূতি প্রকাশ করতেন কারণ ফিতরাতের দাবী এবং মানবিক পূর্ণাঙ্গতা ও আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে ভারসাম্যতার বহিঃপ্রকাশ। এজন্যই নবুওয়াতী যুগে ভালোবাসা বাতাসে মুক্তভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলত। এরপর আস্তে আস্তে পশ্চাৎগামিতা এসে ভর করল এবং এই নবীর (সা) শিক্ষাকে মুছে দিল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, নিজ স্ত্রীর নাম নেয়া এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করা লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২) রাসূলুল্লাহকে (সা) ব্যক্তিত্বে গুরুগাম্ভীর্য দেয়া হয়েছিল এবং তিনি উম্মাহর নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ ঘরগুলোতে আবেগ-অনুভূতির আদান-প্রদানের ব্যাপারে অনেক প্রশস্ত ছিলেন। এজন্যই উম্মে সালমা (রা) বারবার রাসূলের (সা) সাথে একই বিষয়ে কথা বলেন। যায়নাব (রা) রাসূলকে (রা) অনুরোধ করেন, এরপর আয়েশার (রা) ওপর ক্রোধান্বিত হন ও তাঁর সাথে ঝগড়া করেন। আবেগের এই

গতিশীল অবস্থা ছিল এমন একটি পরিসরে যেটাকে রাসূলুল্লাহ তাঁদের জন্য প্রশস্ত করে রেখেছিলেন। তিনি যদি চাইতেন তাহলে রাগান্বিত দৃষ্টি কিংবা ভর্ৎসনামূলক কথা বলে তাঁদের এসব থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি দমনমূলক ও গায়ের জোরে কোন আচরণ করেন নি, বরং এ বিষয়ে সহনশীলতা ও সহজভাব দেখিয়েছেন। সেজন্যই কখনো কখনো তাঁর স্ত্রীদের থেকে ক্ষণস্থায়ী আবেগের বিস্ফোরণ ঘটত এবং রাসূলুল্লাহও (সা) তাঁর কোমলতা দ্বারা এগুলো নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলতেন। তিনি তো কোমলতা পছন্দ করতেন এবং তা অবলম্বন করার আদেশ দিতেন। এ ধরনের সহনশীল আচরণের ফলে স্ত্রী তার মানবীয় সামগ্রিকতা বুঝতে পারে এবং মনে গোপন করে রাখা অনুভূতি বিদ্বেষ ও নেতিবাচক অনুভূতিতে রূপান্তরিত হতে পারে ন।

৩) ভুলকে মোকাবেলা এবং একে এর যথাযথ স্থানে রাখার শিক্ষাও এ ঘটনা থেকে উঠে আসে। যায়নাব (রা) কর্তৃক আয়েশাকে (রা) নিন্দা ও গালিগালাজ ছিল একটি ভুল। এটা যে যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে করেছেন, যখন তিনি ছিলেন আয়েশার (রা) ঘরে তাঁর লেপের নিচে – সেটা ছিল আরেকটি ভুল। যায়নাবের (রা) এ কান্ড রাসূলের (সা) মনে ক্রোধের আগুন এবং এ ধরনের আরো অনেক ঘটনায় রাসূল (সা) থেকে যে অনুভূতি ফুটে উঠত তার বিপরীত অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু নবীজি (সা) পুরো ব্যাপারটিকে এর যথাযথ প্রেক্ষাপটে রাখলেন এবং যায়নাবের (রা) এমনটি করার কারণ বুঝতে পারেন আর সেটা হচ্ছে সতীনদের মধ্যে হিংসা। যায়নাবের (রা) এমনটি করার প্রকৃত কারণ ছিল, নবীজির (সা) প্রতি তাঁর স্ত্রীদের ভালোবাসা প্রচন্ডতা। এজন্যই নবীজি (সা) আয়েশাকে (রা) নিজ আত্মরক্ষার জন্য ছেড়ে দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন। তিনি নিজেকে এই ঝগড়ায় জড়িয়ে পরিস্থিতি আরো খারাপ করতে অথবা ভুলের পরিসর বাড়াতে চাননি ও এর আনুষঙ্গিকতা উস্কে দিতে চান নি।

৪) নবীজির (সা) স্ত্রীগণের যে অনুরোধ ফাতিমা (রা) নিজে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন অথবা যায়নাবের (রা) অনুরোধ ("আমরা আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে সুবিচার করার জন্য অনুরোধ করছি") যা তিনি নিজে গিয়ে নবীজিকে (সা) অবহিত করেন একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। এই অনুরোধে মুস্তাফাকে (সা) সুবিচার কায়েম করার জন্য বলা হচ্ছিল, যাঁকে প্রেরণই করা হয়েছিল সুবিচার কায়েম করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা) যদি সুবিচার কায়েম না করেন, তবে কে সুবিচার কায়েম করবে! মানবতা কি তাঁকে ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে সুবিচারের অর্থ শিখতে পারে?

এটার সাথে সেই ঘটনার তুলনা করা যেতে পারে, যখন হুনাইনের যুদ্ধের গনীমতের ভাগবন্টনের পর এক লোক তার ভাগের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বললঃ “এই ভাগবন্টনে সুবিচার করা হয় নি।” এ কথা শুনে নবীজির (সা) চেহারা রাগে লালবর্ণ ধারণ করল, যেন তাতে লালবর্ণ দিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেনঃ “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যদি সুবিচার না করে, তবে কে সুবিচার করবে?” যখন লোকটি তাঁকে বললঃ “হে মুহাম্মাদ! সুবিচার করুন”, তখন তিনি বললেনঃ “তোমার ধ্বংস হোক, আমি যদি সুবিচার না করি, তবে কে সুবিচার করবে যদি আমি সুবিচার না করি? আমি যদি সুবিচার না করি তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংস হয়ে যাব।”[110111]

কিন্তু এ ঘটনায় মুস্তাফা (সা) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সেরকম রাগ দেখান নি। আগের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে সুবিচার না করার অভিযোগকে এর যথার্থ প্রেক্ষাপটে রাখেন এবং এর পেছনের অভিসন্ধি ও কথাগুলো যে বলেছে তাকে অনুধাবন করেন। কিন্তু উম্মুল মু’মিনীনগণের আসলে নবীজির (সা) সুবিচারের ব্যাপারে কোন অভিযোগ ছিল না। বরং তাঁদের নিজেদের মধ্যে রাসূলের (সা) ব্যাপারে হিংসা এবং তাঁর ওপর একচ্ছত্র অধিকার কায়েমের প্রতিযোগিতা থেকে তাঁদের মুখ থেকে এমন কথা বেরিয়ে এসেছিল। সেজন্যই নবী (সা) তাঁদেরকে ক্রোধের সাথে মোকাবেলা করেন নি। তাঁদের কথার কোন উত্তর দেন নি, এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে তর্কেও লিপ্ত হন নি। কারণ তাঁরা নিজেরাই তাঁদের কথার অর্থ বুঝান নি। আর রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁদের অভিসন্ধি ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটও বুঝতে পারেছিলেন।

আমাদের প্রয়োজন নিজেদের এমনভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা যাতে আমরা মানুষের কথাকে এর যথাযথ প্রেক্ষাপটে রাখতে পারি, কথার পিছে যে উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি তা বুঝতে পারি। এটা আমাদের ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আরো বেশি চর্চা হওয়া উচিত। অনেকসময় মুখ ফসকে এমন অনেক কথা বেরিয়ে যায়, যার ফলে অনেক কানাঘুষা ও শলা বৈঠক এবং এর পরে যা ঘটার ঘটে। কিন্তু যদি এসব কথাগুলোকে এর যথাযথ স্থানে রেখে বিচার করা হত তাহলে তার প্রভাব একসময় প্রশমিত হয়ে যেত এবং তা কোন ক্ষতির কারণও হত না।

৫) রাসূলুল্লাহ (সা) যেন তাঁর সাহাবীগণকে তিনি কোন স্ত্রীর ঘরে আছেন সেদিকে না তাকিয়েই তাঁকে উপহার দিতে বলেন - তাঁর স্ত্রীদের এই অনুরোধে তিনি সাড়া দেন নি। মানুষের সামনে এ ধরনের প্রস্তাব রাখা

সম্মানবোধ ও চারিত্রিক পূর্ণাঙ্গতার খেলাফ, যা অনেকটা অন্যের কাছে উপহার চাওয়ারই শামিল। নবীজির (সা) অবস্থান এর অনেক ঊর্ধ্বে ছিল।

আর এখানে আয়েশার (রা) কোন দোষও নেই। এটাতে তো আয়েশাকে (রা) দোষ দেয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ভালোবাসেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ভালোবাসায় তাঁর অগ্রাধিকার তো এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ এই ভালোবাসাকে পবিত্র করেছেন এবং রাসূল (সা) যখন তাঁর সাথে একই লেপের নিচে অবস্থা করছিলেন তখন আল্লাহ তাঁর ওপর ওহী নাযিল করেন। সেজন্যই নবীজি (সা) তাঁকে অন্যদের ভর্ৎসনা থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। এবং নিজ সন্তান ও পৃথিবীর রমণীদের সর্দারণী ফাতিমাকে (আ) বলেনঃ "আয়েশাকে ভালোবাসো।" তাই নবীর (সা) প্রতি ভালোবাসা রাখা প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তাঁদের ভালোবাসা যাদের নবীজি (সা) ভালোবাসতেন এবং ভালোবাসার আদেশ দিয়েছেন।

৬) নবী কারীমের (সা) স্ত্রীগণ তাঁর নির্ধারিত প্রশস্ত পরিসরের মধ্যেই থাকতেন এবং সেটাকে অতিক্রম করে তাঁকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উম্মে সালমাকে (রা) বলেনঃ "আয়েশার ব্যাপারে আমাকে উত্যক্ত করো না", উম্মে সালমা (রা) আর কিছু না বলে শুধু বলেনঃ "আমি আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।"

৭) এটা আমামানবীয় প্রদের জানা উচিত যে, উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে মানবীয় প্রকৃতির দরুণ এসব ঝগড়া হলেও, তাঁরা অন্তরের দিক থেকে ছিলেন চূড়ান্ত রকমের পবিত্র। রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যাপারে চূড়ান্ত হিংসাবশতঃ যে যায়নাবের (রা) সাথে আয়েশার (রা) ঝগড়া হয়, সেই একই যায়নাবকে যখন ইফকের ঘটনার সময় আয়েশার (রা) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি বলেনঃ "আয়েশার ব্যাপারে আমি আমার শ্রবণ ও দৃষ্টিকে রক্ষা করে চলি। আমি তাঁর ব্যাপারে ভালো ছাড়া কিছু জানি না।"[112]

এই আয়েশাই (রা) আবার যায়নাবের (রা) ব্যাপারে বলেনঃ "আমি দ্বীনের ব্যাপারে যায়নাবের চেয়ে উত্তম নারী আর দেখি নি। তিনি ছিলেন আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী, কথার সময় সর্বাধিক সত্যবাদী, আত্মীয়তার সম্পর্ক সর্বাধিক রক্ষাকারী, সর্বাধিক দানশীল, সর্বাধিক আত্মত্যাগকারী। যখনই তাঁর থেকে রাগের বশে কিছু হয়ে যেত, তিনি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন।"[113]

হে আল্লাহ! তোমার রহমত, শান্তি ও বরকত তোমার নবী ও প্রিয়পাত্র সত্যবাদী মুহাম্মাদ (সা), তাঁর পবিত্র উত্তম পরিবার এবং তাঁর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীনদের ওপর নাযিল করো।

৪৪ | বরকতময়

নিজ প্রিয়তম স্বামীর সাথে সফরে যাওয়ার লটারীতে তাঁর নাম উঠেছে। তিনি তখন অল্পবয়স্ক এক আরব বালিকা। তিনি সুন্দরী এবং সুন্দর ও সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করেন। তাঁর বয়স ১৫ বছরের বেশি হবে না। এজন্যই তিনি তাঁর বোন আসমার একটি হার এই সফরে পরিধান করার জন্য ধার নিয়েছিলেন, যদিও এই সফরটি ছিল জিহাদের সফর খোরাক স্বল্পতা এবং সফরের কাঠিন্য সত্ত্বেও। এই অভিযানের নামকরণ করা হয়েছিলঃ যাতুর রিকা'র যুদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অভিযান থেকে ফিরে এলেন। তিনি যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন আকীক উপত্যকার নিকটবর্তী এক মরু এলাকায় থামলেন। এখানে আয়েশা (রা) তাঁর হারটি হারিয়ে ফেলেন, যা তিনি তাঁর বোন থেকে ধার নিয়েছিলেন। হারটি হারানোর দুঃখ তাঁকে ঘিরে ধরল এবং রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তাঁর দুঃখের ব্যাপারে খুলে বললেন। তিনি আয়েশার (রা) দুঃখকে গুরুত্বের সাথে নিলেন এবং আয়েশার (রা) কাছে এই হারের যে গুরুত্ব আছে সেটা বুঝতে পারলেন, যদিও এর মূল্য ১২ দিরহামের বেশি হবে না। তিনি সাহাবীদের একটি দলকে উসাইদ বিন হুদাইরের (রা) নেতৃত্বে হারটি খুঁজতে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথে অন্যান্যরা তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা ও রাতের অন্ধকার নেমে এল। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গীরা সেখানে রাত কাটালেন। তাঁদের সাথে পানি ছিল না। সালাতের সময় আসলে সাহাবারা সালাতের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তারা কিভাবে ওযু করবেন সে ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা আবু বকরের (রা) কাছে তাঁর মেয়ে আয়েশার (রা) নামে নালিশ করে বললেনঃ "আপনি কি আয়েশার কান্ড দেখছেন না ? তিনি তো রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের অপেক্ষা করিয়ে রাখছেন। অথচ তাদের কাছে পানি নেই।"

আবু বকর (রা) তাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখের সামনেই বনু মুস্তালিকের অভিযানের সময় আয়েশার (রা) হার প্রথমবারের মত হারায়। সেই হার খুঁজতে গিয়ে তিনি কিভাবে বাহনে আরোহণ করতে পারলেন না এবং তাঁর নামে অপবাদের ঘটনা ঘটল। সেসময় তাঁর ও তাঁর পরিবারের ওপর যে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ভর

করেছিল তাতে তাঁদের জীবন চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এখন আয়েশার (রা) হার আবার হারালো। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা তা খুঁজে পেতে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের আশেপাশে কোথাও পানি নেই। আবু বকর (রা) রাগান্বিত অবস্থায় আয়েশার (রা) কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ তখন তাঁর উরুতে মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যাতে না জেগে যায় এজন্য তিনি চাপা কণ্ঠে আয়েশাকে (রা) বললেনঃ "প্রত্যেকবার তুমিই সমস্যার সৃষ্টি কর এবং লোকজনকে হারের জন্য আটকে রাখ।" আবু বকর (রা) তাঁকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করতে থাকলেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তাই বললেন। আবু বকর (রা) রাগার সময় তিনি প্রচন্ড ক্রোধান্বিত হয়ে পড়তেন। এরপর তিনি তাঁর ব্যাপারে কুৎসা করতে থাকলেন, যা ছিল তাঁর জন্য মৃত্যুযন্ত্রণার মতই। রাসূল (সা) তাঁর উরুতে মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছিসলেন বলে তাঁর জেগে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি কোথাও সরে যেতে অথবা কাঁদতেও পারছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) ভোর পর্যন্ত ফযরের ওয়াক্ত শুরু না হওয়া পর্যন্ত ঘুমালেন। এরপর তিনি জেগে উঠলেন। সালাতের সময় হয়ে আসল কিন্তু সাহাবারা ওযুর জন্য পানি খোঁজাখুঁজি করে পেলেন না। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন। এ সালাতের ওয়াক্ত খুব দ্রুত চলে যায় এবং সালাতসমূহের মধ্যে এই সালাতের ওয়াক্ত সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর ওহী নাযিল হলঃ "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মুছেহ কর এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ কর।" [সূরা মায়েদাঃ ৬]।

পানি না পাওয়া গেলে মাটি দিয়ে পবিত্র হওয়ার যাবে - আল্লাহর দেয়া এই ছাড় ও সহজীকরণ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলিমদের খুশি দেখার মত ছিল। যাঁর [আয়েশা (রা)] উসীলায় আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর এই সহজীকরণের বিধান নাযিল করলেন, তাঁর ব্যাপারে তাঁদের আনন্দ ও তাঁকে অভিনন্দন জানানোটাও ছিল লক্ষ্যণীয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেনঃ "তোমার হার কতই না বরকতময়!" উসাইদ বিন হুদাইর (রা) এসে তাঁকে বললেনঃ "হে আবু বকরের পরিবারের সদস্যা! আপনি কতই না বরকতময়! আল্লাহ

আপনাকে উত্তমরূপে পুরস্কার দিক। যখনই এমন কোন ব্যাপার ঘটেছে যা আপনি অপছন্দ করেছেন, তখনই আল্লাহ আপনার জন্য তা থেকে বের হওয়ার একটি রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন এবং মুসলিমদের জন্যও সেখানে বরকত রেখেছেন।" যে আবু বকর (রা) আগের দিনও তাঁকে কঠোর ভর্ৎসনা করেছেন, তিনি জ্বলজ্বল চোখে ও খুশির ভঙ্গীতে তাঁর কাছে এসে বললেনঃ "আল্লাহর শপথ! তুমি বরকতময়; আল্লাহর শপথ! তুমি বরকতময়; আল্লাহর শপথ! তুমি বরকতময়।"

মুসলিমরা তাদের হাত মাটিতে ফেলল যাতে তারা তায়াম্মুম করে ফযরের সালাত আদায় করতে পারে। সেদিনই উম্মতে মুহাম্মাদী প্রথমবারের মত আল্লাহর দেয়া ছাড় তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। তাঁরা সালাত শেষ করে মদীনা দিকে রওনা দিল। পুরো রাত আয়েশার (রা) হার খোঁজাখুঁজি করেও না পাওয়ায় তাঁরা হারের আশা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ সেই হারের বদলে কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য একটি ছাড়ের বিধান নাযিল করলেন। তাঁরা যখন আয়েশার (রা) উট উঠালেন, এর নিচে তাঁর হার খুঁজে পেলেন।[114]

*** এই ঘটনায় লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) এ ঘটনার সময় রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স ছিল ষাটের ঘরে আর আয়েশার (রা) বয়স হয়েছিল ১৫ বছর। এরপরেও নবীজি (সা) তাঁর হার হারানোর দুঃখকে গুরুত্বের সাথে নিলেন। তিনি আয়েশার (রা) মানসিক ইচ্ছাকে চূড়ান্তভাবে বুঝতেন। আয়েশা (রা) যে হার হারিয়েছিলেন তা হয়তো অন্যদের কাছে খুব বেশি কিছু ছিল না, এমনকি তাঁর নিজের পিতাই তাঁকে বলেছিলেনঃ "তুমি একটা হারের জন্য মানুষকে আটকে রেখেছ!" কিন্তু আয়েশার (রা) কাছে এই হারের গুরুত্ব ছিল। এটি ছিল তাঁর অলঙ্কার। নারীদের কাছে তাদের অলঙ্কারের গুরুত্ব আছে। এজন্যই আয়েশা (রা) যেটাতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন নবীজিও (সা) সেটাতে গুরুত্ব আরোপ করেন, যা ছিল মূলত পরিবারের সাথে নবীজির (সা) বদান্যতা এবং চারিত্রিক মহিমারই একটি দৃষ্টান্ত। তা নিম্নের ঘটনাগুলোতে ফুটে ওঠেঃ

ক) পানি নেই এমন জায়গায় আয়েশার (রা) হার খোঁজার জন্য তাঁর অপেক্ষা করা,

খ) যেসব জায়গায় হার খোঁয়া যেতে পারে সেসব জায়গায় হার খোঁজার জন্য একটি দলকে পাঠানো,

গ) এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে রাসূলুল্লাহর সন্তুষ্ট মন। রাসূলুল্লাহ উপরোক্ত দুটো কাজ কোন প্রকার গড়িমসি অথবা বিতৃষ্ণা ছাড়াই করেন। তিনি প্রশান্তি ও স্থির অবস্থায় ছিলেন যা আয়েশার (রা) উরুতে তাঁর মাথা রেখে ঘুমানো থেকে প্রমাণিত হয়। এ থেকে তাঁর মানসিক প্রশান্তি, আয়েশার (স) হৃদয়ের নৈকট্য এবং ভালোবাসা ও সহৃদয়তা প্রমাণিত হয়।

ঘ) সফরে, বিশেষ করে এর শেষভাগে, শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি চলে আসে। তখন মানুষের মানসিক শক্তি কমে যায় এবং আবদার রক্ষা, ধৈর্য্য ও সহ্য করার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই যদি সাধারণ সফরের অবস্থা হয়, তাহলে যুদ্ধ অভিযানের সফরের কি অবস্থা হবে! কিন্তু এ অবস্থায়ও নবীজিকে (সা) সর্বাবস্থার মত সহৃদয়বান এবং মানুষ ও নিজ পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম আচরণকারী হিসেবে দেখা যায়। সফরের কাঠিন্য তাঁর মানসিক স্থিরতা ও চারিত্রিক মহিমা কেঁড়ে নিতে পারে নি।

২) মরুভূমিতে সফরের নিয়ম এটাই যে, যদি কারো কাছে পানি না থাকে তবে সে এমন জায়গায় থামতে পারবে না যেখানে পানি নেই। নবীজি (সা) তাঁর বাহিনীকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করান নি কিংবা আয়েশার (রা) হারের জন্য তাদের দুর্ভোগ ডেকে আনেন নি। বরং তিনি তাঁর প্রিয়তমা আয়েশার (রা) মন রক্ষার জন্য সেখানে থামেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে থামে। সেখান থেকে মদীনা দূরে ছিল না। সেই মরুভূমি ও মদীনার মধ্যে প্রায় ১০ মাইলের দূরত্ব ছিল। এখন তো এই অঞ্চল মদীনা শহরেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। এইজন্য এই জায়গায় নবীজির (সা) থামা কারো জন্য কাঠিন্য ও দুর্ভোগের কারণ ছিল না। সাহাবাগণ কেবল সালাতের জন্য কিভাবে পবিত্র হবেন সেটা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে আলাহ তাঁদের ও তাঁদের পরবর্তী উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য একটি ছাড়ের বিধান নাযিল করেন।

৩) রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আয়েশার (রা) অবস্থাও লক্ষ্যণীয়। তিনি তাঁর বোন থেকে ধারকৃত হার ছাড়া এমন কিছু পাচ্ছিলেন না যা দিয়ে সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য সাজবেন, যে সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সব স্ত্রীদের মধ্যে থেকে তাঁকে বেছে নেয়া হয়েছিল। এই হারের মূল্য ১২ দিরহামের বেশি ছিল না, যা ৩৮ গ্রাম রৌপ্যের সমান। এরপরও যখন আয়েশা (রা) যখন হারটি হারিয়ে ফেলেন, তা তাঁকে চিন্তিত করে তুলে। এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবীজি (সা) মানুষের সম্পদ দিয়ে বড়লোক হতে বা তাদেরকে তাদের পার্থিব জীবনে বঞ্চিত করতে অথবা তাদের থেকে দুনিয়ার সম্পদ ঘনঘন চাওয়ার জন্য আসেন নি।

বরঞ্চ, তিনি এবং তাঁর পরিবার স্বল্পতা ও সংযমের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছেন। অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর সর্বাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর হারটি ছিল ধারকৃত, যেটার মূল্য আমাদের যুগে ৭০ রিয়ালের বেশি হবে না। অথচ তিনিই কাপড় ভরা সম্পদ বিলি করতেন এবং তাঁর হাত বৃষ্টির মেঘের মত সম্পদ স্পর্শ করত।

৪) এ ঘটনায় আমাদের মা আয়েশার (রা) বরকত ফুটে উঠে। যখন তিনি কোন অপছন্দনীয় পরিস্থিতিতে পড়েছেন আল্লাহ তাঁর উত্তোলনের জন্য একটি রাস্তা বের করে দিয়েছেন এবং এতে মুসলিমদের জন্য বরকত রেখেছেন।

আয়েশা (রা) ইফকের ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন এবং অত্যন্ত কম বয়স সত্ত্বেও এর জন্য অনেক দুশ্চিন্তা সহ্য করেন এবং কষ্টে তাঁর হৃদয় চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে আল্লাহ তাঁর নিস্কলুষতা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে ওহী নাযিল করেন যা কেয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে। এর পরিণতি তাঁর ও মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়ঃ “মনে করো না, এটা তোমাদের জন্য খারাপ। বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর” [সূরা নূরঃ ১১]। আয়েশা (রা) হার হারিয়ে ফেলে বেদনাক্রান্ত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলিমগণ এই হার খোঁজার জন্য থামলেন। আয়েশার (রা) পিতা আবু বকর দুশ্চিন্তা করতে লাগলেন। সালাতের ওয়াক্ত এসে হাজির হল কিন্তু আশেপাশে কোন পানি ছিল না। আল্লাহ মুসলিমদের এ অবস্থা থেকে উত্তোলনের জন্য প্রশস্ততা হিসেবে একটি বিধান নাযিল করলেন যা কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

আয়েশা (রা) একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হজ্জ করতে গেলেন। যখন তাঁরা মক্কার নিকটবর্তী হলেন, তাঁর হায়েয হল। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কেঁদে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেনঃ “আল্লাহর শপথ! আপনার সাথে এ বছর এই সফরে বের না হলেই আমার জন্য ভালো হত!” রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেনঃ “আল্লাহ হায়েযের ব্যাপারটি আদমের কন্যা সন্তানদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। তাই বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হাজীরা যা করে, তুমিও তাই করো।” আয়েশার (রা) সেদিন থেকে এখন পর্যন্ত মুসলিমগণ এই বিধানের প্রশস্ততা উপভোগ করে আসছে, যেটার কারণ আয়েশা (রা) ওপর যে দুর্ভোগ এসেছিল সেটা।[115]

আয়েশার (রা) বরকতের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে যখন বিয়ে করেন তখন আয়েশার (রা) ছিলেন অল্পবয়স্ক বালিকা। তিনি আমোদপ্রমোদ পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অন্তর ও জীবনকে

আয়েশার (রা) জন্য যেভাবে প্রশস্ত করেন তা আয়েশার (রা) জীবনকে সত্যের সাক্ষ্য এবং এই ব্যাপারের সত্যায়নকারী করেছে যে, রাসূলুল্লাহকে (সা) সরলপথ ও সহনশীলতা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ,যাতে অন্য ধর্মের লোকেরা জানতে পারে, আমাদের দ্বীনে প্রশস্ততা রয়েছে।

৪৫। তরুণ ও তরুণী

তরুণটি ছিলেন তাঁর তারুণ্যের প্রারম্ভে। বয়স মাত্র ১৯ এর কোঠায়। তিনি ছিলেন খুবই সুন্দর, উজ্জ্বল ও ফর্সা চেহারা, সুন্দর চুল এবং চমৎকার অবয়বের অধিকারী। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) উট ক্বাসওয়ার পিছনের দিকে তাঁর পিছনেই বসা ছিলেন। তাঁরা মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জামরাতুল আকাবায় পাথর ছুঁড়ে মারার পর জামরাতুস সুগরার নিকটস্থ পশু জবাই করার স্থানে আসলেন এবং বললেনঃ “এটা পশু জবেহ করার স্থান। মিনার পুরোটাই পশু জবেহ করার স্থান। তোমরা এখানে থাকা অবস্থাতেই তোমার পশু জবেহ করো।” এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষকে দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য থামলেন। মানুষজন তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

আর তরুণীটি ছিলেন জাছ'আম গোত্রের, উজ্জ্বল ফর্সা বর্ণের। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর সেই অবস্থানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আমার বৃদ্ধ পিতা হজ্জে দেয়া আল্লাহর বিধান পালনে সমর্থ নয়। তিনি হজ্জের যাত্রার জন্য সক্ষম নন। আমি তাঁর পক্ষ হয়ে হজ্জ করতে পারি?” রাসূলুল্লাহ উত্তর দিলেনঃ “হ্যাঁ।”

সেই তরুণটি অর্থাৎ ফাদল বিন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পিছে বসে তরুণীটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তরুণীটির সৌন্দর্য তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। তরুণীটিও তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। ফাদলের সৌন্দর্যও তরুণীটিকে চমৎকৃত করল। রাসূলুল্লাহ (সা) পিছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন, ফাদল তরুণীটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি তাঁর পবিত্র হাত ফাদলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং তাঁর থুতনি ধরে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। যখন তরুণীটি ঐ দিক দিয়ে আসল, তখন তিনি ফাদলের (রা) মাথা ধরে আবার অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রা) বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ! আপনি তো আপনার চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় বাঁকা করে দিলেন।” রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দিলেনঃ “আমি একটি তরুণ ও তরুণীকে দেখলাম এবং ভয় করলাম, শয়তান তাদের দুজনের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে কিনা।” এরপর তিনি ফাদলকে (রা) বললেনঃ “হে ভ্রাতুষ্পুত্র! এইদিনে যে তার কান, দৃষ্টি ও জিহবাকে হেফাজত করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত।”[116]

এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) এ ঘটনায় দেখা যায়, নবীজি (সা) সহৃদয়তার সাথে ভুলের সংশোধন করে দিচ্ছেন। তিনি যখন ফাদলের (রা) দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তিনি তরুণীটির দিকে তাকিয়ে আছেন, নবীজি (সা) নিজ সম্মানিত হাতে তাঁর চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এই যে মুস্তাফার (সা) হাত দ্বারা তাঁর চাচাতো ভাই ফাদলের মুখ ধরে অন্যদিএক ঘুরিয়ে দেয়া এটা যেমন ফাদলের ভুলের সংশোধন ছিল, তেমনি এতে পিতৃসুলভ চমৎকার ভাবানুভূতিও নিহিত ছিল। এটি তরুণ ফাদলের (রা) মনে রাসূলুল্লাহর (সা) নৈকট্য ও তাঁর নিকট নিজের মর্যাদার অনুভূতিই সৃষ্টি করেছে। নবীজির (সা) পক্ষে সম্ভব ছিল আদেশ, বকা কিংবা রাগান্বিত দৃষ্টির মাধ্যমে ফাদলকে (রা) তাঁর চেহারা অন্যদিকে ঘুরাতে বলা। কিন্তু নবীজি (সা) উপরোল্লিখিত কোমল ও সদয় ভঙ্গী বেছে নিলেন। আল্লাহ কোমলতার মাধ্যমে যা দেন, তা ভর্ৎসনার মাধ্যমে দেন না।

২) নবীজি (সা) একজনের ভুল সংশোধন করলেন, কিন্তু এর মধ্যে নিজের জন্য কোন ভাগ রাখলেন না। অর্থাৎ, তিনি ফাদলের (রা) মুখ সরিয়ে দেয়ার কারণ হিসেবে তাঁর এবং তরুণীটির ওপর শয়তানের ফিতনার আশঙ্কাকে উল্লেখ করেছেন, এটা বলেন নি যেঃ 'সে আমার সামনে ও আমার সাথে থেকে কিভাবে এ কাজ করল।' কিংবা 'মেয়েটি সব মানুষের মধ্যে ফাদলকে বেছে নিয়েছে কারণ সে বাহনে আমার পিছে অধিষ্ঠিত ছিল' অথবা এরকম অন্যকিছু, যা অনেকেই বলে থাকে যখন তাদের চোখের সামনে কোন ভুল সংঘটিত হয় অথবা এই ভুলের মধ্যে যখন তারা নিজেদের জন্য চ্যালেঞ্জ ও নিজেদের মর্যাদাহানি দেখতে পায়। তখন তাদের খারাপকে প্রত্যাখ্যানের সাথে নিজেদের মর্যাদা ও সত্ত্বাকে ফুলিয়ে তোলার আচরণও মিশ্রিত হয়। এর ফলে খারাপকে প্রত্যাখ্যানের কর্মটি আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায় এবং এতে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুপ্রবেশ ঘটে।

৩) এ ঘটনায় নবীজির (সা) সহৃদয়তার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা পরিষ্কার হবে না, যদি সেটিকে পুরো প্রেক্ষাপটের সাপেক্ষে বিবেচনায় না আনা হয়। সেদিন যুলহিজ্জার ১০ তারিখ, বড় হজ্জের দিন। তিনি অনেক দূর সফরের পর একটা পর একটা ও লম্বা সময় ধরে পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেনঃ আরাফার দিন আরাফার ময়দানে দাঁড়ানো, মুযদালিফা থেকে মিনায় প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে হেঁটে চলতে হয় এবং তাঁর চারপাশে দু লক্ষেরও বেশি মানুষের দায়িত্ব নেয়া। তিনি প্রশিক্ষণ ও দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এর সাথে এসে জড়ো হয়েছিল বিদায় নেয়ার দুঃখ। এসব কিছুই মানসিক শক্তি শুষে নেয়ার মত। এই অবস্থায় যেকোন মানুষ চাপা

উত্তেজনা ও অল্পতেই বিরক্ত হওয়ার অবস্থায় থাকে। কিন্তু এতকিছুর পরও নবী (সা) মানুষকে শেখানো ও প্রশিক্ষণে তাঁর মহান চরিত্র ও সন্তুষ্ট হৃদয় বজায় রাখেন।

৪) আব্বাস (রা) যখন নবীজিকে (সা) বলেনঃ “আপনি তো আপনার চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় বাঁকিয়ে দিয়েছেন”, তিনি আব্বাসকে উত্তরে এর যে কারণ ব্যাখ্যা করেন তা বিস্ময়কর। নবীজি (সা) সাথে সাথে এর উত্তর দেন। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায়, তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ছিল চূড়ান্ত সতর্কতার সাথে বাছাই করা। নবীজি (সা) বলেনঃ “আমি একটি তরুণ ও তরুণীকে দেখেছি”। অন্য রেওয়াতে আছে, তিনি বলেনঃ “আমি একটি অল্পবয়স্ক তরুণ ও অল্পবয়স্ক তরুণীকে দেখেছি।” নবীজি (সা) এই বর্ণনার মাধ্যমে তারুণ্যের চাহিদা অনুধাবনে তাঁর সক্ষমতা ফুটে উঠেছে। এতে তাদের দুজনের বয়স ও অভিজ্ঞতা কম হওয়ায় তাদের প্রতি একটি ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিও ফুটে উঠেছে। এরপর তিনি তাঁর তাদের ব্যাপারে নিজের ভীতি ও আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন। তিনি এটা বলেন নিঃ “আমি ফাদলের ব্যাপারে তরুণীটিকে ভয় করছি” অথবা “তরুণীটির ব্যাপারে ফাদলকে ভয় করছি।” বরং তিনি দুজনের ব্যাপারে বহিরাগত এক শত্রুর ক্ষতির আশঙ্গা করেছেন এই বলেঃ “আমি তাদের ব্যাপারে শয়তানকে ভয় করছি।” এটি আমাদের ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের মধ্যে যা হয়েছিল সেটাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ “শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেয়ার পর...” [সূরা ইউসুফঃ ১০০]। তিনি এটা বলেন নিঃ “আমার ভাইরা আমার সাথে এটা এটা করার পর।”

৫) আমরা দেখেছি, কিভাবে নবীজি (সা) সরাসরি সহৃদয়তা ও চমৎকারিত্বের সাথে তাঁর চাচাতো ভাই ফাদলের (রা) কাজকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু হাদীসের এমন কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না যেখানে এসেছে, আল্লাহর রাসূল (সা) সেই তরুণীকে তিরস্কার করেছেন এবং তার প্রশ্নের জবাব দেয়া ছাড়া অন্য কোন কথা তাকে বলেছেন, যদিও ফাদল (রা) যেভাবে তরুণীটির দিকে তাকাচ্ছিলেন, তরুণীটিও ফাদলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এই প্রশ্ন কি আসতে পারে না যে, নবীজি (সা) কেন তরুণীটিকে তিরস্কার করেন নি ?

এর উত্তর হবেঃ নবীজি (সা) নিজ হাতে তাঁর চাচাতো ভাই ফাদলকে সংশোধন করেছেন কারণ ফাদলের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) নৈকট্য ও আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় তিনি আনন্দ ও সন্তুষ্টির সাথে নবীজির (সা) নিজ হাতে

করা সংশোধনকে মেনে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নৈকট্য ও আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা যেকোন তরুণই ব্যাপারটিতে কোনপ্রকার সমস্যা দেখবে না।

অন্যদিকে জাছ'আমা গোত্রের সেই তরুণীটির মন নবীজির (সা) প্রতি সম্ভ্রমবোধে ভরপুর। সম্ভবতঃ এই প্রথমবারের মত তিনি নবীজির (সা) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কথা বলেন। নবীজি (সা) যদি সরাসরি তাঁকে সংশোধন করতে যেতেন, তাহলে তরুণীটি তাতে লজ্জিত হতেন এবং নারীসুলভ কমনীয়তা ও লজ্জাশীলতার কারণে কেঁদে দিতেন। এজন্য নবীজি (সা) তরুণীটিকে পরোক্ষভাবে তরুণীটিকে সংশোধন করে এবং তাঁর চাচাতো ভাইয়ের সাথে সাথে সেই তরুণীটির জন্যও শয়তানের ফিতনার আশঙ্কা করে ক্ষান্ত থাকেন। তিনি বলেনঃ "আমি একটি অল্পবয়স্ক তরুণ ও অল্পবয়স্কা তরুণী দেখলাম এবং তাদের ব্যাপারে শয়তানের ফিতনার আশঙ্কা করলাম।"

নবীজির (সা) কাছে তরুণীটির প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট হয় যে, তাঁর মধ্যে যে বুঝশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে এর ফলে তার রাসূলের (সা) এই ইঙ্গিত পরিপূর্ণভাবে বোঝা ও তা অনুসরণ করার কথা। রাসূলুল্লাহর শিক্ষা ও সংশোধন কতই না সুন্দর ও সূক্ষ্ম ছিল।

৬) এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবীজি (সা) মানুষের কতটা নিকটবর্তী ছিলেন। তাঁর এবং মানুষের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা ও দেয়াল ছিল না। একজন অল্পবয়স্ক তরুণীও তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে ও এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারত। তাঁর অন্তরের প্রশস্ততার জন্যই একজন তরুণীর মনে স্বভাবসুলভ লজ্জাশীলতা সত্ত্বেও এরকম সাহস ও আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়েছিল।

৭) ফাদল বিন আব্বাসের (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পিছে বসা থেকে প্রতীয়মান হয়, নবীজির (সা) তরুণদের সাথে নৈকট্য বিদ্যমান ছিল। তিনি তাদের সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতেন। এর ফলে বয়সের পার্থক্যগুলো কমে আসত এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে বন্ধন শক্তিশালী হত।

একইভাবে ফাদলকে (রা) পিছে বসানো থেকে নবীজির (সা) তাঁর চাচা আব্বাসের (রা) প্রতি সদাচরণ ও সম্মান ফুটে উঠে। "হে রাসূলুল্লাহ! আপনি তো আপনার চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় বাঁকিয়ে দিয়েছে" – আব্বাসের এ কথা থেকে বুঝা যায়, তিনি রাসূল (সা) কর্তৃক প্রদত্ত এই সম্মানের পুলকের মধ্যেই থাকতেন। আব্বাস (রা)

বলেন নি যে, “আপনি আমার ছেলের ঘাড় বাঁকিয়ে দিয়েছেন।” তিনি বলেছেন, “আপনার চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় বাঁকিয়ে দিয়েছেন।” এর মাধ্যমে যেন বৃদ্ধ আব্বাস (রা) বলতে চাচ্ছিলেন, “রাসূলুল্লাহ হচ্ছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আর তাঁর পিছে বসা ব্যক্তিটি আমার পুত্র। এটাই তাঁর নিকট আমাদের মর্যাদা এবং আমাদের প্রতি তাঁর সদাচরণ।”

এটা ছিল নবীজি (সা) কর্তৃক তাঁর চাচা আব্বাসকে সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর সাথে সদাচরণের একটি রূপ। নবীজি (সা) বলতেনঃ “চাচা তো পিতার মতই।”[117]

৪৬। স্বাগতম, হে আমার কন্যা

তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে আচরণের দিক দিয়ে নবীজির (সা) সবচেয়ে কাছাকাছি। তাঁর দাঁড়ানো দেখলে রাসূলের (সা) দাঁড়ানোর কথা মনে পড়ে যেত, তাঁর বসা দেখলে রাসূলের (সা) বসার কথা মনে পড়ে যেত, তাঁর হাঁটার গতি দেখে রাসূলের (সা) হাঁটার কথা মনে পড়ে যেত, তাঁর কথা শুনলে রাসূলের (সা) কথা বলার কথা মনে পড়ে যেত। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) আচরণ ছিল অত্যন্ত পিতৃসুলভ, ভালোবাসাময় ও প্রশস্ত।

যখনই নবীজির (সা) এই কলিজার টুকরো তাঁকে দেখতে আসতেন, নবীজি (সা) তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে যেতেন ও স্বাগত জানিয়ে বলতেনঃ “স্বাগতম, হে আমার কন্যা।” এরপর তাঁর হাত ধরতেন এবং তাঁকে চুমু খেতেন। এরপর তিনি যে জায়গায় বসতেন সে জায়গায় তাঁকে বসাতেন, যা ছিল তাঁর প্রতি চূড়ান্ত আতিথেয়তা, ভালোবাসা ও সম্মানের লক্ষণ। আবার রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ফাতিমাকে (রা) দেখতে যেতেন, ফাতিমা (রা) তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে যেতেন ও স্বাগত জানাতেন। এরপর তাঁর হাত ধরতেন এবং তাঁকে চুমু খেতেন। এরপর তিনি যে জায়গায় বসতেন সে জায়গায় আদব ও সম্মানের সাথে তাঁকে বসাতেন, যা ছিল সন্তান কর্তৃক পিতাকে সম্মান জানানোর সবচেয়ে সুন্দর রূপ।

রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ হতে তাঁর কন্যার প্রতি এই পিতৃসুলভ ভালোবাসার প্রবহণকে ফাতিমাও (আ) তাঁর পূণ্যময় ভালোবাসা দ্বারা গ্রহণ করে নিতেন। তিনি তাঁর পিতার এই ভালোবাসা উপভোগ করতেন এবং তাঁর সাথে ভালোবাসা, সম্মান ও সদাচরণ বিনিময় করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অসুস্থ হলেন - যে অসুস্থতায় তিনি ওফাত লাভ করলেন – ফাতিমাকে (আ) ডেকে পাঠালেন। ফাতিমা (আ) এলেন ও হেঁটে এগিয়ে গেলেন। তাঁর আর রাসূলুল্লাহর (সা) হাঁটার মধ্যে কতই না মিল! নবীজি (সা) তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আগের মত দাঁড়াতে পারলেন না, তাঁকে আগের মত গ্রহণ করে নিতে পারলেন না। তাঁর সম্মানিত দেহে আর সুস্থতা রইল না। অসুস্থতা ও জ্বর তাঁকে কাহিল করে দিয়েছিল। ফাতিমা (আ) ঝুঁকে নবীজিকে (সা) চুমু খেলেন। বরঞ্চ রাসূলুল্লাহই (সা) তাঁকে প্রথম চুমু খেলেন,

এরপর তাঁকে তাঁর ডান পাশে বসালেন। যখনই তিনি তাঁর স্থান থেকে উঠে দাঁড়াতে পারতেন, তিনি কেবল ফাতিমার (আ) জন্যই দাঁড়াতেন।

ফাতিমা (আ) রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসলেন। তাঁদের দুজনকে ঘিরে আছেন নবীজির (সা) স্ত্রীগণ। একজন স্ত্রীও সেখানে অনুপস্থিত নেই। নবীজি (সা) আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন ফাতিমাকে (আ) বললেন। এরপর তিনি তাঁর কানে কানে কিছু একটা বললেন। তাঁর স্ত্রীগণ পিতা ও কন্যার মধ্যকার এই গোপন কথার দৃশ্য দেখতে থাকলেন। তাঁরা ফাতিমার (আ) সম্মানিত উজ্জ্বল মুখে সেই কথার প্রভাব লক্ষ্য করতে থাকলেন।

নবীজি (সা) যখন ফাতিমার (আ) কানে কানে কথা শেষ করলেন, তখন ফাতিমার (আ) কান্না দেখে তাঁর ওপর নবীজির (সা) কথার চূড়ান্ত প্রভাব বুঝতে পারলেন নবীজির (সা) স্ত্রীগণ। ফাতিমা (আ) কান্না আটকে রাখতে পারেন নি; প্রচন্ড কাঁদছিলেন তিনি। নবীজির (সা) স্ত্রীগণ অবাক হলেন এটা ভেবে যে, তাঁর বাবা তাঁর কানে একটি গোপন কথা বললেন আর সেটা শুনে তিনি কাঁদছেন। আয়েশা (রা) তাঁকে বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ আমাদের মধ্যে থেকে আপনাকেই বিশেষভাবে গোপন কথা বললেন আর আপনি তা শুনে কাঁদছেন?" নবীজির স্ত্রীগণ যদি জানতেন, নবীজি (সা) ফাতিমাকে (আ) কি গোপন কথা বলেছেন, তাহলে তাঁরা ফাতিমাকে (আ) অব্যাহতি দিয়ে নিজেরাই কান্না শুরু করতেন।

এরপর নবীজি (সা) ফাতিমার (আ) কান্না ও তাঁর আগের কথায় প্রভাবিত হওয়া দেখে তাঁর কানে কানে আরেকটি গোপন কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমার (আ) কানে কানে কথা বলা অবস্থাতেই তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বেদনা ও কান্নার পর তিনি হেসে উঠলেন।

নবীজির (সা) স্ত্রীগণ ফাতিমার (আ) অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ দ্রুত কান্না থেকে হাসিতে এবং বেদনা থেকে খুশিতে পরিবর্তিত হওয়া দেখে আবারো অবাক হলেন। আয়েশা (রা) বললেনঃ "আমি কখনো আনন্দকে দুঃখের এত নিকটবর্তী দেখিনি। আমি ভাবতাম, ফাতিমা হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী নারী। কিন্তু তিনিও নারীদেরই অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ অন্যান্য নারীদের মতই তাঁর অনুভূতিরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে)।" আয়েশা (রা) যদি এই পরিবর্তনের কারণ জানতে পারতেন, তাহলে ফাতিমাকে (আ) এর জন্য দোষারোপ করতে পারতেন না এবং তিনি বুঝতে পারতেন যে, এই পরিবর্তন বরঞ্চ ফাতিমার (আ) বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ণাঙ্গতা এবং নিজ পিতার প্রতি তাঁর তীব্র ভালোবাসার আরেকটি প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন দাঁড়ালেন, আয়েশা (রা) দ্রুত ফাতিমার (আ) কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁকে বলা রাসূলুল্লাহর (সা) সেসব গোপন কথার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন যেগুলো তাঁকে একবার কাঁদিয়েছে, আরেকবার হাসিয়েছে। ফাতিমা (আ) উত্তর দিলেনঃ "তাহলে তো আমি গোপনীয়তা নষ্টকারী হয়ে যাব। আমি রাসূলুল্লাহর গোপন কথা ফাঁস করব না।" এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থার একটু উন্নতি হয়, কিন্তু এর পরই তিনি ওফাত লাভ করেন এবং রফিকে আ'লার কাছে চলে যান। তাঁর মৃত্যুর পর আয়েশা (রা) ফাতিমাকে (আ) বলেনঃ "আপনার ওপর আমার যে অধিকার আছে সেটার ওয়াস্তে আমাকে বলুন, রাসূলুল্লাহ আপনাকে কি বলেছিলেন।" ফাতিমা (রা) তখন তাঁর এই অনুনয়ে সাড়া দেন কারণ গোপন ব্যাপারটি তখন প্রকাশ্য হয়ে গিয়েছিল, বর্ণনা তখন চাক্ষুষ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এর পর তা আর গোপন থাকে নি। ফাতিমা (আ) আয়েশার (রা) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ। এখন আমি আপনাকে বলব। প্রথমবার তিনি আমার কানে কানে বললেনঃ 'জিবরাইল প্রতি বছর একবার আমার সামনে পুরো কোরআন উপস্থাপন করে। কিন্তু এবছর তিনি আমার সামনে দুবার কোরআন উপস্থাপন করেন। এর একটাই কারণ আমি দেখি আর তা হচ্ছে আমার মৃত্যু নিকটবর্তী এবং এই অসুস্থতাতেই আমার জান কবজ করা হবে। আল্লাহকে ভয় করো এবং এই ব্যাপারে ধৈর্য্যধারণ করো। আমি তোমার আগেই মৃত্যুবরণ করব।' এটা শুনে আমি কেঁদেছি যা আপনি দেখেছেন। এরপর তিনি আমার কানে কানে বললেন যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে একত্রিত হব। তিনি এও বলেনঃ 'তুমি কি এতে খুশি নও যে, জান্নাতে রমণীদের সর্দারণী হবে?' এটা শুনে আমি হেসেছি।" আয়েশার (রা) কাছে এরপর ফাতিমার (রা) কান্না ও হাসি, প্রথমে এই গোপন কথা সংরক্ষণ করা এবং পরে এই ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করার কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এসব থেকে ফাতিমার (রা) গভীর বুঝ, বুদ্ধির পরিপক্কতা এবং তাঁর সম্মান ও গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক জগতের নারীদের সর্দারণী এবং মুস্তাফার (সা) কলিজার টুকরার ওপর।[118]

এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) আমরা এখানে রাসূলুল্লাহ (সা) ও ফাতিমার (আ) মধ্যে অনুভূতির প্রবহণ, পিতৃ ভালোবাসার ঘোষণা করা ও সাক্ষাৎ বিনিময়ের মাধ্যমে এর সুন্দর বহিঃপ্রকাশ, ভালোবাসাপূর্ণ চুমু, ভাববোধক সুন্দর কথা এবং "স্বাগতম, হে আমার কন্যা" এটা বলার মাধ্যমে নবীজির (সা) আনন্দলাভ লক্ষ্য করি। পিতৃভালোবাসার এ ধরনের তীব্র, সুস্পষ্ট, বিভিন্নরকম বহিঃপ্রকাশ পিতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ককে চূড়ান্ত রকমের শক্তিশালী,

সুস্থ ও সুন্দর করে তোলে এবং তা থেকে উন্নত মানসিক অবস্থা, অনুভূতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও এর সুস্থ লালনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাবাদের মনে তো প্রকৃতিগতভাবেই পিতৃত্বের অনুভূতি থাকে, কিন্তু অনেক সময় সে অনুভূতির বহিঃপ্রকাশে এবং সন্তানদের সেটার আনন্দ ও উষ্ণতা উপভোগ করানোর ক্ষেত্রে কমতি বা ব্যর্থতা থেকে যায়।

কিছু কিছু বাবা এক্ষেত্রে অবস্থার ওপর ভরসা এবং সেদিকে দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেনঃ "তারা কি আমার কাজ ও পরিশ্রম দেখে না? এসবই কি তাদের জন্য নয়!"

কিন্তু নববী শিক্ষা থেকে আমরা পাই, পিতৃত্বের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ এবং সন্তানদের মানসিক চাহিদার ডাকে সাড়া দেয়াটা অন্যান্য পিতৃ কর্তব্য ও দায়িত্বের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যখন এটা করা হয়, তখন তা সন্তানদের পিতাদের প্রতি সদাচরণ এবং সন্তানদের ওপর তাদের বিশাল অধিকার অনুভব করানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সাহায্য হতে পারে।

২) এখানে নবীজি (সা) থেকে ভালোবাসা ও পিতৃ অনুভূতির তীব্রতা ছাড়াও আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় আর তা হচ্ছে তাঁর কন্যা ফাতিমার (রা) প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়, যখন তিনি ফাতেমার (আ) জন্য দাঁড়াতেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন, তাঁর হাত ধরতেন এবং তাঁকে নিজের বসার স্থানে বসাতেন। আর এটা তিনি তাঁর সব স্ত্রীর সামনে করতেন।

তিনি তাঁর কন্যাকে এই রকমের শ্রদ্ধা করতেন, অথচ তখন তিনি এমন পরিবেশে জীবন যাপন করেছেন যেখানে নারীকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হয়, যেখানে নারীর ভাগ্য আক্ষরিক অর্থে জীবন্ত কবরে যাওয়া এবং ভাবার্থে কবরে যাওয়ার মধ্যে দোলাচল খেতঃ "সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে" [সূরা নাহলঃ ৫৯]। কিন্তু এই মহান নবী (সা) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেন নি, বরঞ্চ তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী লাভ করেন মানবজাতিকে সঠিক ও সরল পথে আনার জন্য। নবীজির (সা) পিতৃত্বে মানবজাতির জন্য এ শিক্ষা রয়েছে যে, সন্তানদের মানসিক চাহিদা পূরণ ও মনস্তাত্ত্বিক গঠনের জন্য যেমন ভালোবাসা ও আবেগের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্যও সম্মান পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এর ফলেই তাদের পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে।

৩) আমরা এ ঘটনায় দেখি, নবীজি (সা) ফাতিমাকে (রা) এমন একটি গোপন কথা বলেন, যা তিনি আবু বকর (রা), উমার (রা), আলী (রা) কিংবা তাঁর স্ত্রীদের বলেন নি। এটা তাঁর ও ফাতিমা (রা) সংক্রান্ত প্রথম পর্যায়ের বিশেষ গোপন কথা ছিল।

পিতৃত্বের প্রকৃত অর্থের একটি হচ্ছে, সন্তানদের তাদের বাবাদের চিন্তা ও বিষয়াদি বোঝানো ও এ ব্যাপারে তাদের অবগত করা, যা তাদের অন্তরে বাবাদের প্রতি নৈকট্য ও দায়িত্বানুভূতি উভয়টাই সৃষ্টি করবে, একইসাথে তাদের অন্তরে আত্মবিশ্বাস ও অংশীদারিত্বের অনুভূতিও সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে, সন্তানদের থেকে যদি বাবাদের বিষয়াদি ও চিন্তা গোপন রাখা হয় তবে তা তাদের মধ্যে দূরত্ব ও অকিঞ্চিৎকর হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করবে।

নবীজি (সা) কর্তৃক ফাতিমার (রা) কাছে গোপন তথ্য জ্ঞাপন করা ছিল পিতা রাসূলুল্লাহ (সা) এবং কন্যা ফাতিমার (আ) মধ্যকার দৃঢ়, সুন্দর ও চমৎকার সম্পর্কের একটি রূপমাত্র।

৪) সন্তানরা বড় হয়, সেই সাথে বড় হয় তাদের প্রতি ভালোবাসাও। তারা কোন খেলনা নয় যে, ছোট থাকতে তাদের নিয়ে মেতে থাকতে হবে, অথচ বড় হয়ে গেলে তাদের এড়িয়ে চলতে হবে। ফাতিমার (রা) প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) যে ভালোবাসা কমনীয়তা, আবেগ, মায়া, বাঁধভাঙ্গা পিতৃসুলভ ভালোবাসা দেখা যায়, তা সে সময়ের কথা যখন ফাতিমার (রা) বয়স ২৫ বছর এবং তিনি তখন একজন স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানের মা। অনেকসময় আমরা আমাদের বড় বড় পুত্র ও কন্যা সন্তানদের জন্য ভালোবাসার অনুভূতির স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশকে এড়িয়ে চলি কারণ আমরা তাদের থেকে নিয়মতান্ত্রিক সম্মান পাওয়ার প্রত্যাশা করি। নবীজির (সা) শিক্ষা থেকে কি এমনটাই পাওয়া যায়?

৫) নবীজি (সা) কর্তৃক ফাতিমাকে (আ) প্রস্তুত করার জন্য আসন্ন যে বিশাল দুর্যোগের তথ্য তাঁকে বিশেষভাবে দেয়া হয়েছিল সেটার প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে। দুর্যোগটি ছিল তাঁর মহান, সম্মানিত ও ভালোবাসার পাত্র পিতা সংক্রান্ত। এ তথ্য জানতে পেরে ফাতেমা (রা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান। ফাতিমার (আ) সেসময়ের কথা কি চিন্তা করা যায়! তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার দিকে তাকিয়ে আছেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমাকে (রা) নিজ মৃত্যুর খবর দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যে রোগে তিনি ভুগছেন সেটাতেই তাঁর মৃত্যু

হবে। ফাতিমা (আ) নবীজির (সা) পবিত্র চেহারার দিকে তাকিয়ে আছেন আর ভাবছেন, এটাই তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ সময়।

নবীজি (সা) নিজেই ফাতিমাকে (আ) নিজ মৃত্যুর খবর জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যাতে তাঁকে আসন্ন দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করতে পারেন। এজন্য যখন রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাত হয়, ফাতিমা (আ) ছিলেন দৃঢ়তা, ধৈর্য্য এবং সন্তুষ্টির উত্তম অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মৃত্যুশয্যায় তখন ফাতিমা (আ) তাঁর পাশেই ছিলেন। তিনি বলে উঠেনঃ “আমার পিতা কতই না যন্ত্রণার মধ্যে আছে!” রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুযন্ত্রণার বশে বললেনঃ “আজকের পর তোমার পিতার ওপর আর কোন যন্ত্রণা নেই।” যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুবরণ করলেন, ফাতেমা (আ) বললেনঃ “আমার পিতা তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং তাঁর রব তাঁকে ডেকে নিয়েছেন। আমার পিতার আশ্রয়স্থল জান্নাতুল ফিরদাউস। হে পিতা! আমরা আপনার মৃত্যুর খবর জিবরাইলকে দিচ্ছি।” যখন রাসূলুল্লাহকে (সা) দাফন করা হচ্ছিল, ফাতেমা (আ) শুধু এতটুকুই বলেনঃ “আপনাদের কি রাসূলুল্লাহর ওপর মাটি ছুঁড়ে মারতে ভালো লাগছে?” ফাতিমা (রা) খুব ভালোভাবেই জানতেন, কবর দেয়া যদি রাসূলুল্লাহর (সা) দেখানো পথ না হত, তাহলে কারোরই রাসূলের (সা) ওপর মাটি ছুঁড়ে মারতে আনন্দ হত না। আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক সে ঘরের বাসিন্দাদের ওপর যাদের থেকে আল্লাহ সকল অপবিত্রতা দূর করে তাঁদেরকে চূড়ান্তভাবে পবিত্র করেছেন।[119]

৪৭। মানুষ কি সালাত আদায় করেছে?

সেদিন ছিল বুধবার। মাগরিবের সালাতে মানুষ সবচেয়ে পবিত্র মুখ সবচেয়ে পবিত্র যিকর কোরআনের তেলাওয়াত শুনছে। সূরা মুরসালাত পড়া হচ্ছিল এবং যিনি এই সূরা তারতীলের সাথে ধীরে সুস্থে পড়ছিলেন তাঁর উপরই নাযিল হয়েছিল এই আয়াতঃ "কোরআনকে পাঠ করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে" [সূরা মুযযাম্মিলঃ ৪]। এটা কারো চিন্তাতেই আসে নি যে, তারা শেষবারের মত রাসূলুল্লাহর (সা) তেলাওয়াত শুনছেন।

তিনি যখন সালাত আদায় করছিলেন তার মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তাঁর মাথাব্যথা ও জ্বর আরো তীব্র হল। সালাত শেষ করে তিনি বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং রোগশয্যায় পড়ে গেলেন। তাঁর রোগযন্ত্রণা তাঁর উম্মতের দুজন মানুষের রোগযন্ত্রণার সমান ছিল। জ্বরের ফলে তাঁর পবিত্র দেহ প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এমনকি লোকেরা দেখতে পেল, তাঁর দেহের উষ্ণতা তাঁর কম্বলের উষ্ণতার চেয়েও বেশি। কম্বল দিয়ে তাঁকে ঢেকে দেয়া হল। এশার আযান দেয়া হল। মানুষজন মসজিদে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। নবীজির (সা) পরিবারের সদস্যরা তাঁর চারপাশে একত্রিত হলেন এবং তাঁর হুঁশ ফেরার অপেক্ষা করতে থাকলেন। তাঁরা তাঁর চেহারা মুবারকের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। নবীজির (সা) চোখ যখন খুলল এবং ঠোঁট নড়ে উঠল, তাঁরা সবাই চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁর নিকটবর্তী হলেন। তাঁর পবিত্র ঠোঁট থেকে বের হওয়া যে কথা তাঁরা প্রথম শুনলেন তা হচ্ছেঃ "লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে?" তাঁরা তাঁকে বললেনঃ "না, হে রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।" তিনি বললেনঃ "আমার জন্য পাত্র করে পানি আনো।" তাঁরা তাই করলেন। তিনি বসলেন ও শরীরে পানি ঢাললেন। পানির শীতলতা হয়তো জ্বরের উত্তাপকে নিষ্প্রভ করে দেবে। এরপর তিনি তাঁর অপেক্ষারত সাহাবীদের সাথে সালাত আদায় করার জন্য শরীরের ওপর ভর করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সবার সামনে পড়ে গেলেন এবং হুঁশ হারালেন। যখন তিনি আবার হুঁশ ফিরে পেলেন, একই প্রশ্ন করলেনঃ "লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে?" তাঁকে বলা হলঃ "না। তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।" তিনি বললেনঃ "আমার জন্য পাত্র করে পানি আনো।" পানি আনা হলে, তিনি শরীরে

পানি ঢাললেন এবং আবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু আরেকবার হুঁশ হারালেন। এরপর যখন আবার হুঁশ ফিরে পেলেন, তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ "লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে?" তাঁকে বলা হলঃ "না। তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।" তিনি বললেনঃ "আমার জন্য পাত্র করে পানি আনো।" পানি আনা হলে, তিনি শরীরে পানি ঢাললেন এবং আবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু আরেকবার হুঁশ হারালেন। এরপর যখন আবার হুঁশ ফিরে পেলেন, তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ "লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে?" তাঁকে বলা হলঃ "না। তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।" লোকেরা মসজিদে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে এশার সালাত আদায় করার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বুঝতে পারলেন, তিনি মসজিদে যেতে পারবেন না, তিনি বললেনঃ "আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।"[120121]

আবু বকর (রা) লোকদের সালাতে ইমামতি করলেন। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সালাতে সবচেয়ে বেশি খুশু' অবলম্বনকারী ও আবেগী, যিনি কোরআন তেলাওয়াতের মাঝে ডুকরে কেঁদে উঠতেন। এভাবে পাঁচ দিন ধরে আবু বকর (রা) লোকদের সালাতে ইমামতি করলেন। আবু বকরের (রা) সালাতে তাকবীর ও কোরআন তেলাওয়াতের সুর রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের সাথে লাগানো তাঁর হুজরায় রোগশয্যায় থেকেই শুনতে পেতেন। এভাবে সোমবার এল। আবু বকর (রা) ফজরের নামাযে ইমামতি করছিলেন। তিনি ধীরে সুস্থে কোরআন তেলাওয়াতের মাঝে হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। মিহরাবে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুপস্থিতির দরুণ আবু বকরের (রা) পেছনে দাঁড়ানো রাসূলের (সা) সাহাবীদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট এসে ভর করল। অথচ এই মেহরাবেই তাঁকে সবসময় দেখা যেত। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাদের চমকে দিলেন। তিনি তাঁর হুজরার পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের দেখছিলেন। তাঁরা সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন, যেভাবে তিনি তাঁদের শিখিয়েছেন। তাঁরা সালাতে খুশু' অবলম্বন করছেন, যেটাতেও রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের প্রশিক্ষিত করেছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে কাতারবদ্ধ, তাঁদের অন্তরসমূহ একতাবদ্ধ। তাঁরা একত্রিত হয়েছেন দ্বীনের সবচেয়ে বড় রীতি সালাত আদায় করতে নবীজির (সা) সঙ্গী আবু বকরের পিছনে দাঁড়িয়ে, যাঁকে নবীজি (সা) নিজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের ইমাম হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

এ দৃশ্য দেখে নবীজির (সা) রোগাক্রান্ত ম্লান চেহারায় আবার উজ্জ্বলতা ও আনন্দ ফিরে এল। তিনি সন্তুষ্টি ও আনন্দের হাসি হাসলেন। সাহাবারা খুশিতে সালাতের ব্যাপারে ফিতনায় পড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা সালাতের মধ্যেই রাসূলুল্লাহর (সা) উজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকাতে থাকলেন যেন তা কোরআনের মুসহাফের একটি

পাতা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন - সেসময় তাঁদের কাছে রাসূলুল্লাহর এমন চেহারার চেয়ে আনন্দদায়ক দৃশ্য আর ছিল না। আবু বকর (রা) তাঁর ইমামতির স্থান থেকে পিছে সরে আসলেন যাতে তিনি পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারেন। তিনি ভেবেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হয়তো সালাত আদায় করার জন্য বের হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ইশারা করে সামনে যেতে বললেন এবং সাহাবাদের দিকে ইশারা দিয়ে তাঁদের সালাত সম্পন্ন করতে বললেন। এরপর তিনি তাঁর হুজরার পর্দা নামিয়ে দিলেন। এটাই ছিল তাঁর সাহাবাদের দিকে এবং সাহাবাদের তাঁর দিকে শেষ দৃষ্টিপাত। সেসময় সাহাবীরা ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এটাই ছিল নবী (সা) থাকাকালীন উম্মতে মুহাম্মাদীর শেষ সালাত। এরপর যখন বেলা বাড়ল তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা বাড়তে লাগল। নবীজি (সা) তাঁর হাত দুটো তাঁর পাশে রাখা পানির পাত্রে ডুবিয়ে তাঁর নিজের মুখের উপর মুছে দিলেন এবং বললেনঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মৃত্যুর যন্ত্রণা রয়েছে। হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণার বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।" কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণাও রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর উম্মতকে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব অর্পণ এবং সবচেয়ে শক্ত ওসীয়ত করে দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি তাঁর বাকি থাকা জীবনশক্তি জড়ো করে এবং শেষ নিঃশ্বাসের সাথে পাল্লা দিয়ে সজোরে বলে উঠলেনঃ "আল্লাহ! আল্লাহ! তোমরা নিজেদের সালাত ও দাস-দাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো।" এর ফলে তাঁর বুক গরগর করে উঠলো। এর মধ্যে তাঁর উচ্চারিত শব্দ যেন খুব কষ্টে শোনা গেল। এটাই ছিল রফিকে আ'লার সাথে মিলিত হওয়ার আগে উম্মতকে দেয়া রাসূলুল্লাহর (সা) শেষ আদেশ। এরপর আরো ১৩ বছর পার হয়ে গেল। আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মিহরাবে রাসূলের (সা) জায়গা নিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সে জায়গা উমার (রা) নিলেন। এরপর ২৬ হিজরী সালের যুলহিজ্জার মাসে এক বুধবারে সেই একই মসজিদে লোকেরা তাদের ইমামের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমীরুল মু'মিনীন উমার (রা) বেরিয়ে এলেন। তিনি হলুদ রং এর ইযার পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, যা তিনি বুক পর্যন্ত উঠিয়ে রেখেছিলেন। সালাতের ইক্বামত দেয়া হল, কাতার সোজা করা হল। উমার (রা) সেখানে দাঁড়ালেন যেখানে আবু বকর (রা) এবং তাঁরও আগে রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি যখন সালাত শুরু করলেন আবু লু'লুআ নামক এক মাজুসী এক বিষযুক্ত ছুরি নিয়ে তাঁকে তাঁর পেটে ছুরিকাঘাত করতে লাগল। তাঁর লম্বা বিশাল দেহ মিহরাবে লুটিয়ে পড়ল। তিনি বললেনঃ "আল্লাহর সিদ্ধান্ত সবসময়ই নির্ধারিত।" তাঁকে তাঁর ঘরে বহন করে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তখন বেহুঁশ ছিলেন এবং তাঁর দেহ রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। সকালের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি সূর্য উঠার আগেই চোখ খুললেন। তাঁর চারপাশের সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ঠোঁট

নড়তে লাগল। সবাই নীরব হয়ে গেলেন আহত ছুরিকাঘাতপ্রাপ্ত উমার (রা) কি বলেন তা শোনার জন্য। তিনি মাত্রই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন। তাঁর মুখ দিয়ে সর্বপ্রথম তাঁরা যে কথা শুনলেন তা হচ্ছেঃ "লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে"[122][123][124][125]

এ ঘটনায় লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১) এই ঘটনায় আমাদের নবীর (সা) নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মৃত্যুশয্যার এই কঠিন মুহূর্তেও প্রথমবার হুঁশ ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর চিন্তার বিষয়ে কথা বললেন আর সেটা হচ্ছে তাঁর উম্মত সালাত কায়েম ও রবের ইবাদত করছে কিনা যেজন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন।

মৃত্যুশয্যার মুহূর্ত এমন এক মুহূর্ত যখন মানুষের প্রকৃত চিন্তা এসে ভর করে এবং সকল বানোয়াট চিন্তা উবে যায়। কেউ যদি তার সারাজীবন ভনিতায় কাটিয়ে দেয়, এই মুহূর্তে এসে তার পক্ষে আর ভনিতা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই এটি এবং এর পরের দৃশ্যসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছেন তা এবং তাঁর নিজ বিশ্বাসে অটল থাকা তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ।

২) এই ঘটনা থেকে ইসলামের খুঁটি হিসেবে সালাতের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ মৃত্যুশয্যায় প্রথমবার হুঁশ ফিরে পাওয়ার পর প্রথমেই সালাতের কথা বলা, রাসূল (সা) যাতে বের হয়ে লোকদের নামাযে পড়াতে পারেন সেজন্য জ্বরে বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে তাঁর দাঁড়ানোর চেষ্টা এবং তিনবার গোসল করা, এরপর তাঁর জীবদ্দশায় উম্মতের শেষ সালাতে তদারকি করা, এরপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় তাঁর ওসীয়ত – এ সব থেকে ইসলামের এই রীতিকে জীবনের সর্বাগ্রাধিকার বানানোর ঔচিত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। এর চেয়ে গুরুতর কি আর কিছু হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এ অবস্থাতেও সালাতের উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং উমার (রা) মৃত্যুশয্যায়ও সালাতের কথা মনে রেখেছেন এবং দ্রুত তা আদায় করেছেন? তিনি প্রথমে সালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, এরপর তা আদায় করেন, এরপর বলেনঃ "নিশ্চয়ই যে সালাত ছেড়ে দেয় তার কোন ইসলাম নেই।"[126]

রাসূলুল্লাহকে (সা) যারা ভালোবাসে তাদের প্রত্যেকেরই জিজ্ঞাসা করা উচিত, যে সালাত রাসূলুল্লাহর (সা) এতটা উদ্বেগের বিষয় ছিল, তা আমাদের কতটা উদ্বেগের বিষয়?

৩) উম্মতের মধ্যে আবু বকর সিদ্দীকের (রা) যে অবস্থান সে ব্যাপারে নবীজির (সা) সাক্ষ্য এই ঘটনায় প্রতীয়মান হয়। এটা আল্লাহরই সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা ছিল যে, নবীজি (সা) হঠাৎ করে ওফাত লাভ করেন নি। তিনি অসুস্থ হয়েছেন, তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গভাবে জাগ্রত ছিল। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাহাবাদেরকে বলেন আবু বকরের (রা) নেতৃত্বে সালাত কায়েম করতেঃ "আবু বকরকে বলো লোকদের সালাতে ইমামতি করতে।" আবু বকর সিদ্দীক (রা) পরপর পাঁচদিন সালাতে ইমামতি করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাঁর নিকটেই অবস্থা করছিলেন এবং তাঁর তাকবীর ও তেলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনি যেমন তাঁর ইমামতিতে না হওয়া প্রথম সালাতে আবু বকরকে (রা) ইমামতি করতে বলেন, তেমনি তাঁর জীবদ্দশায় উম্মতের শেষ সালাতেও আবু বকরকে (রা) ইশারায় সাহাবীদের নিয়ে সালাত শেষ করতে বলেন। কোন মুসলিম এমনটা ভাবতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকরকে (রা) এ অবস্থায় সালাতে ইমামতির জন্য পাঠাবেন, অথচ উম্মতের মধ্যে তাঁর চেয়েও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় বান্দা জীবিত আছেন।

এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয় পাত্র আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) যা বলেন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কি হতে পারে। তিনি বলেছেনঃ "তোমাদের নবীয়ে রহমতকে হত্যা করা হয় নি। তিনি হঠাৎ করেও মৃত্যুবরণ করেন নি। তিনি বেশ কয়েক দিন ও কয়েক রাত অসুস্থাবস্থায় ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁর নিকট মুয়াযযিন আসে সালাত শুরু করানোর জন্য। তিনি আবু বকরকে (রা) ইমামতির নির্দেশ দেন, অতএব তিনি লোকদের সালাতে ইমামতি করলেন। তিনি আমার অবস্থান দেখতে পাচ্ছিলেন। এরপর যখন রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাত হল, আমরা নিজেরাই নিজেদের বিষয়াদি দেখলাম এবং আমাদের দুনিয়ার জন্য তাঁকেই বাছাই করলাম যাঁর ওপর নবী (সা) আমাদের দ্বীনের ব্যাপারাদি অর্পণ করে সন্তুষ্ট ছিলেন।"[127]

.৪) যেকোন দা'ঈ ইসলাম পৌঁছানোর জন্য দায়িত্বশীল, মানুষের হেদায়েতের জন্য দায়িত্বশীল নয়। তবে দাওয়াত যখন ফল দেয় এবং দাওয়াতপ্রাপ্ত হেদায়েত লাভ করে, তখন দা'ঈর অন্তর প্রচন্ড খুশি হয় ও আনন্দ লাভ করে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁর হুজরার পর্দা তুলে সাহাবীদের তাঁর হেদায়েত ও সুন্নতের উপর দেখতে পেলেন, এর প্রভাব তাঁর চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাঁর রোগে মলিন চেহারায় আনন্দের দ্যুতি ফুটে উঠল।

৫) এই ঘটনায় এটাও লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহর (সা) উদ্বেগ ও চিন্তা কিভাবে তাঁর সাহাবীদের অন্তরেও প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁর রোগশয্যায় হুঁশ ফিরে পেয়ে বলছিলেনঃ "লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে?" – তখন উমার (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু উমার (রা) নিজে তাঁর মৃত্যুর দিন ঠিক একই কথাই বলেছেন, যা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন। তিনি এটা রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকরণে বলেন নি। তিনি এটা বলেছেন এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তরে যে চিন্তা ছিল, উমারের (রা) মনেও সেই একই চিন্তা বিদ্যমান ছিল। সেজন্যই তিনি রাসূলের (সা) মতই বলে উঠেছিলেনঃ "লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে?"

তথ্যসূত্র

1. ১ সহীহ বুখারী (৬১৬৮), সহীহ মুসলিম (২৬৪১), হাদীসটি ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত।

2. ১ সহীহ আল বুখারী (৪, ৪৯৫৪, ৬৯৮২), সহীহ মুসলিম (১৬০), তাফসীর ইবনে কাসীর (৮/৪২৬), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (২/১৯৭), ফাতহুল বারী (১/২২), (৮/৭১৬), উমদাতুল ক্বারী (১/১২১), ফি যিলালিল কোরআন (৬/ ৩৯৩৫-৩৯৪২)

3. ২ সহীহ বুখারী (৬), সহীহ মুসলিম (২৩০৮)

4. ২ কবি আবদুল্লাহ বারদুনীর কবিতা

5. ১ দেখুনঃ সহীহ বুখারী (৩), সহীহ মুসলিম (১৬০), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (২/২০০), সিয়ার আ'লামুন নুবালা (২/১০৯), ফাতহুল বারী (১/২২), উমদাতুল ক্বারী (১/১২১)।

6. ১ দেখুনঃ সহীহ বুখারী (১৩৬০, ৩৬৭৫, ৪৭৭২), সহীহ মুসলিম (২৪), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১/২১৩), ফাতহুল বারী (৭/১৯৫), (৮/৫০৬), ইসাবা (৭/২৩৫), উমদাতুল ক্বারী (১৩/৪৬), আত-তাহরীর ওয়াত-তানবীর (২০/১৪৭)

7. ১ এটা ক্বাতাদা বলেছেন। সূত্রের জন্য দেখুনঃ সহীহ বুখারী (৩৯৭৬), মুসান্নাফ আবি শাইবা (৭/৩৩২), সহীহ বুখারী (২৪০, ৫২০, ২৯৩৪, ৩১৮৫, ৩৮৫৪), সহীহ মুসলিম (১৮৯৪), সুনান নাসাঈ (৩০৭), মুসনাদে বাযযার (১৮৫২), মুসনাদে আবী ইয়া'লা (৫৩১২), মুসনাদে আবী আওয়ানা (৪/২৮৫), ফাতহুল বারী (১/৩৪৯, ৫৯৪), (৬/১০৬)।

8. ১ তিরমিযী (১৯৮২), মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত; বুখারী (১৩৯৩), আয়েশা (রা) থেকে এ শব্দের বর্ণিত হয়েছেঃ "তোমরা মৃতদের গালি দিও না। তারা যা পাঠিয়েছে তা পেয়ে গিয়েছে।"

9. ১ বুখারী (৩৬২৪); মুসলিম (২৪৫০), আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত

10. ১ সহীহ বুখারী (৪৫৬৬, ৫৬৬৩, ৬২০৭, ৬২৫৪), সহীহ মুসলিম (১৭৯৭), ইমাম নববী কর্তৃক সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা (১২/১৫৭), ফাতহুল বারী (৮/২৩১, ১০/৫৯২)

11. ১ সহীহ বুখারী (২৩০১, ৩৬৩২, ৩৯৫০, ৩৯৭১), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫/৬০-৬৩), ফাতহুল বারী (৪/৪৮০), (৭/২৭২), উমদাতুল ক্বারী (১২/১২৮)

12. ১ মুসনাদে আহমেদ (২৩১৭১), সহীহ বুখারী (২৯৩৫, ৬০২৪, ৬২৫৬, ৬২৫৭), সহীহ মুসলিম (২১৬৫, ২৫৯২-২৫৯৪), সুনানে আবু দাউদ (২৪৭৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (৬৪৪১), শু'আবুল ঈমান (৭৭২২, ৮৪১৩, ৮৪১৭), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১৪/১৪৫, ১৬/১১৫), ফাতহুল বারী (১০/৪৪৯, ১১/৪২, ১২/২৮০)।

13. ১ মুসনাদে আহমেদ (১৩৩৩০), সহীহ বুখারী (১৩৫৬), সুনানে আবু দাউদ (৩০৯৫), ইবনে বিশকিওয়াল রচিত 'গাওয়ামিদুল আসমাইল মুবহামা' (২/৬৪৬), উস্‌দুল গাবা (৬/৪৩৩), ফাতহুল বারী (৬/১৭২), ইসাবা (৪/৩৭৯), উমদাতুল ক্বারী (৮/১৭৫)

14. ১ দেখুন এই বইয়ের 'রাজত্বের মুকুট' অধ্যায়টি

15. ২ সহীহ বুখারী (২৬১৭), সহীহ মুসলিম (২১৯০)

16. ৩ দেখুন এই বইয়ের 'ধীরে!' অধ্যায়টি

17. ৪ সহীহ বুখারী (১৩১২), সহীহ মুসলিম (৯৬১)

18. ১ সহীহ বুখারী (৩১৩৯, ৪০২৪), তারিখে তাবারী (২/৩৪), ইমাম বায়হাক্বীর 'দালাইলুন নুবুওয়া' (৩/১৪০), আল-ইস্তীয়াব (৪/১৪৫৯), আল-মুনতাযিম (৩/১১১), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫/১২৮), আল-ইসাবা (৫/৭৭০), ফাতহুল বারী (৬/২৪৩, ৭/৩২৪)

19. ২ তাবারানী রচিত 'আল-কাবীর' (২৩/১৪, ২৩), আল-হাকীম (১/৬২), বায়হাক্বী রচির 'শুয়াব' (৯১২২, ৯১২৩), হাদীসটি আয়েশা (রা) বর্ণিত। দেখুনঃ সিলসিলা আস-সহীহা (২১৬)

20. ১ সহীহ মুসলিম (২৮৯৮)

21. ১ মুসনাদে আহমেদ (২২১১৯), সুনানে আবু দাউদ (১৫২২), ইবনে হিব্বান (২০২০, ২০২১), আল-হাকিম (১/২৭৩)। হাদীসটি মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত।

22. ২ মুসনাদে আহমেদ (১০৮), আল-হাকিম (৩/২৬৮)। হাদীসটি উমার (রা) থেকে বর্ণিত।

23. ৩ মুসনাদে আহমেদ (১২৯০৪), তিরমিযী (৩৭৯১), ইবনে মাজাহ (১৫৪), ইবনে হিব্বান (৭১৩), আল-হাকিম (৩/৪২২)। হাদীসটি আনাস (রা) থেকে বর্ণিত।

24. ৪ সহীহ বুখারী (৩৮১০), সহীহ মুসলিম (২৪৬৫)

25. ১ মুসনাদে আহমেদ (১২২৪৭, ১৪৩০৭, ২০৬৯৯), সহীহ বুখারী (৭০১, ৭০৫, ৬১০৬), সহীহ মুসলিম (৪৬৫), সুনানে আবু দাউদ (৭৯০), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮৪০), সুনানে বায়হাক্বী (৩/১১৬), আল-আহাদীছ মুখতারা (২২৯৩), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (৪/১৮২), ফাতহুল বারী (২/১৯৫, ৮/৬৯৯), উমদাতুল ক্বারী (৮/৪১০)

26. ১ সহীহ বুখারী (৯০), সহীহ মুসলিম (৪৬৬)। হাদীসটি আবু মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত।

27. ২ সামনের 'হে উসামা!' অধ্যায়ে আসবে।

28. ৩ সুনানে আবু দাউদ (৬৭৩), আবুল ইয়া'লা (২০৮৪), ইবনে খুযাইমা (২৪৪১), ইবনে হিব্বান (৩৩৭২), ইবনে ইবনে নাজউইয়্যা রচিত 'আল-আমওয়াল' (১৯১২), আল-হাকিম (১/৪১৩)। হাদীসটি জাবির (রা) থেকে বর্ণিত।

29. ৪ সহীহ মুসলিম (২২৩)। হাদীসটি আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত।

30. ১ সহীহ বুখারী (৪৩৩৯)। হাদীসটি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত।

31. ১ সহীহ মুসলিম (১৭৯১), তারিখুত তাবারী (২/৬৫, ৩৩৫), সিয়ারুল আ'লামুন নুবালা (২/১০৫), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৯/৫৪৫-৫৬৯), তাফসীরে ইবনে কাছীর (২/১১২), আল-ইসাবা (৩/৪১২)

32. ১ তাবাকাতে ইবনে সা'দ (২/৫১), সহীহ বুখারী (১২৪৬, ৪২৬২), আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া (৬/৪১৬-৪৩৮), ফাতহুল বারী (৭/৫১৬)।

33. ১ সহীহ বুখারী (৪৮৮৯, ৩৭৯৭), সহীহ মুসলিম (২০৫৪), জামি' তিরমিযী (৩৩০৪), খতীব রচিত 'আসমাউল মুহিম্মা' (৩৯৮-৪০০), ইবনে বিশকিওয়াল রচিত 'গাওয়ামিদুল আসমাউল মুবহামা' (১/৪৫৫-৪৫৭), ইমাম নববী কর্তৃক সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা (৪/১১), ফাতহুল বারী (৭/১১৯), উমদাতুল ক্বারী (১৬/২৬৪, ১৯/২২৮)।

34. ২ সহীহ মুসলিম (৮৬৭)। হাদীসটি জাবির (সা) থেকে বর্ণিত।

35. ১ সহীহ বুখারী (২৮৫৬, ৬৫০০, ৭৩৭৩), সহীহ মুসলিম (৩০), জামি' তিরমিযী (২৬৪৩), মুসনাদে আবী আওয়ানা (২১), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১/২৩০), ফাতহুল বারী (৬/৫৯, ১১/৩৩৮), উমদাতুল ক্বারী (৩/৪১৭)

36. ১ এই বইয়ের 'তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী ?' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

37. ২ তাবাকাতে ইবনে সা'দ (২/৩৪৮), তারিখে দিমাশক (৫৮/৪২৩)। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১/৪৫২)

38. ৩ ইমাম আহমেদ রচিত 'যুহদ' (১৮০-১৮১), ইবনে আবিদ দুনিয়া রচিত 'আল-মুহাতাদ্বিরীন' (১২৮), আদ-দীনুরী রচিত 'আল-মুজালাসা' (১৮৭), হিলইয়াতুল আওলিয়া (১/২৩৯), জামি' বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদ্বলিহি (২৪৯), তারিখে দিমাশক (৫৮/৪৪৯), ইবনে জাওযী রচিত 'ছিবাত 'ইনদাল মামাত' (১১৮-১১৯)

39. ১ মুসনাদে আহমেদ (১৮৩৮১), সহীহ মুসলিম (১০১৭), জামি' তিরমিযী (২৬৭৫), সুনানে নাসাঈ (২৫৫৪), ইকমালুল মু'লিম (৩/৫৩৯-৫৪১, ৮/১৭০-১৭১), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (৭/১০২-১০৫)

40. ১ সহীহ বুখারী (৩১৩৭), সহীহ মুসলিম (২৩১২, ২৩১৪)

41. ২ সহীহ বুখারী (৬৪৪৫), সহীহ মুসলিম (৯৯১)। হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত।

42. ৩ সহীহ বুখারী (৩০৯৩, ৩৭১১), সহীহ মুসলিম (১৭৫৮, ১৭৫৯)। হাদীসটি আবু বকর ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত

43. ১ সহীহ বুখারী (৪৬২, ৪৩৭২), সহীহ মুসলিম (১৭৬৪), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১২/৮৭), ফাতহুল বারী (৮/৮৭), আল-ইসাবা (১/৪১০, ৩/৫৮১)

44. ১ সহীহ বুখারী (২৯৬০, ৪২০৯, ৬১৪৮), সহীহ মুসলিম (১৮০৭), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১২/১৭৬), আল-ইসাবা (৩/১৫১), ফাতহুল বারী (৭/৪৬৫, ১০/৫৪৩)

45. ১ মুসনাদে আহমেদ (১২০৩৪, ১২৮০৬, ১৩০৫৮), সহীহ বুখারী (৩৫৭৮, ৬৬৮৮, ৫৪৫০, ৫৩৮১), সহীহ মুসলিম (২০৪০), জামি' তিরমিযী (৩৬৩০), মুসনাদে আবী ইয়া'লা (২৮৩০), সহীহ ইবনে হিব্বান (৫২৮৫), মুসতাখরাজ আবী আওয়ানা (৬৭১০), বায়হাক্বী রচিত দালাইলুন নুবুওয়া (১/৩৬৩), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১০/৭৩), ফাতহুল বারী (৬/৫৮৮, ৯/৫৭৪, ১১/৫৭১), উমদাতুল ক্বারী (৬/৪২৭)

46. ১ সহীহ মুসলিম (২০৩৭)

47. ২ সহীহ মুসলিম (২০৩৬)

48. ১ সহীহ বুখারী (১৯৬৫), সহীহ মুসলিম (১১০৩)

49. ১ সহীহ বুখারী (৪২০৯, ৪২১০), সহীহ মুসলিম (১৮০৭, ২৪০৪, ২৪০৫, ২৪০৬, ২৪০৭), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১৫/১৭৩-১৭৮), ফাতহুল বারী (৭/৪৭৬-৪৭৮)

50. ১ সহীহ বুখারী (৫৯)

51. ১ সহীহ বুখারী (৩১৩৬, ৩৮৭৬, ৪২৩০, ৪২৩১), সহীহ মুসলিম (২৫০৩), উসুদুল গাবা (৭/১৬), ফাতহুল বারী (৬/২৪১, ৭/১৯০, ৪৮৫)

52. ২ তিয়ালিসী (৩৩৮), তাবারানী রচিত 'আল-কাবীর' (৮৪৪১), আদ-দিয়া ফিল মুখতার (১/১৫৮, ২৬৮)

53. ৩ সহীহ বুখারী (৮৪৩), সহীহ মুসলিম (৫৯৫, ১০০৬), হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) এবং আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত।

54. ১ সহীহ বুখারী (৪২৬৯, ৬৮৭২), সহীহ মুসলিম (৯৬, ৯৭), ইবনে মুনদি রচিত 'আল-ঈমান' (৬১-৬৫), শারহে মুশকিলে আছার (৩২২৭-৩২২৯), আল-মুফহিম (১/২৯৩-২৯৮), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (২/৯৯), ফাতহুল বারী (৭/৫১৮, ১২/১৯৫), উমদাতুল ক্বারী (৪২/২৬০)

55. ১ মুসনাদে আহমেদ (২৩৯৩১, ২৪৬৭৭), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৯৭৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (৭০৫৬)

56. ১ সহীহ বুখারী (৬৮৬২), হাদীসটি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত

57. ১ সহীহ বুখারী (৫৯৯৯), সহীহ মুসলিম (২৭৫৪), ফাতহুল বারী (১০/৪৩০)

58. ১ মুসনাদে আহমেদ (২৫৮১১), সহীহ বুখারী (৩০৭১, ৫৮২৩), সুনানে আবী দাউদ (৪০২৪), সিয়ারু আ'লামুন নুবালা (৩/৪৭০), আল-ইসাবা (৭/৫০৬), ফাতহুল বারী (৬/১৮৪, ১০/২৭৯)

59. ২ সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (৯৫৫, ২৬২২, ২৬২৩)

60. ১ সহীহ বুখারী (৪৫৪, ৯৫০, ২৯০৬), সহীহ মুসলিম (৮৯২), সুনানে নাসাঈ আল-কুবরা (১৭৯৮-১৮০০), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (৬/১৮২), ফাতহুল বারী (১/৫৪৯, ২/৪৪০, ৬/৯৫)

61. ১ মুসনাদে আহমেদ (২৫৪), সহীহ বুখারী (৪৫৪, ৯৫০, ২৯০৬), সহীহ মুসলিম (৮৯২), সুনানে নাসাঈ আল-কুবরা (১৭৯৮-১৮০০), সহীহ ইবনে হিব্বান (৫৮৭০), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (৬/১৮২), ফাতহুল বারী (১/৫৪৯, ২/৪৪০, ৬/৯৫)

62. ১ এই বইয়ের পূর্ববর্ণিত গল্প 'খেলো' দ্রষ্টব্য

63. ১ সহীহ বুখারী (৬৭৮০), উসুদুল গাবা (২/৬৪), আল-ইসাবা (২/১১৭, ৪/২৫১, ২৭৫, ৬/৪৬৩-৪৬৫), ফাতহুল বারী (২১/৭৫-৮১), উমদাতুল ক্বারী (২৩/২৭০-২৭১)

64. ১ ইবনে উমার (রা) ও আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত, আবু দাউদ (৩৬৭৪), তিরমিযী (১২৯৫), ইবনে মাজাহ (৩৩৮০, ৩৩৮১), ইবনে হিব্বান (৩৬৭৪), আল-হাকিম (২/৩২)

65. ১ মুসনাদে আহমেদ (১২০৯০), সহীহ বুখারী (৩১৪৯, ৫৮০৯, ৬০৮৮), সহীহ মুসলিম (১০৫৭), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (৭/১৪৬-১৪৭), ফাতহুল বারী (১০/৫০৬)

66. ১ সহীহ বুখারী (৬১১৬), আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত।

67. ২ সহীহ বুখারী (৬১১৪), সহীহ মুসলিম (২৬০৯), আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত।

68. ৩ আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিতঃ "নিশ্চয়ই আমাকে উত্তম আদর্শের "আমাকে উত্তম আদর্শের পূর্ণাঙ্গতা প্রদানে প্রেরণ করা হয়েছে।" মুসনাদে আহমেদে "উত্তম চরিত্র" অধ্যায়ে বর্ণিত (৮৫৯৫), বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদ' (২৭৩), আল-হাকিম (২/৬৭০), বায়হাক্বী রচিত 'শু'আব' (৭৯৭৯)।

69. ১ মুসনাদে ইসহাক্ব বিন রাহাউইয়াহ (১৫৫০), মুসনাদে আহমেদ (২৩০৯৩), সহীহ বুখারী (৬৭৬, ৬০৩৯), সহীহ ইবনে হিব্বান (৫৬৭৬), ইবনে আবিদ দুনিয়া রচিত 'মাকারিমুল আখলাক্ব' (৩৯৭), আদ-দাওলাবী রচিত 'আল-কুনা' (৩৬০), তারিখে আবী যার'আ আদ-দিমাশক্বী (১/৬৫৯-৬৬০), আবু হুসান বিন মুযাফফার রচিত 'গারায়িব শা'বা' (৮১), ইবনে রজব রচিত 'ফাতহুল বারী' (৬/১০৮-১০৯), সুবকী রচিত 'তাবাক্বাতে শাফি'ঈয়া' (৬/২৯৪), ইবনে হাজার রচিত 'ফাতহুল বারী' (২/১৬৩, ১০/৪৬১)।

70. ১ মুসনাদে তিয়ালিসী (২৫৬৮), মুসনাদে আহমেদ (৮৬৩৪, ৯০৩৭), সহীহ বুখারী (৪৩৯, ৪৫৮, ১৩৩৭, ৩৮৩৫), সহীহ মুসলিম (৯৫৬), সুনানে আবী দাউদ (৩২০৩), মুসনাদে আবী ইয়া'লা (৬৪২৯), সহীহ ইবনে খুযাইমা (১৩৩২), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৬৫৫,

৩৮৩৫), মু'জাম ইবনুল আ'রাবী (৬৭১), মু'জাম ইবনুল মুক্বরি' (৮০৩), ইবনে আবিদ দুনিয়া রচিত 'আল-ফারাজ বা'দা শিদ্দা' (৯৬), আবী শাইখ রচিত 'আল-উযমা' (৫/১৭৭৩), হিলইয়াতুল আওলিয়া (২/৭১), শু'আবুল ঈমান (১০৬০), সুনানে বায়হাক্বী (৪/৩২), বায়হাক্বী রচিত ইছবাত আযাবিল ক্বাবর (১৬২), বায়হাক্বী রচিত 'আল-আদাব' (৭৬৫), ফাতহুল বারী (১/৫৩৪), উমদাতুল ক্বারী (৪/১৯৫)

71. ১ সহীহ বুখারী (৩৬৮৫), সহীহ মুসলিম (২৩৮৯), হাদীসটি আলী (রা) থেকে বর্ণিত।

72. ১ সহীহ বুখারী (৩৬৬১, ৪৬৪০), মু'জামুল তাবারানী আল-কাবীর (১৩৩৮৩), হিলইয়াতুল আওলিয়া (৯/৩০৪), আল-মাতালিবুল 'আলিয়া (৩৮৬৫), ফাতহুল বারী (৭/২৫)।

73. ২ সহীহ মুসলিম (২৬১১), হাদীসটি আনাস (রা) থেকে বর্ণিত

74. ১ সহীহ বুখারী (৬৮৩০), সহীহ মুসলিম (১৬৯১)

75. ১ সহীহ বুখারী (৪৪১, ৩৭০৩, ৬২০৪), সহীহ মুসলিম (২৪০৯), ফাতহুল বারী (১/৫৩৬, ১০/৫৮৭)

76. ১ সহীহ বুখারী (২১২২), সহীহ মুসলিম (২৪২১), সিয়ারু আ'লামুন নুবালা (৩/২৪৫), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১৫/১৯৩), ফাতহুল বারী (৪/৩৪১)

77. ১ সুনানে আবু দাউদ (১১০৯), জামি' তিরমিযী (৩৭৭৪), সহীহ ইবনে হিব্বান (৬০৩৯), হাদীসটি বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত।

78. ২ সুনানে নাসাঈ (১৪১১), মুসতাদরাকে হাকিম (৪৭৭৫), হাদীসটি শাদ্দাদ বিন হাদী (রা) থেকে বর্ণিত

79. ৩ জামি' তিরমিযী (৩৭৬৯), হাদীসটি উসামা বিন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত

80. ৪ সহীহ বুখারী (৩৬২৯), হাদীসটি আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত

81. ১ মুসনাদে আহমেদ (৩৯৪০), সুনানে নাসাঈ (৩৯৩৯), আল-হাকীম (২৬৭৬), হাদীসটি আনাস (রা) থেকে বর্ণিত।

82. ২ সিয়ারু আ'লামুন নুবালা (৩/২৫৭)

83. ১ ইবনুল মুবারাকের 'আয-যুহদ' (৫০৮), মুসনাদে আহমেদ (১৪৪০২), আদাবুল মুফরাদ (৯৬২), সহীহ মুসলিম (২৯৫৭), সুনানে আবী দাউদ (১৮৬), ইবনে আবী আসীমের 'আয-যুহদ' (১৩১-১৩৩), শু'আবুল ঈমান (১০৪৬৭), সুনানে বায়হাক্বী (১/১২৯), 'আওনুল মা'বুদ (১/২২২)

84. ২ সহীহ মুসলিম (৬২৪)

85. ৩ সহীহ বুখারী (৬৮৫), সহীহ মুসলিম (৪২১)

86. ১ সহীহ বুখারী (২৮০৭)

87. ১ সহীহ বুখারী (৫২৮০-৫২৮৩), আল-ইস্তিয়াব (৪/১৪৪৩), সিয়ারু আ'লামুন নুবালা (২/২৯৭), উসুদুল গাবা (৫/২৫৬, ৭/৪৩), আল-ইসাবা (৬/১৯৬, ৭/৫৩৫), ফাতহুল বারী (৯/৪০৮-৪০৯), উমদাতুল ক্বারী (২০/২৬৮)

88. ১ মুসনাদে আহমেদ (২২২১১), মু'জামুত তাবারানী আল-কাবীর (৮/১৬২), মুসনাদে শামিয়্যিন (২/১৩৯, ৩৭৩), সুনানে বায়হাক্বী (৯/৪৫), শু'আবুল ঈমান (৫০৩২)

89. ২ দেখুন এই বইয়ের পূর্বে বর্ণিত গল্প 'উম্মে খালিদ'

90. ৩ সহীহ বুখারী (৬০৭১)

91. ৪ দেখুন এই বইয়ে সামনে বর্ণিত গল্প "দুই বেণীর অধিকারী"

92. ১ সহীহ বুখারী (৭৩১৪), সহীহ মুসলিম (১৫০০), হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত।

93. ১ মুসনাদে আহমেদ (১৭৫৮১, ১৭৫৮৪), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬৮৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (৫৪২), আল-খারায়িতী রচিত 'মাকারিমুল আখলাক' (১০৮)

94. ১ সহীহ বুখারী (২৪৩৯, ৩৬১৫, ৩৬৫২, ৩৯০৫), সহীহ মুসলিম (২০০৯), আল-আহাদ ওয়াল মাছানী (১০২৯), তাবারানীর 'মু'জামুল কাবীর' (৬৬০১-৬৬০৩), ফাকিহীর 'আখবারু মাক্কা' (২৭৯৪), বায়হাক্বীর 'দালাইলুন নুবুওয়া' (২/৪৮৭), সুনানে বায়হাক্বী (৬/৩৫৭-৩৫৮), আল-ইস্তি'আব (১/১৭৩, ২/৫৮১), উসুদুল গাবা (১/৪২১), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১৩/১৭৯), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪/৪৪৩-৪৮৪), আল-ইসাবা (৩/৪১), ফাতহুল বারী (৫/৯৪, ৬/৬২৩, ৭/১০, ২৩২)

95. ১ মুসনাদে আহমেদ (৬৭৬০-৬৭৬২, ৬৮৬৮), সহীহ বুখারী (১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৪-১৯৮০, ৫০৫২, ৫১৯৯), সহীহ মুসলিম (১১৫৯), সহীহ ইবনে খুযাইমা (২১১০, ২১৫২), সুনানে নাসাঈ (২৩৮৮-২৪০৪), মুসতাখরাজ আবী আওয়ানা (২৩৫০-২৩৫৩, ২৩৭০, ২৩৭১), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (৮/৪০-৪৭), ফাতহুল বারী (৩/১৬, ৩৭; ৪/২১৭-২২৫; ৯/৯৫), আল-ইসাবা (৪/১৯২), উমদাতুল ক্বারী (১৭/৬৩-৭৯)

96. ১ সহীহ বুখারী (৩১৩৩, ৫৫১৮, ৬৭১৮, ৬৭২১), সহীহ মুসলিম (১৬৪৯), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১১/১০৮), ফাতহুল বারী (৬/২৩৯, ৯/৬৪৬, ১১/৬০৪, ৬১১)

97. ২ সহীহ বুখারী (২৮২১), হাদীসটি জুবায়ের বিন মুত'ঈম থেকে বর্ণিত

98. ১ সহীহ বুখারী (২৭, ৯২৩), সহীহ মুসলিম (১৫০), হাদীসটি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত।

99. ১ মুসনাদে আহমেদ (২২৫৪, ২৩৮০, ২২৭১৯), সহীহ বুখারী (৬৩), সহীহ মুসলিম (১২), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১/১৬৯), খতীবের 'আসমাউল মুবহিমা' (১৫৪-১৫৫), ইবনে বিশকিওয়ালের 'গাওয়ামিদুল আসমাইল মুবহিমা' (১/৫৫-৫৮), কুরতুবীর 'আল-মুফহিম' (১/১৫৭, ১৬২), আল-ইসাবা (৩/৪৮৬-৪৮৭), ফাতহুল বারী (১/১০৬, ১৫০)

100. ২ মুসনাদে আহমেদ (২২১৮১), সুনানে আবী দাউদ (৫২৩০), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৮৩৬), কাজী ইয়াদের 'আশ-শিফা' (১/১৩০-১৩১)

101. ১ মুসনাদে আহমেদ (২২৬৬৮), জামি' তিরমিযী (২৪৮৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৩৩৪, ৩২০১), আল-মুসতাদরাক (৪/১৬০), আল-মুখাতারা (৪/২৫, ৪০১-৪০৪)

102. ১ সহীহ মুসলিম (৯৮৩), হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত

103. ২ মুসনাদে আহমেদ (৯৩১), সহীহ বুখারী (২৭০০), সুনানে আবী দাউদ (২২৭৮)

104. ১ সহীহ বুখারী (১১৭, ১৩৮, ১৮৩, ৯৯২, ৬৩১৬), সহীহ মুসলিম (৭৬৩), সুনানে আবী দাউদ (১৩৫৬, ১৩৬৫), ফাতহুল বারী (১/২১২, ২৩৯, ২৮৮, ২/৪৮২, ১১/১১৬)

105. ২ মুসনাদে আহমেদ (৩৯৪০), সুনানে নাসাঈ (৩৯৩৯), মুসতাদরাক আল-হাকিম (৩৬৭৬), আনাস (রা) থেকে বর্ণিত

106. ১ মুসনাদে আহমেদ (২৩০৮৮, ২৩১৫৪), সুনানে আবু দাউদ (৪৯৮৫, ৪৯৮৬), তাহাবীর 'শারহে মুশকিলে আছার' (৫৫৪৯), তাবারানীর 'আল-মু'জামুল কাবীর' (৬২১৫), আবু নুয়াইমের 'মা'রিফাতুস সাহাবা' (৬/৩০৯৭, ৭১৪৯), রাসূলের (সা) এক সাহাবী বর্ণিত

হাদীস। এর সনদ নিয়ে মতভিন্নতা আছে। মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। দেখুনঃ 'ইলালুদ দারুকুতনী' (৪/১২০-১২২), তারীখে বাগদাদ (১০/৪৪২-৪৪৫), তাখরীজু আহাদীসিল কাশশাফ (১/৬২-৬৩), তাখরীজু আহাদীসি ইহইয়াই উলূমুদ্দীন (১৯৫)

107. ১ সহীহ মুসলিম (৯৮৩), হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত

108. ১ মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক (১৭৯৬৫), মুসনাদে আহমেদ (২০৪৬১), সহীহ বুখারী (৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০), সহীহ মুসলিম (১৬৬১), সুনানে আবী দাউদ (৫১৫৭), মুসনাদে বাযযার (৩৯৯২), মুসনাদে আবী আওয়ানা (৬০৬৮-৬০৭২), সুনানে বায়হাক্বী (৮/৭), ফাতহুল বারী (১/৮৬, ৫/১৭৪), উমদাতুল ক্বারী (১/২০৪)

109. ১ জামি' মা'মার (২০৯২৫), তাবাক্বার ইবনে সা'দ (৮/১৬৩, ১৭১), মুসনাদে ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইয়া (৮৭১), মুসনাদে আহমেদ (২৩৪৩৬, ২৪০১৯), সহীহ বুখারী (২৫৮০, ২৫৮১, ৩৭৭৫), আদাবুল মুফরাদ (৫৫৯), সহীহ মুসলিম (২৪৪১, ২৪৪২), সুনানে নাসাঈ (৩৯৪৪), মুশকিলে আছার (৫২৫৯), খারাইতির 'ই'তিলালুল কুলুব' (২৪), আবু নুয়াইমের 'ফাদাইলুল খুলাফা আর-রাশিদীন' (১৫২), সুনানে বায়হাক্বী (৭/২৯৯), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১৫/২০৫), ফাতহুল বারী (৫/২০৬, ৭/১০৮), তাগিলীকুল তা'লীক (৩/৩৫৩), আল-ফাতহুর রাব্বানী (২২/১১৪)

110. ১ সহীহ বুখারী (৩১৫০, ৪৩৩৫), সহীহ মুসলিম (১০৬২), হাদীসটি ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত

111. ২ সহীহ বুখারী (৩১৩৮), সহীহ মুসলিম (১০৬৩), হাদীসটি জাবির (রা) থেকে বর্ণিত

112. ১ সহীহ বুখারী (২৬৬১), সহীহ মুসলিম (২৭৭০), হাদীসটি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত

113. ২ সহীহ মুসলিম (২৪৪২), হাদীসটি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত

114. ১ সহীহ বুখারী (৩৩৪, ৩৬৭২, ৪৬০৭), সহীহ মুসলিম (৩৬৭), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (৪/৫৮), ফাতহুল বারী (১/৪৩২), উমদাতুল ক্বারী (৬/১৮)

115. ১ সহীহ বুখারী (৩০৫), সহীহ মুসলিম (১২১১), আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত

116. ১ তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ (৪/৫৪), মুসনাদে আহমেদ (২১৫৩, ২৮৮৪), সহীহ বুখারী (১৮৫৪, ৬২২৮), সহীহ মুসলিম (১৩৩৪), সুনানে নাসাঈ (২৬৪২, ৫৩৯১), আল-ইস্তিয়াব (৩/১২৬৯), উসুদুল গাবা (৪/৩৮৮), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (৮/১৪৩), আল-ইসাবা (৫/৩৮৫), ফাতহুল বারী (৪/৬৬, ১১/১০)

117. ১ সহীহ মুসলিম (৯৮৩), হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত

118. ১ সহীহ বুখারী (৩৬২৪, ৬২৮৬), সহীহ মুসলিম (২৪৫০), জামি' তিরমিযী (৩৮৭২), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (১৬/৫), সিয়ারু আ'লামুন নুবালা (২/১১৮), ফাতহুল বারী (৮/১৩৫)

119. ১ সহীহ বুখারী (৪৪৬২), হাদীসটি আনাস (রা) থেকে বর্ণিত

120. ১ হাদীসটি ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। সূত্রঃ সহীহ বুখারী (৫৬৪৮), সহীহ মুসলিম (২৫৭১)

121. ১ সহীহ বুখারী (৬৬৪), সহীহ মুসলিম (৪১৮)

122. ২ মুসনাদে আহমেদ (২৩২২০), সহীহ বুখারী (৪৪৪৯), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬২৩), ফাতহুল বারী (১১/৩৬২)

123. ১ মুসনাদে আহমেদ (২৬৪৮৩, ২৬৬৫৭), ইবনে মাজাহ (১৬২৫), ইবনে আবিদ দুনিয়ার 'আল-মুহতাদ্বিরীন' (৩০, ৩৩), নাসাঈর 'আল-কুবরা' (৭০৬০-৭০৬৩), হাদীসটি উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। এছাড়াও হাদীসটি এসেছে এসব গ্রন্থেঃ মুসনাদে আহমেদ

(১২১৬৯), ইবনে মাজাহ (২৬৯৭), ইবনে আবিদ দুনিয়া (৩৪), নাসাঈর 'আল-কুবরা' (৭০৫৭-৭০৫৯), ইবনে হিব্বান (৬৬০৫), হাকিম (৩/৫৭), আদ-দ্বিয়া (১/১৫৭-১৫৮, ২১৫৫-২১৫৭, ৭/৩৪-৩৭, ২৪২০-২৪২৫), এসব সূত্রে হাদীসটি আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা ভুল। হাদীসটি আসলে উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত। দেখুনঃ 'ইলাল ইবনে আবী হাতিম (৩০০), 'ইলালুদ দারুকুতনী (১২/১৩৩, ১৫/২০৬), ইরওয়াউল গালীল (২১৭৮), আস-সিলসিলা আস-সাহীহা (৮৬৮)

124. ২ তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ (৩/৩৪৮), সহীহ বুখারী (৩৭০০), ফাতহুল বারী (৭/৬২-৭০)

125. ৩ সহীহ বুখারী (১৯৮, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৭৮, ২৮৫৫, ৪৪৪২, ৫৭১৪), সহীহ মুসলিম (৪১৮, ৪১৯), মুসতাখরাজ আবী আওয়ানা (১২৯৩), মুসতাখরাজ আবী নু'আইম (৯২৮-৯৩৫), সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা (৪/১৩৬), ফাতহুল বারী (২/১৫২, ১৫৫, ১৭৪, ৫/২১৬, ৮/১৪১, ১০/১৬৭), উমদাতুল ক্বারী (৮/৩৫৭, ৩৬২)

126. ১ মালিক (২/৫৪), আবদুর রাযযাক (৫৬১, ৫০১০), ইবনে সা'দ (৩/৩৫০, ৩৫১), ইবনে আবী শাইবা (৩৭২২২), মুহাম্মাদ বিন নাসর রচিত 'তা'যীম ক্বাদরিস সালাত' (৯২৩-৯৩১), ইবনুল আ'রাবী রচিত 'আল-মু'জাম' (৩৯৮, ১৮৯৩) এবং অন্যান্য

127. ২ ইবনে বিশরান রচিত 'আল-আমালী' (২/৪৩), আত-তামহীদ (২২/১৬৯), তারীখে দিমাশক (৪২/৪৪২)

সূচিপত্র

উৎসর্গ 1
ভূমিকা 2
১। হেরা গুহায় একরাত 4
২। সর্বোত্তম 11
৩। হে চাচা 14
৪। হে আল্লাহ, আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম 21
৫। রাজত্বের মুকুট 32
৬। উপত্যকার সরদার 40
৭। ধীরে! 46
৮। বালক 50
৯। উদার মুশরিক 54
১০। তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী? 58
১১। উহুদ ও ইয়ারমুকের মাঝে 63
১২। মা'উনা থেকে মু'তা 69
১৩। আনসারীদের আতিথেয়তা 73
১৪। হে মু'আয 78
১৫। সুন্দর সুন্নাহ 83
১৬। ছুমামা 89
১৭। সালামা 94
১৮। যবের রুটি 98
১৯। পতাকা 106
২০। দুই হিজরতে অংশগ্রহণকারী 111
২১) হে উসামা 115

২২। এই নারী ও এর শিশুসন্তান 121
২৩। উম্মে খালিদ 124
২৪। খেলো 129
২৫। ঈদের দিন 133
২৬। তোমাদের ভাই 136
২৭। ক্রোধান্বিত হয়ো না 140
২৮। ঘরের কাজ 144
২৯। রুমালের দিন 149
৩০। দুই শায়েখ 154
৩১। আবু তুরাব 159
৩২। আমি তাকে ভালোবাসি 162
৩৩। উমামা 166
৩৪। বাজারের মাদ্রাসা 169
৩৫। তুমি কি আশ্চর্য হও না? 173
৩৬। সেই তরুণ 177
৩৭। নিরাপত্তার দলিল 182
৩৮। এর চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই 188
৩৯। আশ'আরীগণ 194
৪০। দু বেণীর অধিকারী 199
৪১। নববী রাত 205
৪২। তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াত বিদ্যমান 211
৪৩। আবু বকরের কন্যা 217
৪৪। বরকতময় 225
৪৫। তরুণ ও তরুণী 231
৪৬। স্বাগতম, হে আমার কন্যা 236
৪৭। মানুষ কি সালাত আদায় করেছে? 242

নববী গল্প

এই বইয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সাতচল্লিশটি স্মরণীয় ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে—ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার বাঁধনে নয়, বরং এক নতুন আঙ্গিকে, যেখানে প্রতিটি ঘটনা একটি জীবন্ত চিত্র হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়।

প্রতিটি গল্পের শেষে রয়েছে তাৎপর্য ও শিক্ষার একটি অংশ, যা পাঠককে ঘটনার গভীরে প্রবেশ করে নবীজির (সা) চারিত্রিক মাধুর্য, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা ও আচরণের ভারসাম্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

এই বই কেবল পড়ার জন্য নয়, বরং অনুভব করার জন্য রচিত—যাতে পাঠকের হৃদয়ে নবীজির (সা) প্রতি ভালোবাসা আরো গভীর হয় এবং তাঁর সুন্দর আদর্শ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হতে পারে।

আবদুল ওয়াহহাব আত-তারীরী